শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৫ বর্ষ, ২৫শ খণ্ড ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩২৫ সাল। ১৮৪০ শকাব্দ।

রণ-গাথা।

(২য় কবিতা)

(১)

ছিন্ন তার জোড়া দিয়া,
বসনে মুছিয়া ধূলী,
অপসারি লূতাতন্তু,
কাঁপা হাতে লয়ে বীণা,
তাহে স্বর মিলাইয়া,
গাহিতে লাগিল কবিঃ—

(২)

"কোথা শ্বেতদ্বীপ, কোথা আর্য্যাবর্ত্ত,
দোঁহার মিলন
পৃথ্বীর মঙ্গল তরে।
বৃটন জার্ম্মানী, বাঁধা কত সূত্রে,
এ মহা সমর
মানবের হিত তরে।

(৩)

ভুঞ্জে জীব নিজ নিজ কর্ম্মফল,
অকারণে নিন্দে তা'রা বিধাতায়।
স্বাধীনতা অধীনতা দৈবাধীন
কভু নহে, নিজ নিজ কর্ম্মফল।

(৪)

দৈবের দোঁহাই দিয়া
ভারত হ'য়েছে নত,
দৈবের দোঁহাই দিয়া
বাঙ্গালী নিদ্রিত এবে ;
জাগিবে কি তা'রা এবে ?
এত বলি গাহে কবি পুনর্ব্বার ঃ—

(৫)

বঙ্গের যুবকবৃন্দ ! আসিছে আহ্বান
সুদূর বৃটন্ হ'তে, সাদরে ডাকিছে
তোমা সবে ভারতের রাজ-রাজেশ্বর,
যোগ দিতে মহারণে, যজ্ঞরূপে যাহা
বরষিবে স্বাধীনতাবারি মেদিনীর
মাঝে, বর্ণ-ধর্ম্ম-জাতি-দেশ-নির্ব্বিশেষে।
আসিছে আহ্বান সুদূর মার্কিন্ হ'তে,
যথা কেহ নহে প্রজা, রাজা কেহ নহে,
যথা সকলি স্বাধীন, সকলি প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে সবে হেয়জ্ঞান।
দুর্ব্বলে করিতে রক্ষা, দিতে স্বাধীনতা
সমগ্র মানবে, ওই ধাইছে মার্কিন্
ফরাসী-সমরক্ষেত্রে, 'মাভৈঃ মাভৈঃ' বলি'
ডাকে তোমাসবে, ডাকে আজ উচ্চৈঃস্বরে।
সুদূর অরুণভূমি, করিছে আহ্বান
দিতে এই মহাযজ্ঞে স্বার্থের আহুতি।

চীন শ্যামদেশ তথা আরব মিশর
সমগ্র উরোপ—সমগ্র আফ্রিকা ছুটে.
অর্পিতে এ মহাযজ্ঞে সর্ব্বস্ব তা'দের,
সংস্থাপিতে সাম্যরাজ্য সমস্ত জগতে।
বল হে, বাঙ্গালী শুধু ঘুমায়ে কি রবে
এই মহাজাগরণে ? দিবেনা আহুতি
এই মহাযজ্ঞে ? হবে স্বারাজ্যে বঞ্চিত,
এ যজ্ঞের মুখ্য ফল স্বাধীনতা হ'তে ?
শুন নাই তোমরা কি স্বাধীনতা তরে
এই মহারণ ? করেন যজন জর্জ্জ
সম্রাট্ মোদের প্রধান ঋত্বিক্ হ'য়ে,
এই যজ্ঞ——এই মহাস্বাধীনতাযজ্ঞ,
সাম্য স্বাধীনতা তরে মেদিনী-মণ্ডলে ?

জয় বিশ্বপতি-জয়,
জয় সম্রাটের জয়,
জয় সাম্রাজ্যের জয়,
জয় ভারতের জয়,
জয় বঙ্গমাতা জয় !
বল কি ভয় কি ভয় ?
যতোধর্ম্মস্ততো জয়,
বল কি ভয় কি ভয় ?

(৬)

জানি আমি, বীরের রুধির বহে তা
শিরায় শিরায়, তাই ডাকিতেছি তোমা--
সবে. হে যুবকবৃন্দ ! যদি জানিতাম,
বঙ্গের বীরত্ব বিকাশিত রঙ্গমঞ্চে
শুধু, কূর্দ্দনে লম্ফনে বক্ষ-আস্ফালনে,
শুধু বাক্যে, নহে কার্য্যে, যদি জানিতাম,
বীরসজ্জা শুধু ফুটবলক্রীড়া হেতু,
কভু নাহি ডাকিতাম, তোমা সবে আজ।

কিন্তু জানি আমি, শিরায় শিরায় বহে
বীরের শোণিত, তাই ডাকি পুনরায়।
জয় বিশ্বপতি-জয়,
জয় সম্রাটের জয়,
জয় সাম্রাজ্যের জয়,
জয় ভারতের জয়,
জয় বঙ্গমাতা জয়।
বল কি ভয় কি ভয় ?
যতোধর্ম্মস্ততো জয়,
বল কি ভয় কি ভয় ?

(৭)

জানি আমি, পুরাকালে বঙ্গের যুবক
এক তোমাদেরি মত, করি ধূলাখেলা
বাঙ্গালার মাটী লয়ে, সপ্তশত সঙ্গীসহ
রণতরী সাজাইয়া তাম্রলিপ্ত হ'তে,
বিজয় করিল স্বর্ণলঙ্কা। পিতামাতা
রেখেছিল যা'র নাম "শ্রীবিজয় সিংহ",
সার্থক সে নাম। বঙ্গের যুবক সেই,
নবরাজ্যে সত্য সাম্য শান্তি সংস্থাপিয়া
করিল উজ্জ্বল বঙ্গজননীর মুখ।
যা'র নামে লঙ্কাদ্বীপ 'সিংহল' হইল,
যা'র কীর্ত্তিগাথা, সুবর্ণ অক্ষরে গাঁথা
আছে "মহাবংশে" সিংহলের পুরাবৃত্তে।
জয় বিশ্বপতি-জয়,
জয় সম্রাটের জয়,
জয় সাম্রাজ্যের জয়,
জয় ভারতের জয়,
জয় বঙ্গমাতা জয়।
বল কি ভয় কি ভয় ?
যতোধর্ম্মস্ততো জয়,
বল কি ভয় কি ভয় ?

(৮)

জানি আমি, বীররক্ত সেই এখনও
প্রবাহিত শিরায় শিরায় তোমাদের,
তাই ডাকিতেছি তোমাসবে উচ্চৈঃস্বরে।
কেনা জানে বল, গাহে কবি কালিদাস
ভারতীর বরপুত্র ভারত-উজ্জ্বল-রবি,
বঙ্গের বীরত্ব,— যে বীরত্ব দেখাইল
পিতৃগণ তব তরিযুদ্ধে রঘুসহ—
ভারত-সম্রাট্ অযোধ্যানগরপতি ?
কেনা জানে বল বৎস! কহ্লন ঘোষিছে
তব পিতৃগণ-শৌর্য্য "রাজ-তরঙ্গিণী"
কাশ্মীরের পুরাবৃত্তে ? কেনা জানে বল
গৌড়বীরবৃন্দ সংস্থাপিল পঞ্চগৌড়
পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে ? হিমাদ্রিপ্রদেশে
সংস্থাপিল কত রাজ্য ? অধিবাসিগণ
যা'র আজিও গর্ব্বিত, বঙ্গের গৌরবে।
বাঙ্গালী-বীরত্ব গাহিল ভার্জ্জিল কবি,
ঘোষিল পিলিনি, মেঘাস্থেনিস ঘোষে,
আর কত শুনাইব, প্রাচীন কাহিনী ?
বঙ্গের যুবকবৃন্দ, স্মর পূর্ব্বকথা,
থেকনা নিদ্রিত এই মহাজাগরণে,
দেও পূর্ণাহুতি স্বাধীনতা-মহাযজ্ঞে।

জয় বিশ্বপতি-জয়,
জয় সম্রাটের জয়,
জয় সাম্রাজ্যের জয়,
জয় ভারতের জয়,
জয় বঙ্গমাতা জয়।
বল কি ভয় কি ভয় ?
যতোধর্ম্মস্ততো জয়,
বল কি ভয় কি ভয় ?

(৯)

বহ্নি কভু নাহি চাহে থাকিতে আবৃত
ভস্মে, তাই চেয়েছিল দহিতে স্বতেজে
বঙ্গের প্রতাপবীর দিল্লীর সম্রাটে ;
সংস্থাপিতে ধর্ম্মরাজ্য পুনঃ বঙ্গদেশে।
কিন্তু হায়! নিবিল সে তেজ, প্রজ্জ্বলিত
নাহি হ'তে, দেশ-দ্রোহিতা-মহাপ্লাবনে।
বহ্নি কভু নাহি চাহে থাকিতে আবৃত
ভস্মে, তাই সীতারাম আসি দেখা দিলা
বীরবেশে। সে নহে বহু পুরাণ কথা!
সে নহে পুরাণ কথা, যবেরে লেখনী
ছাড়িয়া ধরিল অসি, ঈশান পিয়ারী—
আর কত বঙ্গ-যুবা সিপাহীসমরে।
নাশিল বিদ্রোহিকুল নিজ ভুজবলে,
গাহিল যাদের যশ মুক্তকণ্ঠে তদা
বৃটিশরাজ্যের উচ্চকর্ম্মচারিগণ।

জয় বিশ্বপতি-জয়,
জয় সম্রাটের জয়
জয় সাম্রাজের জয়,
জয় ভারতের জয়,
জয় বঙ্গমাতা জয়।
বল কি ভয় কি ভয়?
যতোধর্ম্মস্ততো জয়,
বল কি ভয় কি ভয়?

(১০)

জেনে রাখ বঙ্গযুবা, এই সত্য জ্ঞান,
ইংরাজ মোদের মিত্র, শত্রু নহে কভু।
পৃথ্বীর মঙ্গল তরে অপূর্ব্ব মিলন
নবীনে প্রাচীনে, দুই আর্য্যশাখা সহ।
জ্ঞান ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব মিলন তরে
সতৃষ্ণ নয়নে চাহিছে সমস্ত ধরা।

পূর্ব্বপিতৃগণ সাধি কার্য্য সুদুষ্কর
আনিলা ইংরাজ দেশে শান্তি বরষিতে—
বঙ্গের মাঝারে—সমগ্র ভারত মাঝে।
রাজার প্রাসাদে দীনের কুটীরে এবে
বিরাজ করিছে শান্তি, পূর্ণ মনস্কাম!
কিন্তু জানি, শুধু শান্তি নহে মানবের
স্পৃহণীয়, জ্বলিছে হৃদয়ে তাই তব
বহ্নি, ধীর স্থিরভাবে বহুদিন ধরি।
নিবাইতে সে অনল কারো সাধ্য নাই!
কিন্তু জেনো, ধ্রুব সত্য, স্বাধীন বৃটন্
নহেক কুণ্ঠিত কভু স্বাধীনতা-দানে।
আরো জেনো, স্বাধীনতা সদা বীরভোগ্যা
নহে কাপুরুষলভ্যা; তাই ডাকি আমি
তোমা সবে, স্মরি পূর্ব্ব-পিতৃগণ-কীর্ত্তি,
ধরি অসি, প্রবেশিতে এই মহারণে,
দিতে পূর্ণাহুতি এই মহারণ যজ্ঞে,
স্মরি সত্য, স্মরি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা,
স্মরি ভারতমঙ্গল, বঙ্গের মঙ্গল,
বিশ্বের মঙ্গল, এই সুবর্ণ-সুযোগে।

জয় বিশ্বপতি-জয়
জয় সম্রাটের জয়
জয় সাম্রাজ্যের জয়
জয় ভারতের জয়
জয় বঙ্গমাতা-জয়,
বল কি ভয় কি ভয়?
যতোধর্ম্মস্ততো জয়
বল কি ভয় কি ভয়?

(১১)

বৃথা খেদ তব, বৃথা নিন্দ অন্য লোকে;
আত্মাই আত্মার শত্রু, নহে অন্য কেহ।

জানহ বঙ্গের যুবা, জান পুনর্ব্বার,
নহে স্বল্পে তুষ্টা স্বাধীনতা মহাদেবী,
তুষিতে তাঁহারে, বহু বলিদান চাই ;
ধন যশ মান আর হৃদয়-শোণিত—
যাহা কিছু বাস' ভাল এ মর জগতে,
সকলি হইবে দিতে, দেবীর সেবায়—
পূজে ছিল সেইরূপ ভকত গোবিন্দ
ভবানীদেবীকে নিজ-পুত্র-বলিদানে,
পুজিতে পারহ যদি ভকতি-সহিত
সেইরূপে, তবে পাবে দেবী-দরশন,
জানিহ নিশ্চয়, নহে লাভ অন্যথায়।

জয় বিশ্বপতি-জয়,
জয় সম্রাটের জয়,
জয় সাম্রাজ্যের জয়,
জয় ভারতের জয়,
জয় বঙ্গমাতা জয়।
বল কি ভয় কি ভয় ?
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়,
বল কি ভয় কি ভয় ?

(১২)

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলি,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র মিলি,
একবার শুধু ধর্ম্মভেদ ভুলি,
হিন্দু বৌদ্ধ মোস্‌লেম্‌ খৃষ্টান্‌ মিলি,
ধর সবে আসি এই ধর্ম্মযুদ্ধে।
ঐ শুন ঐ শুন ভেরীর আহ্বান,
ডাকিছে সঘনে প্রবেশিতে রণে ;
ঐ শুন, ঐ শুন ডাকেন সম্রাট্‌
উচ্চকণ্ঠে, সুদূর বৃটন্‌ হ'তে।
হে বঙ্গ-যুবকবৃন্দ, ভাঙ্গেনা এ নিদ্রা

এ সময়ে তোমা সবে। ধর অসি, পশি
রণক্ষেত্রে, শাসহ অসুরকুলে, চিন্তি
পৃথ্বীর মঙ্গল, সাম্য স্বাধীনতা তরে।
"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায়।"
প্রবেশ এ মহারণে, দেও পূর্ণাহুতি
মহাযজ্ঞে, স্মরি সাম্য, স্মরি স্বাধীনতা।
জয় বিশ্বপতি-জয়,
জয় সম্রাটের জয়,
জয় সাম্রাজ্যের জয়,
জয় ভারতের জয়,
জয় বঙ্গমাতা জয়।
বল কি ভয় কি ভয়?
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়,
বল কি ভয় কি ভয়?

শ্রীযদুনাথ মজুমদার।

বাঙ্গালার গ্রাম্য-ভাষাতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

পঞ্চনদের সিন্ধুনদ যেমন একশাখায় বিনির্গত হইয়া পরে বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্র-সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে, বাঙ্গালা-শব্দাবলীও সেইরূপ নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ভাষাসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মূল শব্দের প্রাদেশিকমূর্ত্তিই সেই শাখা-প্রশাখা। দুই একটী দৃষ্টান্ত লউন্।

সাধুভাষার 'কলস' শব্দ—হুগলী হাবড়া ও বর্দ্ধমানে 'কলসী' শ্রীহট্টে 'কইলা', বাঁকুড়ায় 'গোর্য়া'।

'তৈলপায়িকা' শব্দ—হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে—'আরশুলা,' পাবনায়— 'চিকা', 'তেলাপোকা', রঙ্গপুরে 'উচরুং'।

সাধুভাষার "জ্যোৎস্না" শব্দ চট্টগ্রামে—'জোন', রঙ্গপুরে—'জোনাক', যশোহরে—'চান্দনী'।

এই ত গেল শব্দবিভিন্নতা, ইহার উপর উচ্চারণ-পার্থক্যেরও প্রাবল্য আছে।

সংস্কৃতের "পারাবত" শব্দ—ময়মনসিংহে "কৈতর"; পাবনায় "কতুর": নদীয়ায় "কবিতর"।

" 'বার্ত্তাকু' শব্দ—হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে "বেগুণ," চট্টগ্রামে "বাইঅন্", যশোহরে "বাগুণ, ময়মনসিংহে "বাইঙ্গন্", ইত্যাদি।

তাই বলিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় একার্থে একই শব্দের ব্যবহার হয় না, তাহাও নহে। তবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

নদী অর্থে 'গাঙ্' ময়মনসিংহ, পাবনা ও সাঁওতাল-পরগণায় চলিত।

চুল্লী অর্থে—'আখা'—পাবনা, নদীয়া, চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলিত।

মস্তক অর্থে 'কল্লা' যশোহরে, খুলনায় ও চট্টগ্রামে প্রচলিত ইত্যাদি। (১)

এই যে গ্রাম্যশব্দাবলী, ইহাদিগের এক একখানি রীতিমত ব্যাকরণাভিধান বিরচিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কলিকাতার বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ যে এজন্য চেষ্টিত হইয়াছেন এবং চেষ্টার উপযোগী কার্য্য করিতেছেন, তাহাতেই অনুমান করা যায়, এ অভাব একদিন না একদিন পূর্ণ হইবে। নচেৎ আমার মত অর্থহীন শব্দ-তত্ত্বালোচকের সাধ্য কি যে বাঙ্গালায় ব্যাকরণাভিধান-প্রকাশ-রূপ মহাযজ্ঞ নির্ব্বাহ করি! যদি তাহা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে আমার বার তের বৎসরের প্রাণান্তিক পরিশ্রমের ফল "গ্রাম্য-শব্দকোষ" এতকাল কোন দিন লোক-লোচনের গোচর হইয়া যাইত। দেশে ধনী অনেক আছেন, দাতাও নিতান্ত অল্প নাই, কিন্তু সাহিত্যসেবীর আর্ত্ত-নিবেদন শুনে কয় জনে? সাহেবদের বলনাচে অনেককে চাঁদা দিতে দেখি, কিন্তু মাতৃভাষার অভাব-পূরণার্থ তাঁহাদিগকে রীতিমতভাবে মুক্তহস্ত হইতে দেখিনা। ইহা আমাদের মাতৃভাষার অভাব-পূরণ না হইবার মুখ্যতম কারণ।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রাম্যভাষার আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কেরি, হটন্, প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চাত্যপণ্ডিতও স্বীয় স্বীয় অভিধানে

(১) মস্তক অর্থে 'কল্লা' শব্দের ব্যবহার যশোহরে শুনা যায় না। হিঃ পঃ সঃ।

এতৎসম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পুরুলিয়াদর্পণ, এডুকেশনগেজেট-প্রমুখ কতকগুলি পত্র-পত্রিকায় এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে এবং হইতেছে। কটক-কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 'বাঙ্গালা-ভাষা' নামক অভিধান ও ব্যাকরণে এবং রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ-লিখিত "বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু" নামক শব্দকোষেও এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ আলোচনা বা নিখুঁৎ ভাবের গবেষণা কোন স্থানেই এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, হওয়া সম্ভব-পরও নহে। এই জন্যই বলিয়াছি, বাঙ্গালায় প্রকৃত অভিধান, প্রকৃত ব্যাকরণ এপর্য্যন্ত বিরচিত হয় নাই। অচিরাৎ উহার বিনির্ম্মাণ হওয়া আবশ্যক। আমরা "একতা একতা" করিয়া চীৎকার করি এবং সকল জেলার লোকে সখিত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চাই, কিন্তু জেলাসমূহের প্রাদেশিক শব্দ বুঝিবার কোনও উপায় করিতে ঐকান্তিক প্রয়াস পাইতেছি কি? নিজে নিজে পাইনা, পরন্তু অপরে পাইতে চাহিলে তাহাকেও সাহায্য দ্বারা প্রোৎসাহিত করিতে ইচ্ছা করিনা। বাস্তবিক পক্ষে কথোপকথনের ভাষা অধিগত না হইলে, আচার-ব্যবহারের সামঞ্জস্য না ঘটিলে, লোকের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিল হয় না।

(ক) যশোহরের কোন লোকের মুখে যদি শুনি—"কাজান ক'য়ে খাপান্ খালে কত্তি পারকি?"

(খ) জলপাইগুড়ির কোন লোক আসিয়া যদি বলেন—"যেলায় সেলায় এলাকাথা কবার না পারি।"

(গ) যদি খুলনার কোন লোক আসিয়া বলিয়া বসেন—"গস্তানীরে সাথে লয়্যা ঘাঁটায় বার বাই হবানা।"

(ঘ) মালদহের ছড়ায় যদি কেহ পাঠ করেন—"দিন দুতিন খ্যামশ কর তোমারে সাজাব।"

তাহাহইলে কি আমরা বাক্যান্তর্গত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ রূপে অবগত হইতে পারিব? উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে ত সামান্য বৈসাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে, কিন্তু

(ক) কাজান—অশ্লীল। খাপান্—উত্তম-মধ্যম (প্রহার)
(খ) যেলায় সেলায়—যথায় তথায়। এলাকাথা—এমনকথা।
(গ) গস্তানী—বিবাদপ্রিয় স্ত্রীলোক। ঘাঁটা—রাস্তা।
(ঘ) খ্যামশ—অপেক্ষা।

পূর্ব্বোত্তর-বঙ্গের কথ্যভাষা সময় সময় এমন ভাবেও কথিত হয় যে বিপুল পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় ও তাহার একটা বর্ণও বুঝিতে পারা যায় না। ময়মনসিংহে বাদীর মুখে যদি প্রকাশ পায়—"থাতু বিস্যুইদ আইবাইন্"। তাহাহইলে পশ্চিম বঙ্গের লোক বুঝিতে পারিবেন না যে, ইহার অর্থ—দিদিমা (মাতামহী) বৃহস্পতিবার আসিবেন। ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার বাঙ্গালাভাষাসেবী কোন লোক যদি চলিত কথায় প্রকাশ করেন—"পদুলি ভালেমান তিয়াল।" তাহাহইলে বাঙ্গালার কয়টী জেলার লোকে বুঝিতে পারিবেন যে ইহার অর্থ—"পথসকল জলে পূর্ণ হইল"? কেবল তাহাই নহে, আধুনিক পুস্তক-পত্রিকাদিতেও রাশি রাশি কথ্যশব্দ প্রবেশ করিয়াছে এবং করিতেছে।

(১) দীনবন্ধু মিত্র—খাইতাম সুখে অন্ন এলোমেলো ব'কে। (দ্বাদশ কবিতা)

(২) রঙ্গলাল বন্দ্যো—জঙ্গলে পূরিল ঘাটবাট একেবারে (পদ্মিনী)

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো—ভারে ভারে সিন্দুক তোরঙ্গ বাক্স বেগ গাঁটরী বাহকেরা বহিতে লাগিল। (কৃষ্ণকান্তের উইল)

(৪) হেমচন্দ্র বন্দ্যো—প্রত্যূষে হাজির যদি না হইতে পারি।
সর্ব্বনাশ হবে ক্ষেপী পর্ব্ব আজ ভারি॥ (সাবাস্ হুজুক)

(৫) মাইকেল মধুসূদন দত্ত—যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি।
মেঘনাদ-বধ ১ম সর্গ।

আধুনিক প্রখ্যাতনামা লেখকদিগের মধ্যে মাত্র কয়েকটী কবির এক একটী প্রয়োগ উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহাদের রচনায় এইরূপ গ্রাম্যশব্দ রাশি-রাশি আছে। এইজন্যই বলি, শব্দ-সাধনাদি বা শব্দার্থ-নির্ণয়াদি সম্বন্ধে একটা বাঁধা ধরা নিয়ম হওয়া চাই। নচেৎ সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন স্বেচ্ছাচার চলিতেছে, তেমনই চলিতে থাকিবে এবং ভিন্ন ভিন্ন জেলার শব্দার্থাদি-বোধের কোন উপায় হইবেনা। অভিধান-ব্যাকরণ-রূপ আইন্-গ্রন্থ রীতিমত না থাকায় কিরূপ স্বেচ্ছাচার ভাষায় চলিতেছে, তাহা অবগত হউন্।

কেহ	লিখিতেছেন——	কাজ	কেহ	আবার লিখেন——	কায
"	"	বউ	"	"	বৌ
"	"	দিদি	"	"	দিদী
"	"	অই	"	"	ওই
"	"	হাটু	"	"	আঁটু

ইত্যাদি।

জানিতাম, সাহেবদের কল্যাণেই দেশীয় কোন কোন শব্দ বিকৃত হইয়াছে, যেমন—

মধুপুর মধুশূন্য হইয়া 'মডাপুর' হইয়াছে, রামচন্দ্রের সে অযোধ্যা নাই, উহা "আউধ" হইয়া পড়িয়াছে, পতিতপাবনী গঙ্গা এখন নাম বদলাইয়া "গ্যাঞ্জেস্" হইয়াছেন। প্রাচীন তীর্থ 'মথুরা' এখন মুত্রায় (Muttra) পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, কেবল তাঁহাদিগেরই দোষ নয়, আমরাও বাঁধাবাঁধি নিয়মের অভাবে রীতিমতভাবে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতে ছাড়িতেছিনা।

'কার্য্য' শব্দের অপভ্রংশে যদি 'কায' হয়, তাহাহইলে 'কায'ই হউক, 'কাজ' কেন হইবে ? আর 'কর্জ্জ' হইতে যদি 'কাজ' হয়, তাহাহইলে 'কাজ'ই লেখা হউক, 'কায' কেন লেখা হইবে ! এইরূপ 'অখ্যেত' শব্দ সম্বন্ধেও বিবেচনা করা উচিত। যদি 'অখ্যাত' শব্দের অপভ্রংশ হয়, 'অখ্যাত বা অখ্যেত' হওয়াই উচিত। * 'অক্ষেয়াত' কেন হইবে ?

আমরা আরবীর 'ইলম্‌কে' বাঙ্গালায় 'মালুম' করিয়াছি, 'বাজইয়াফতন্'কে 'বাজেয়াপ্ত' করিয়াছি। ইটালিক "কাফতান্"কে 'কাপ্তেন্' করিয়াছি, ইংরাজী Frank (ফ্র্যাঙ্ক) কে 'ফিরিঙ্গী' করিয়াছি, তাহাতে তত দোষের বিষয় হইতে পারেনা, কারণ এই গুলি বৈদেশিক শব্দ। একজাতি যখন জাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার বেশভূষার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে, সেইরূপ একভাষার শব্দরাজি ভাষান্তরে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদিগের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইলে, তাহাতে বলিবার কিছু থাকেনা, কিন্তু একই ভাষার শব্দকে যদি সাধারণী স্ত্রীলোকের মত নানালোকে নানাভাবে উৎপীড়িত করে, তাহাহইলে তাহাতে দারুণ আপত্তির কারণ উপস্থিত হয় না কি ?

এইজন্যই বলি—ভাষার আইন্ প্রস্তুত করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হইয়াছে। ব্যাকরণাভিধানই সেই কার্য্যনির্ব্বাহ করিবে। প্রত্যেক জেলায় কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেক জেলাবাসীর সাহায্যে এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নচেৎ কার্য্যটী সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হইবেনা।

ভাষায় যে গ্রাম্যশব্দাবলী রহিয়াছে, ইহাদিগের বাদ দিবার উপায় নাই— একথা এপ্রবন্ধে একাধিকবার ব্যক্ত করিয়াছি। এই সকল গ্রাম্যশব্দ যদি অসারও হয়, তথাপি ইহারা ভাষা-জলনিধির মধ্যে ভাসমান থাকিয়া যে স্তর উৎপাদন করিতেছে, তাহাতেই সাধুভাষার অট্টালিকা স্থাপিত হইতেছে।

* হফটন্ সাহেব 'অখ্যাত' শব্দই ধরিয়াছেন।

রাত্ পোহাল, ফরসা হোলো, ফুট্‌লো কত ফুল,
কাঁপায়ে পাতা, নীলপতাকা, জুট্‌লো অলিকুল॥

এতাদৃশ কবিতা-পড়া শিশুই ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিতে বিভূষিত হইয়া বা উচ্চশিক্ষা পাইয়া সাধুভাষা-প্রয়োগে সমর্থ হইতেছে। অনেক শিশু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বোধোদয়ে'র "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" পাঠ করিয়াছে, কিন্তু কয়জনে তাহার প্রকৃতার্থ-বোধে অধিকবয়সেও সমর্থ হইয়াছে—বলুন্ দেখি? আমার এই বক্তব্যের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, কেবল চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে ভাষার গ্রাম্যশব্দাবলীকে রাখিয়া যাইতে হইবে তাহা নহে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও গ্রাম্যশব্দাবলীর আবশ্যকতা রহিয়াছে।

আমার বক্তব্য বিষয় সমাপ্ত হইয়াছে। এখন কবির বাক্যে এই মঙ্গলকর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া আমি এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিতেছি যে—

স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্যধর্ম্ম-পথে,
সুখে কর জ্ঞান-আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পুরাও তাহার আশা,
দেশে কর জ্ঞান-বিতরণ॥ (হেমচন্দ্র)

শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ।

ব্রহ্মচর্য্য বা বিন্দুধারণ।

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে।"

অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় এবং সকল কাজেই শরীর মন ও বাক্য দ্বারা মৈথুন-ত্যাগকে ব্রহ্মচর্য্য কহে। বীর্য্যধারণই ব্রহ্মচর্য্য। অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-ত্যাগে শুক্র-ধারণ হইয়া থাকে। অষ্টাঙ্গমৈথুন যথা।—

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।"

অর্থাৎ মনে মনে স্ত্রীলোকের স্মরণ করা, বাক্য দ্বারা স্ত্রীলোকের কীর্ত্তন করা, স্ত্রীলোকের সহিত কেলি করা, স্ত্রীলোক দর্শন করা, স্ত্রীলোকের সহিত হাস্যালাপ করা, মনে মনে স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভোগ-কল্পনা করা, মনে মনে স্ত্রীসম্ভোগ-বিষয়ক অধ্যবসায় বা নিশ্চয় করা এবং কার্য্যতঃ স্ত্রীসম্ভোগ এইরূপ অষ্টবিধ মৈথুন কথিত হইয়াছে। যে পুরুষ এই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার হইতে বিরত হয়েন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী।

"শুক্রং সর্ব্বচেষ্টা প্রবর্ত্তকম্" অর্থাৎ সকল প্রকার চেষ্টার প্রবর্ত্তকই শুক্র। শুক্র পুষ্ট ও স্থির থাকিলে, দেহ পুষ্ট ও স্থির হয়, ইন্দ্রিয় সকল সতেজ ও বলীয়ান্ হয়। এই শুক্রধাতুর অযথা অপব্যয়ে মানব নিস্তেজ ও জড় হইয়া পড়ে—স্ফূর্ত্তি-শূন্য ও উদ্যম-বিহীন হয়—কর্ম্মে অপটু হয়। অতএব যদি কর্ম্মে উদ্যোগী বা অধ্যবসায়শীল হইতে হয়, দেহকে যদি তেজোদীপ্ত ও পুষ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে শুক্রধাতুর যাহাতে ক্ষয় না হয়, তৎপক্ষে সকলেরই সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা অনেকে করিতে পারেন না, তাই মানব-জন্মলাভ করিয়া তাঁহারা দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হন,—আপন কর্ম্মদোষে তেজ বল, বীর্য্য শক্তি, উদ্যম উৎসাহ নষ্ট করিয়া এমন দুর্লভ জন্ম নষ্ট করিয়া ফেলেন।

"শুক্রোভুবনং বিভর্ত্তি।"

অর্থাৎ শুক্র সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা, এ দেহেও তাহা, অর্থাৎ শুক্র দ্বারাই এ দেহের ধারণ সম্পন্ন হয়।

যত্তচ্ছুক্রংমহজ্জ্যোতিঃ দীপ্যমানং মহদ্যশঃ
তদ্বৈদেবা উপাসন্তে তস্মাৎ সূর্য্যো বিরাজতে
শুক্রাদ্ ব্রহ্ম প্রভবতি ব্রহ্ম শুক্রেন বর্দ্ধতে
তচ্ছুক্রং জ্যোতিষাং মধ্যেঽতপ্তং তপতি তাপনম্।
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনম্।

অর্থাৎ সূর্য্যাদিস্বরূপে প্রকাশমান জ্যোতি, মহাপ্রভাশীল মহাযশ-নামক শুক্রকে দেবতারা আরাধনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের ব্রহ্মতেজ শুক্র হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই তেজ সেই শুক্র দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে; শুক্র স্বয়ংপ্রকাশ; অন্যের দ্বারা প্রকাশিত না হইয়াও শুক্র, সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ-পদার্থসমূহের মধ্যে থাকিয়া সেই সমুদয় প্রকাশ করিতেছেন। সে জ্যোতি

লাভ করিলে মুমুক্ষুজনেরা সংসারাগ্নিমুখে পুনঃ আবর্ত্তন করেন না। সেই সনাতন শুক্ররূপ জ্যোতির আরাধনা যোগিজনেরা করিয়া থাকেন। মার্ত্তণ্ডের প্রখররশ্মি, চন্দ্রের শীতল তেজ, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মজ্যোতি, সকলই শুক্রের প্রভা। শুক্র ব্রহ্মেরই তেজ বা জ্যোতি। এ কারণ যিনি যে পরিমাণে শুক্রকে ধীর স্থির, অচল অটলভাবে ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন, তিনিই তত অধিকপরিমাণে তেজঃসম্পন্ন, দীপ্তিশালী, বীর্য্যবান্ হইবেন। যাহার শরীরে যে পরিমাণে শুক্র ধৃত হইবে, তাঁহার শক্তি সেই পরিমাণে তত অধিক-ভাবে বর্দ্ধিত হইবে। আর যাহার শুক্র যে পরিমাণে ক্ষয় পাইবে, তাহার শক্তি সেই পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। মানুষ যদি প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইতে চায়, তবে ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়, কুপ্রবৃত্তির বশে চলিয়া কামচারী হইয়া আপনাকে অধঃপাতিত করিবে না। স্বকার্য্য দ্বারা, স্বধর্ম্মের সাধনা দ্বারা, শুক্রময় তনুকে সর্ব্বশক্তিময় করিয়া লইবে। এরূপ হইলে ব্যক্তির মঙ্গল হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও মঙ্গল হইবে,—আর্য্যজাতির মঙ্গল হইবে ও লুপ্তগৌরব পুনঃ প্রকাশিত হইবে।

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম্।
জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ
এতজ্ জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ।

বিন্দুর রক্ষণে জীবন ও পতনে মরণ, অতএব সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা বিন্দুর রক্ষার জন্যই চেষ্টা করা উচিত। জানিয়া শুনিয়া কে মরণের অভিলাষ করে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-তাড়নে কামের প্রভাব এতই প্রবল হয় যে, লোকে জানিয়া শুনিয়াই বিন্দুর অযথা পাতন করে—আপনার মৃত্যু আপনিই ডাকিয়া আনে। জন্মের সার মানবজন্মের গৌরব লোকে জানেনা, তাই মহামোহে পড়িয়া অযথা শুক্রের অপব্যয় করিয়া আত্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হয়। শুক্রকে অতি যত্নপূর্ব্বক ধারণ করা উচিত। অতি সামান্য কারণে মানুষ তাহা নষ্ট করিয়া আপনি নীচ হয়, সঙ্গী লোকদিগকে নীচ করে। আমাদের দেশে আজকাল যে অকাল-মৃত্যু ঘটিতেছে, অযথা শুক্রপাতন তাহার অন্যতম কারণ। অযথা অনাচারে অবিরত শুক্র-ব্যয় করিয়া দেশের লোক যে হীনশক্তি হীনতেজ হইয়া আপন কার্য্যদোষে আপন শরীরে জরা-মরণ ডাকিয়া আনিতেছে, এ কথা কি কেহ ভাবিতেছেন? বালকেরা সাধারণতঃ ১৪।১৫ বৎসর হইতে

ইন্দ্রিয়-তাড়নায় তাড়িত হইয়া নানারূপ অযথা অত্যাচারে শুক্র নষ্ট করিতে আরম্ভ করে এবং সেই সময় হইতেই কুসংসর্গ আসিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় করে। তাহার ফলে চিরজীবন নানারূপ পীড়ায় জর্জ্জরিত হয়। শেষে অকালমৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করে। আজকাল বালকদিগের মধ্যে প্রায়ই মাথাঘোরা, দৃষ্টিহীনতা অজীর্ণ এবং স্বপ্নবিকার প্রভৃতি রোগ বেশী পরিলক্ষিত হয়। অপরিমিত শুক্রক্ষয়ই এই সব রোগের কারণ, সন্দেহ নাই। এই সময় হইতে অভিভাবকগণের বালকদিগের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রাচীনকালে পিতামাতা, উপাধ্যায়ের হস্তে বালকদিগকে অর্পণ করিতেন ও তাঁহারাও সর্ব্বদার জন্য বালকগণকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষাকে অতি সামান্য মনে করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষতঃ চরিত্র-গঠনের জন্য বালকদিগকে নানারূপ উপদেশ দিতেন। এখন সে সব দূরে গিয়াছে, এখন কোনরূপে পাশ করিয়া চাকুরী করাই উদ্দেশ্য; জীবন থাকুক্ আর যাউক্।

যেমন কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিলে বাঁশ অকর্ম্মণ্য হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদির অভাবে বালকগণও দিন দিন অকর্ম্মণ্য হইতেছে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিন্দুধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য, গৃহস্থ বা বিবাহিতের পক্ষেও সর্ব্বদা বিন্দুব্যয় করণীয় নহে। গৃহস্থ কোন্ সময় দারোপগমন করিবেন, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র আছে—

ষোড়শর্ত্তু নিশাঃপ্রোক্তাঃ তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।

শাস্ত্রকারেরা বলেন—ঋতুর প্রথম চারিদিন বাদ দিয়া অবশিষ্ট বারদিনের মধ্যে যুগ্মদিনে দারোপগমন প্রশস্ত। তাহার মধ্যে আবার পর্ব্বদিন, রবিবার, একাদশী, দ্বাদশী ইত্যাদি ত্যাগ করিবে। পর্ব্বদিন যথা—

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবি-সংক্রান্তিরেবচ।

অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, পর্ব্বদিন। স্মৃতিশাস্ত্র এই সমস্ত দিন পরিত্যাগ করিতে বলেন। গৃহী এই সব পরিত্যাগ করিলে আর রুগ্ন, স্মৃতিশক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য সন্তান উৎপন্ন হয় না।

বিষ্ণুপুরাণে আছে—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

অর্থাৎ বিষয়িদিগের অভিলাষ, উপভোগের দ্বারা প্রশমিত হয় না ঘৃতের দ্বারা অগ্নি যেমন প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ কামও ভোগ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অতএব প্রবৃত্তিকে যতই দমনে রাখা যায় ততই মঙ্গল। কামাদি ছয় রিপুকে যে দমন রাখিতে পারে, তাহার আর কিছুরই অভাব থাকেনা, তাহার দৈবী মানুষী কোন বিপদ্ই হয় না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ-স্মৃতিরত্ন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমাচার।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মাচার্য্য অধ্যাপকগণ চিরকালই সহানুভূতিবিহীন, পরন্তু কেহ কেহ বিরোধীও বটেন, ইহার হেতু কি? এ সম্বন্ধে অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, "অধ্যাপক-গণ চিরকালই বর্ণাশ্রমাচারের প্রতিপালক, সুতরাং যখন যে ধর্ম্ম বর্ণাশ্রমা-চারের বিরোধী হইয়াছে, অধ্যাপকগণ তখনই তাহার উচ্ছেদ-সাধনে প্রাণপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমাচারই ভারতের গৌরব, বর্ণাশ্রমাচারই ভারতের প্রাণ, অতএব বর্ণাশ্রমাচারবিহীন ধর্ম্ম যতই উদার হউক্ না কেন, বর্ণাশ্রমাচারপূতা ভারতজননী কখনই তাহাকে ক্রোড়ে স্থানদান করেন না। তাই মহাম্মদের তীক্ষ্ণধার তরবারি, বৌদ্ধগণের কূটতর্ক, জৈনগণের ভূত-দয়া সকলই ব্যর্থ হইয়াছে। গোস্বামিগণ-প্রণীত বৈষ্ণবস্মৃতি এই বর্ণাশ্রমাচারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে বলিয়াই বর্ণাশ্রমের প্রতিপালক অধ্যাপকগণ ঐ ধর্ম্মের বিরোধী হইয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত অধ্যাপকগণের অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা স্বার্থ নাই।" দেখা যাউক্ একথা কতদূর সত্য।

গোপালভট্ট-প্রণীত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতির প্রধানতম গ্রন্থ। উহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, কোথাও এক বর্ণও বর্ণাশ্রমাচারের প্রতিকূলে লিখিত নাই, পরন্তু উহার অনুকূলেই বহুল প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণের অবগতির জন্য কয়েকটি প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি। উক্ত গ্রন্থের অষ্টমবিলাসে বৈষ্ণবাপরাধের বিষয় বর্ণন করিয়া পরে বলিতেছেন,— "জ্ঞেয়াঃ পরেঽপিবহবোঽপরাধাঃ সদসম্মতৈরাচারৈঃ শাস্ত্রবিহিত-নিষিদ্ধাতি-ক্রমাদিভিঃ,"—শাস্ত্রে বিহিত ও নিষিদ্ধ কার্য্যের অতিক্রম এবং সাধুগণ-বিগর্হিত আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা আরও বহুবিধ অপরাধ হইতে পারে

পাঠক মহোদয়গণ! লক্ষ্য করিবেন, গোস্বামিপাদ—বলিতেছেন "সদাচার-পরিত্যাগ একটি অপরাধের মধ্যে গণ্য।" পুনরায় শুনুন;—ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্যেদেষ বৈদ্বিগ্ধ যথোক্তাচারহীনস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি;—বেদ পাঠমাত্রেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন না, আচারবিহীন ব্যক্তি পঙ্কমগ্ন গো'র ন্যায় অবসাদ প্রাপ্ত হয়। "সদাচাররতাঃ শিষ্টাঃ সর্ব্বভূতানুকম্পকাঃ। শুচয়স্ত্যক্তরাগাযে সদা ভাগবতাহি তে,"—যাঁহারা সদাচার-রত, শিষ্ট, সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ, শুচি ও রাগবিহীন তাঁহারাই বৈষ্ণব। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তান্ শ্রৌতস্মার্ত্তপ্রবর্ত্তকান্। প্রীতোভবতি যোদৃষ্ট্বা বৈষ্ণবোঽসৌপ্রকীর্ত্তিতঃ;—বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্ত এবং শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণকে দর্শন করিয়াও যাঁহারা প্রীত হন তাঁহারাই বৈষ্ণব। পাঠক মহোদয়গণ! শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণকে দর্শন করিয়াও যাঁহারা প্রীত হন, তাঁহারাও কি বর্ণাশ্রমাচারের বিরোধী হইতে পারেন? আরও স্পষ্টোক্তি শুনুন;—নচলতি নিজবর্ণধর্ম্মতোযঃ সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে ন হরতি ন চলতি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ স্থিরমনসস্তমবেহি বিষ্ণুভক্তং," যিনি নিজ নিজ বর্ণ-ধর্ম্ম হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হন এবং যিনি পরাপর-ভেদ-জ্ঞান-রহিত ও স্থির মনা, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিও। "ততো যথাশ্রমাচারং কর্ম্ম সায়ন্তনং কৃতী, নির্ব্বর্ত্ত্য পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা ভগবদর্চ্চনং;—নিজ নিজ আশ্রম ও আচারানুসারে সায়ং কৃত্য সমাপন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় ভগবদর্চ্চন করিবে। পরিশেষে বলিতেছেন;—"বর্ণাশ্রম-ক্রিয়াতীতান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ"—যাহারা বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মের অতীত, তাহাদিগকে দূরে বর্জ্জন করিবে। নিরপেক্ষ পাঠকমহোদয়গণ! এখনও কি বলিতে চা'ন্ যে বৈষ্ণবস্মৃতি বর্ণাশ্রমাচারের বিরোধী? বৈষ্ণবস্মৃতি গোস্বামিগণের স্বকপোল-কল্পিত নহে, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ হইতেই সংগৃহীত। একবার মাত্র যাঁহারা "শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস" গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, উক্ত গ্রন্থে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে দারোপগমন পর্য্যন্ত দিবারাত্রির সমুদয় কার্য্যই মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে; বিশেষত্বের মধ্যে এই যে, উভয়-দিন-ব্যাপ্ততিথিকৃত্য কোন্‌দিন হইবে—সেই সম্বন্ধে রঘুনন্দনের সহিত মতদ্বৈধ আছে। একাদশীতে শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ আছে, পক্ষান্তরে ভগবানের প্রসাদান্ন দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থাও আছে—ইহা কিছু বর্ণাশ্রমাচারের বিরুদ্ধ নহে। এরূপ মতদ্বৈধ সংগ্রহকারগণের মধ্যে সর্ব্বদাই আছে। অতএব একথা এখন অসঙ্কোচে

বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা "হরিভক্তিবিলাস"গ্রন্থকে বর্ণাশ্রমাচারের বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করেন, নিশ্চয় তাঁহারা উক্ত গ্রন্থ কখনই অধ্যয়ন করিয়া দেখেন নাই।

অনেকে আবার বর্ত্তমানযুগের ভেকাশ্রিত বৈষ্ণবগণের আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া গৌর-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মকে বর্ণাশ্রমাচারের বিরোধী বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহাদের অতিমাত্র ভক্তিভাজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসিগণের আচার-ব্যবহার, তান্ত্রিকসন্ন্যাসিগণের আচার-ব্যবহার কি বর্ণাশ্রমের অনুকূল ? (১) "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইহাই যাঁহাদের সাধনা এবং উহাতে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে কি বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকিতে পারে ? বর্ণাশ্রম ত দূরের কথা ;—'নাহং মনুষ্যো নচদেব-যক্ষো ন ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রা ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুর্নচাহং নিজ-বোধরূপঃ ;—আমি মনুষ্য নই, দেবতা নই, যক্ষ নই, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নই, আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহী নই, বনবাসী নই, ভিক্ষুও নই," ঈদৃশ জ্ঞানই যাঁহাদের চরম আদর্শ, তাঁহাদের কি বর্ণাশ্রমাচারের অভিমান সম্ভবে ? "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু। বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতং, দেশং কালং তথাচান্নমশ্নীয়াদবিচারয়ন্"—সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বকর্ম্মে সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিবেন এবং তাঁহারা দেশ-কালাদির কিছুমাত্র বিচার না করিয়া যেখান সেখান হইতে সমাগত অন্ন, তাহা বিপ্রান্নই হউক্, আর চণ্ডালান্নই হউক্, নির্ব্বিচারে ভোজন করিতে পারিবেন, তাহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র প্রত্যবায় হইবে না। পরন্তু ঈদৃশ যতির দর্শনমাত্রেই অপর সকলে সর্ব্বপাতক-মুক্ত হইবেন ;—"যতের্দর্শন-মাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ। তীর্থব্রততপোদানসর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ"—যতির দর্শনমাত্রেই সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, এবং তীর্থ, ব্রত, তপ, দান ও সর্ব্বযজ্ঞের ফললাভ হয়। ইঁহারা ব্রাহ্মণাদি সকলেরই নমস্য ; অন্যথা ব্যবহার করিলে পাপভাগী হইতে হয় ;—"দেবতাপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং দৃষ্ট্বাপ্যদণ্ডিনং নমস্কারমকুর্ব্বাণঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ"—দেবতা-প্রতিমা দর্শন করিয়া বা যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া যদি তাঁহাকে প্রণাম না

(১) স্মৃতিশাস্ত্রে চতুর্থাশ্রমীর যেরূপ আচারের উল্লেখ আছে, বৈদান্তিক সন্ন্যাসীরা তাহার অতিক্রম করেন না দেখা যায়। সন্ন্যাসীর আশ্রমাচার থাকেনা কি ? সন্ন্যাস যে আশ্রমবিশেষ। হিঃ পঃ সঃ।

করা হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অতএব পাঠক মহোদয়গণ! আপনারাই বলুন দেখি যে, শ্রৌত, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক, তান্ত্রিক ইহার কোন্ ধর্ম্মে চরমে বর্ণাশ্রমাচারের বন্ধন আছে? বলিতে পারেন, "সাধনার চরমাবস্থায় যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করা যায়, তখন আচারানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকেনা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু সাধনার প্রথমাবস্থায় ত আচারাদি অবশ্য অনুষ্ঠেয়," সত্য; মহাপ্রভুও ত প্রথমাবস্থায় আচার ত্যাগ করিতে বলেন নাই, পরন্তু স্বধর্ম্ম পালন করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থের মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থই বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারগ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের মধ্যমলীলার অষ্টমপরিচ্ছেদে রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর যে প্রশ্নোত্তর-বর্ণনা আছে—উহার মধ্যেই সাধন-ভজনের ক্রমপর্য্যায়, তদনুরূপ আচারানুষ্ঠান, সাধক-হৃদয়ের ক্রমবিকাশ ও চরম পরিণতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত আছে, উহার বিশ্লেষণ করিলে সকল সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। মহাপ্রভু, রায় রামানন্দের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—প্রভু কহে "পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়"—রামানন্দ উত্তর করিলেন;—রায় কহে—"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়;" এই বলিয়া ইহার প্রমাণস্বরূপ বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটী উল্লেখ করিয়াছেন;—"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান, বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষ-কারণং"——বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট ব্যক্তি পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিবে, ইহা ব্যতীত তাঁহার সন্তোষের আর অন্য কারণ নাই। এখানে "বর্ণাশ্রমাচারবতা"—এই বিশেষণ দ্বারা অধিকারী নির্ব্বাচন করিয়াছেন অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট ব্যক্তিই বিষ্ণু আরাধনার অধিকারী বলিয়াছেন। এই জন্যই হরিভক্তিবিলাসে বলিয়াছেন—"বর্ণাশ্রমক্রিয়াতীতান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ"—যাহারা বর্ণাশ্রমাচারবিহীন তাহাদিগকে দূরে বর্জ্জন করিবে অর্থাৎ তাহাদের বিষ্ণুর আরাধনার অধিকার নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দের মুখের দ্বারা একেবারে প্রথম হইতে পর পর উন্নততর অধিকারীর সাধন ক্রমে ব্যক্ত করাইবেন, তাই বলিলেন;—"এহ বাহ্য, আগে কহ আর"—ইহার দ্বারা মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমাচার অস্বীকার করেন নাই; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আচারাদির অনুষ্ঠান প্রথমাধিকারীর কর্ত্তব্য, তদপেক্ষা উন্নততর অধিকারীর কর্ত্তব্য কি, তাহাই বল। তখন রায় রামানন্দ বলিলেন—"কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ এই সাধ্য সার"। রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর এই প্রশ্নোত্তর বুঝিতে হইলে, সাধন ভজন জিনিষটি কি, তাহা

একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সাধন ভজন আর কিছুই নহে, মনের মার্জ্জন ও রসাস্বাদন। বহিরঙ্গ সাধনে মনের মার্জ্জন ও অন্তরঙ্গে সাধনে রসাস্বাদন। মার্জ্জনের আবশ্যক জীবের স্বরূপোপলব্ধি, রসাস্বাদনের আবশ্যক রসাস্বাদনই উহার আর অন্য আবশ্যক নাই। বৈষ্ণবশাস্ত্র মতে জীবের স্বরূপ ভগবানের নিত্যদাসত্ব—"নিত্যকৃষ্ণদাস জীব তাহা ভুলি গেল, সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল"—পাঠক মহোদয়গণ! কথাটি একটু প্রণিধান করুন। আমরা যে সর্ব্বদা ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছি, ইহার হেতু কি? ইহার হেতু—আমাদের অহঙ্কার অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান। "আমি ভগবানের দাস, তিনি যাহা করাইতেছেন তাহাই করিতেছি, যেমন নাচাইতেছেন তেমনই নাচিতেছি, তিনি প্রভু আমি ভৃত্য, ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে মাত্র, লাভ-লোকসানের ভাগী প্রভুই" এ জ্ঞান যাহার দৃঢ় আছে, সে কখনই শোক-মোহে অভিভূত হয় না বা হইতে পারেনা। এ সম্বন্ধে স্বামীবিবেকানন্দ "পওহারী বাবার জীবনী"তে একটি সুন্দর গল্প বলিয়া গিয়াছেন। একদা একটি ভীষণ বিষধর সর্প "পওহারী বাবা"কে দংশন করে। তচ্ছ্রবণে অনেকেই ব্যগ্র হইয়া উক্ত মহাপুরুষকে দর্শন করিতে ছুটিয়া আসেন। সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করেন যে "পওহারী বাবা" তাদৃশ বিষধরদষ্ট হইয়াও পূর্ব্বের ন্যায় সাহাস্যবদনে ধীর ও স্থিরভাবে বসিয়া আছেন! সকলে জিজ্ঞাসা করিলে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "হাঁ—আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে একটি দূত আসিয়াছিল।" পাঠক মহোদয়গণ! ভাবিয়া দেখুন দেখি, যাঁহারা ঈদৃশ বিষধরকেও "প্রিয়তমের দূত" বলিয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিতে পারেন, তাঁহাদের কি আর দুঃখ কষ্টের সম্ভাবনা আছে? জীব মাত্রেই "কৃষ্ণের নিত্যদাস" এ জ্ঞান তাঁহাদের দৃঢ় হইয়াছে, যাঁহারা ঈদৃশ বিষধরকেও 'প্রিয়তমের প্রিয় দূত' জ্ঞান করিতে পারেন এবং তাঁহারাই ত্রিতাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। আর যাঁহারা তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন, যাঁহারা পরের চাকুরী করিতে গিয়া পরের জমিদারীকে নিজের জ্ঞান করিয়াছেন, অহঙ্কারে বা কর্ত্তৃত্বাভিমানে পরিপূর্ণ, অথচ স্বশক্তিতে নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত পরিত্যাগের সামর্থ্য নাই, তাঁহারা সর্ব্বদাই দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগ করিতে থাকেন। তাই বৈষ্ণব মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, জীব ভগবানের নিত্যদাস; তাহা বিস্মৃত হইয়া স্বয়ং কর্ত্তৃত্বাভিমান করে বলিয়াই অশেষ দুঃখভাজন হয় অর্থাৎ অহঙ্কারই সকল দুঃখের মূল এবং অহঙ্কারের মূল নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হওয়া। আমি "একজনের ক্রীতদাস, তাঁহার আদেশ ব্যতীত

নেত্র-পলকটি পর্য্যন্ত ফেলিবার ক্ষমতা আমার নাই," এ জ্ঞান থাকিলে কি কখনও অহঙ্কার আসিতে পারে? পক্ষান্তরে নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইলে যে কিরূপ হাস্যকর ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়; তাহা 'পদ্যপাঠে'র ধনলোভী বণিকের "কাচের বসন পণ্য বাছিয়া কিনিল। নগরের মধ্যখানে দোকান খুলিল"— ইত্যাদি পদ্যে রচিত গল্পটি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন। পাঠক মহোদয়গণ! আমরাও কি প্রায় প্রত্যেকেই প্রতিদিনই ঐরূপ হাস্যকর ঘটনার অভিনয় করিতেছি না? ইহার হেতু কি? ইহার হেতু আর কিছুই নহে; স্বরূপ-বিস্মৃতি। সে যে দরিদ্র বণিক্‌পুত্র মাত্র; রাজৈশ্বর্য্য, ভার্য্যাপুত্র, প্রণয় অভিমান সকলই যে তাহার অতিলোলুপ মনের অলীক কল্পনামাত্র— সে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল—তাই পদাঘাতে তাহার—'যা ছিল সম্বল হায় সকলি হারাল"—সেইরূপ আমরাও যে ভগবানের দাস মাত্র—ইহা বিস্মৃত হইয়া নিজেই প্রভু সাজিয়া বসি; সেটিও যে আমাদের বণিক্‌পুত্রের ন্যায়ই ভ্রান্তমনের অলীক কল্পনামাত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া যাই ও জন্মজন্মার্জ্জিত "যা কিছু সম্বল" তাহা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলি। যাহাতে ঈদৃশ হাস্যকর অভিনয় দ্বারা মূলধন পর্য্যন্ত হারাইয়া চিরদুঃখে ভাসমান না হইতে হয়; সেজন্যই সাধন ভজনের আবশ্যক।

[ক্রমশঃ]

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

আকাঙ্ক্ষা।

ভগবন্! যাই যেন নিকটে তোমার—
কি ব'লে ডাকিব প্রভো! কি শক্তি আমার।
নাহিক ভকতি-পুষ্প প্রীতির চন্দন,
রিপুকে দমিতে নাই সংযম-বন্ধন;
কেবলি মোহের মদে মত্ত অনিবার,—
তবু প্রভো! যাই যেন নিকটে তোমার॥
ভগবন্! যাই যেন নিকটে তোমার।
রোগ-শোক-তাপে দগ্ধ অন্তর আমার—

যদিও শঙ্কট-মুখে তুলে দেও ধরি,
সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি তথাপিও হরি;—
হৃদি মাঝে একমাত্র সান্ত্বনার সার—
ভগবন্! যাই যেন নিকটে তোমার॥
ভগবন্! যাই যেন নিকটে তোমার।
অন্তর বিপক্ষ মোর দিতেছে ঝঙ্কার;
কোথায় কোথায় নাথ! ওই দেখা যায়
দেবের কাঙ্ক্ষিত নিত্য আবৃত মায়ায়—
যেন শুভ্র দীপান্বিত স্বরগ-দুয়ার।
ভগবন্ যাই যেন নিকটে তোমার॥
ভগবন! যাই যেন নিকটে তোমার।
এ জীবনে অস্তমিত হোক্ সুধাকর,
চাহিনা সুষমাপূর্ণ অমর-নিলয়;
কামনা বিষয়ীভূত নহে অর্থ চয়,
তব পদরজঃ মাত্র পরপারে সার
ভগবন্ যাইতেছি নিকটে তোমার॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

সৃষ্টিতত্ত্বে গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তা)

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জগৎসর্গের বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন,—

এতদেবাবিবিক্তং সদুপাধিভ্যাঞ্চতদ্গুণৈঃ।
মহাবাক্যস্থ বাচ্যার্থোবিবিক্তং লক্ষ্যইষ্যতে॥

ইহাই অর্থাৎ এই শুদ্ধ চৈতন্যই যখন সমষ্টি-ব্যষ্টি অজ্ঞানরূপ উপাধিদ্বয় দ্বারা এবং উপাধিদ্বয়ের গুণসমূহের দ্বারা অপৃথগ্‌ভূত হইয়া 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের বাচ্যার্থ অর্থাৎ অভিধাশক্তিলভ্য অর্থ, বিবিক্ত—পৃথক্ হইলে লক্ষ্যার্থ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকেন।

অনন্তশক্তিসম্পন্নো মায়োপাধিক ঈশ্বরঃ।
ইক্ষামাত্রেণ সৃজতি বিশ্বমেতচ্চরাচরম্ ॥

অসীমশক্তিশালী পরমাত্মা, মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া দর্শনমাত্রেই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করেন।

অদ্বিতীয়স্বমাত্রোঽসৌনিরুপাদান ঈশ্বরঃ।
স্বয়মেব কথং সর্ব্বং সৃজতীতি ন শঙ্ক্যতাম্ ॥

শুদ্ধস্বভাব অদ্বিতীয় উপাদানকারণশূন্য পরমেশ্বর নিজেই সমস্ত বস্তু কিরূপে সৃজন করেন, ইহা অর্থাৎ এরূপ আশঙ্কা করিও না।

নিমিত্তমপ্যুপাদানং স্বয়মেব ভবন্ প্রভুঃ।
চরাচরাত্মকং বিশ্বং সৃজত্যবতি লুম্পতি ॥

ঈশ্বর নিজেই নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ হইয়া চরাচর জগৎ সৃজন করেন, পালন করেন এবং নাশ করেন।

স্বপ্রাধান্যেন জগতো নিমিত্তমপি কারণম্।
উপাদানং তথোপাধিপ্রাধান্যেন ভবত্যয়ম্ ॥

এই ঈশ্বর আপনার প্রাধান্যবশতঃ অর্থাৎ চৈতন্যাংশ-প্রাধান্যহেতু ঘট-নির্ম্মাণে কুম্ভকারের ন্যায় জগতের নিমিত্তকারণ এবং মায়ারূপ উপাধির প্রাধান্যহেতু উপাদানকারণও হইয়া থাকেন।

যথা লূতা নিমিত্তঞ্চ স্বপ্রধানতয়াভবেৎ।
স্বশরীরপ্রধানত্বেনোপাদানং তথেশ্বরঃ ॥

মাকড়শা যেমন চৈতন্যপ্রাধান্যবশতঃ নিমিত্তকারণ এবং স্বকীয় শরীরের প্রাধান্যহেতু উপাদান কারণ হয়, সেইরূপ ঈশ্বর উভয়বিধ কারণ হইয়া থাকেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতে জগতের সৃষ্টি এইরূপ। এখন দেখা যাউক্, জগতের পূর্ব্বভাব কি? ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই জগতের লয়। জগদ্বীজ ব্রহ্মেই থাকে এবং প্রকৃতির সাহায্যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ উদ্ভাসিত বা উৎপন্ন হয়।

মমযোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্‌গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত ॥

এই শ্লোকের স্থূল ব্যাখ্যায় ইহাই বোধ হয় যে, সাংখ্যশাস্ত্রের মহত্তত্ত্বেরই এস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু শঙ্কর ঠিক্ সে প্রকার অর্থ করেন নাই। শঙ্করের মত এই, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই মায়া এবং সেই মায়াই

যোনি অর্থাৎ সর্ব্বভূতোৎপত্তির কারণ। এই প্রকৃতি সকল প্রকার কার্য্য হইতে প্রধান এবং সকল কার্য্যের ভরণ করিয়া থাকে, সেইজন্য এই প্রকৃতি-কেই মহৎ ও ব্রহ্ম এই দুইটী বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দ্বিবিধ প্রকৃতিই ঈশ্বরের শক্তি। এই শক্তিমান্ পুরুষই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর উপাধিবশে স্বরূপগ্রহণ করিতে উদ্যত জীবগণকে ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করিয়া থাকেন। এই সংযোগ-ফলেই ভূতগণের উদ্ভব। গীতা বলিতেছেন—

সত্ত্বং রজস্তমইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥

এই মন্ত্রে সাঙ্খ্যমত অবলম্বিত হইয়াছে, "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ, ইহারা আত্মাকে যেন বন্ধন করিয়া রাখে। এই তিনটি গুণের পরিচয় কি?

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্ম-সঙ্গেন দেহিনম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য-নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥

অর্থাৎ হে অনঘ! উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল-স্বভাবপ্রযুক্ত উপদ্রব-রহিত এবং প্রকাশক। এই গুণ, ক্ষেত্রজ্ঞকে সুখ-সঙ্গ এবং জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা বন্ধন করিয়া থাকে। রজোগুণ রাগাত্মক, ইহা হইতে তৃষ্ণা ও সঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং ইহা কর্ম্মসঙ্গের দ্বারা দেহীকে বন্ধন করে। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, এই গুণ সকল প্রাণীর মোহকর এবং ইহা প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা দেহীকে বন্ধন করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে সংশ্লিষ্ট করিয়া থাকে। রজোগুণ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং তমোগুণ জীবকে প্রমাদ-সংশ্লিষ্ট করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ—রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবৃত্ত হয়, রজোগুণ—সত্ত্ব ও তমঃকে অভিভূত করিয়া থাকে এবং তমোগুণব সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভব করিয়া থাকে। দেহে সকল ইন্দ্রিয়েই প্রকাশ-রূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি জানিবে। দেহে রজোগু

বৃদ্ধিলাভ করিলে লোভ প্রবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়, তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে।

গীতা সাঙ্খ্যশাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয়-গোচরাঃ ॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত অব্যাকৃত অর্থাৎ ঈশ্বরশক্তি এই আট প্রকার ভিন্না প্রকৃতি। বুদ্ধীন্দ্রিয় পাঁচ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ—এই দশ ইন্দ্রিয় ও মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর শব্দাদি পাঁচ। সাঙ্খ্যমতে এই সকল পদার্থই চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপে কথিত হইয়াছে।

স্থূলভূত সমূহের কারণস্বরূপ যে সূক্ষ্মভূত সমূহ, তাহাই এস্থলে "মহাভূত" বলিয়া কথিত। অহঙ্কার সেই সূক্ষ্মভূতসমূহের কারণ, অহঙ্কারের কারণ বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণ অব্যক্ত অর্থাৎ ঐশ্বরীমায়া। এই আট প্রকার। দশ ইন্দ্রিয়—শ্রবণাদি পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, (যেহেতু ইহারা বুদ্ধির উৎপাদন করে,) এবং বাক্ পাণি প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, সুতরাং ইন্দ্রিয় দশটি। আরও একটি ইন্দ্রিয় আছে, তাহা কি? একাদশং মন ইতি। সমুদায়ে ইন্দ্রিয় একাদশটি এবং ইন্দ্রিয়গোচর অর্থাৎ শব্দাদি ভোগ্যবিষয়—উহাও পাঁচ, অতএব গীতাও সাঙ্খ্যশাস্ত্রের "প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ" ইত্যাদির ন্যায় চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের স্বীকার করিয়াছেন। এই আগর্ভেই পূর্ব্বে (সপ্তমে) "ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ" ইত্যাদি দ্বারা অষ্টধা প্রকৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ কোথায় কি ভাবে ছিল? জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতিতে লীন ছিল।

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।"

এই অবস্থার প্রথম বিকারকে হিরণ্যগর্ভ বা মহত্তত্ত্ব নাম দেওয়া হয়। উপাসনাশাস্ত্রে ইঁহার নাম ব্রহ্মা। ইঁহাকে ঈশ্বরও বলা যায়। যথা :—

"মনোমহান্মতির্ব্রহ্মা পূর্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।"

মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার বলিয়া একটি পদার্থ উদ্ভূত হয়। সেই তত্ত্ব হইতে প্রাণিমাত্রেরই 'আমি আছি' বলিয়া যে জ্ঞান, তাহার উদ্ভব হয়। অহঙ্কার দুই প্রকারে বিকারপ্রাপ্ত হয়—প্রথম ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয় তন্মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ স্বচ্ছ ও প্রকাশস্বভাব, তন্মাত্র অস্বচ্ছ ও অপ্রকাশ। ইহার পরেই

ব্রাহ্মী সৃষ্টি—অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর উপরোক্ত উপাদান দ্বারা সৃষ্টিরচনা করেন। ইন্দ্রিয় একাদশ,—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন। মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সম্বন্ধে অনেক আপত্তি আছে বটে, কিন্তু সাঙ্খ্যশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি কপিল মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ-তন্মাত্র। মন উভয়াত্মক (সাঙ্খ্য ২।২৬) অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। বুদ্ধির গুণ অধ্যবসায়, অহঙ্কারের গুণ অভিমান, মনের গুণ সঙ্কল্প-বিকল্পাদি। সামান্যকরণবৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু। বৃত্তি পাঁচটি—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।

অবান্তর-ভেদে করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ত্রয়োদশ—তিন অন্তঃকরণ এবং দশটী বাহ্যকরণ। সকলের মধ্যে মন প্রধান। অবিশেষ হইতে বিশেষের উদ্ভব হয়। (৩।১) অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলভাব প্রাপ্ত হয়, এবং ঐ পঞ্চ স্থূলভূত হইতে শরীর উৎপন্ন হয়। সুতরাং শরীর এই সকল তত্ত্বে অবস্থিত হইয়া ফলভোগার্থে দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে।

জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপনিষদ্‌বাক্যে একটি ভাবপূর্ণ উপদেশ পাওয়া যায়। যথা—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" (ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ ৩।১৪।১) অর্থাৎ নামরূপ-বিকৃত এই জগতের ব্রহ্মই কারণ। কি প্রকার ? না,—তজ্জলান্—তজ্জ, তল্ল ও তদন ; জগৎ ব্রহ্ম হইতেই জাত, ব্রহ্মে লীন এবং ব্রহ্মেই অধিষ্ঠিত। এক ব্রহ্মই জগৎ, তন্মধ্যে সৃষ্টিনামিকা ভ্রান্তিই কেবল বিদ্যমান রহিয়াছে। জগৎ সৎও নহে, অসৎও নহে, কেবল ভ্রান্তি। কটক স্বর্ণ হইতে পৃথক্ নহে, সুবর্ণই কটকাদি, অথচ কটকাদি সুবর্ণে নাই, সেই প্রকার ঈশ্বরই জগদ্রূপে স্ফুরিত হয়েন, অথচ জগদ্রূপ ঈশ্বরে নাই। যোগ-বাশিষ্ঠে উৎপত্তিপ্রকরণে গল্পচ্ছলে এ বিষয় অতি সুন্দর-রূপে বুঝান হইয়াছে। গীতায় যে বলিয়াছেন—'বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং' ইত্যাদি, তাহাতে এমন বুঝা যায় না যে, এই দৃশ্যমান জগৎ বীজে অঙ্কুরবৎ অবস্থিতি করে ; কারণ, অদৃশ্য ব্রহ্ম হইতে দৃশ্য জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে ? নিরাকার ব্রহ্মে কিরূপে স্থূল পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব হইবে ? দৃশ্যজগৎ কোনও কালেও ছিল না, বর্ত্তমান সময়েও নাই এবং পরেও থাকিবে না। কেবল চিদাকাশই পরমাত্মাতে ঈদৃশ ভ্রান্তিমূলক জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকেন।

যোগবাশিষ্ঠে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, সত্যও নহে, স্থায়ীও নহে, সেইরূপ এই জগৎও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, পৃথক্‌রূপে ইহা সত্যও নহে, স্থিরও নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব।

দুঃখ।

কেমনে হিয়ার পাশে
কোথা হ'তে ছুটে আসে,
না পাই ভাবিয়া, তীব্র দুঃখের অনল—
দূপ্ দূপ্ জ্বলে উঠে—
তাই প্রাণ লুটে লুটে—
নিদারুণ যাতনায় কাঁদে অবিরল।
নিবাইতে সে অনল
নাহি সখা, নাহি জল—
প্রবোধ-পয়োধি উৎস সরসী সাগর।
সুধাই তোমায় বিধি,
যাতনা সৃজিলে যদি
কেননা সৃজিলে অশ্রু বুকের ভিতর?

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

বৃহৎসাম তথাসাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫

পরিষ্কারব্যাখ্যা। অহং সাম্নাং মধ্যে বৃহৎ সাম (মোক্ষ-প্রতিপাদক-সাম-গানানাং মধ্যে বৃহৎ সাম, তেন চ ইন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তূয়তে ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং) ছন্দসাং

(ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে) অহং গায়ত্রী (সাবিত্রী-মন্ত্রোঽহম্—দ্বিজত্বা-পাদকত্বেন সোমহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ) মাসানাং (মধ্যে) অহং মার্গশীর্ষঃ (পকশস্যাঢ্যত্বাৎ) ঋতূনাং (মধ্যে) অহং কুসুমাকরঃ (বসন্তঃ রমণীয়ত্বাৎ) ৩৫

বঙ্গানুবাদ। সামবেদীয় গীতসমূহের মধ্যে আমি বৃহৎসাম। ছন্দঃ-সকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী ছন্দ। মাস সমূহের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতু সকলের মধ্যে আমি বসন্ত ঋতু। ৩৫

আলোচনা। বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদের শ্রেষ্ঠতা ইতঃপূর্ব্বে ২২ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার সেই সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম—যাহাতে ইন্দ্রের স্তব আছে, তাহার প্রাধান্যহেতু তাহাতেই ভগবানের বিভূতির উল্লেখ। ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রসকলের মধ্যে গায়ত্রী (সাবিত্রীমন্ত্র) প্রধান, কারণ গায়ত্রীর বিজত্ব-সম্পাদক শক্তি আছে এবং উহা সোম-হরণমন্ত্র, এইজন্য ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র সকলের মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রে ভগবানের বিভূতিপ্রকাশ। মাস সকলের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসে শস্যাদি পাকিতে আরম্ভ হয়, শীত ও উত্তাপের অল্পতাহেতু জীবের বাস সুখকর হয়, এজন্য অগ্রহায়ণ-মাসকে বিভূতিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋতু সকলের মধ্যে বসন্ত ঋতুতেই রমণীয়-পুষ্প-পল্লবে বৃক্ষলতা শোভিত হয়, শীতাতাপের সমতাহেতু স্বাস্থ্য-সুখকর হয়, এজন্য বসন্ত ঋতুতেই ভগবানের বিভূতি উল্লেখ করা হইয়াছে। ৩৫

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬

সান্বয়ব্যাখ্যা। অহং ছলয়তাং (অন্যোন্যবঞ্চনকর্ত্তৃণাং মধ্যে) দ্যূতং। তেজস্বিনাং (প্রভাববতাং মধ্যে) অহং তেজঃ। জেতৃণাং জয়ঃ অস্মি। (ব্যবসায়িনাং উদ্যমবতাং মধ্যে অহং) ব্যবসায়ঃ (উদ্যমঃ) অস্মি। সত্ত্ববতাং (সাত্ত্বিকানাং মধ্যে) অহং সত্ত্বং অস্মি। ৩৬

বঙ্গানুবাদ। ছলনাকারিদিগের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়ারূপ ছল। তেজস্বী পুরুষদিগের মধ্যে আমি তেজঃ। বিজয়ী পুরুষদিগের মধ্যে আমি জয়। ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে আমি ব্যবসায় এবং সাত্ত্বিকদিগের মধ্যে আমি সত্ত্বগুণ। ৩৬

আলোচনা। ভগবান্ সর্ব্বময়, জগতের প্রতিপদার্থে—প্রতিকার্য্যে দোষে-গুণে পাপে-পুণ্যে সর্ব্বথা তিনি বিদ্যমান। সর্ব্বত্র তাঁহার বিভূতি বিকাশ। ভাল'তেও তাঁহার বিদ্যমানতা, মন্দ'তেও তাঁহার বিদ্যমানতা। এ জগতে আমরা

যাহা কিছু ভাল দেখি বা মন্দ দেখি, সমুদায়ের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিতে না জানিলে, শ্রুতির "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ঈশ্বর সর্ব্বময়—এই তত্ত্ব ধারণা না করিলে, আমরা প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিনা। তাই বলিতেছেন যে, ছলনাকার্য্যের মধ্যে পণপূর্ব্বক পাশাক্রীড়া প্রধান। উহা মন্দের প্রধান বলিয়া তাহাতে ভগবানের সত্তার অভাব নাই। ছলনার প্রধান পাশাক্রীড়ায় ভগবানের বিভূতি। তেজস্বিগণের তেজে অপর লোক অনুগত ও ভীত থাকে, সে তেজও ভগবানের বিভূতি। বিজয়ী পুরুষ অন্যকে পরাভূত করিয়া নিজে জয়যুক্ত ও প্রশংসিত হন, সে জয়ও ভগবানের বিভূতি। উদ্যমশীল সাধু ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ও ভগবদ্বিভূতি। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—স্বভাবজাত এই তিনটী গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। সত্ত্বগুণী ধার্ম্মিক বিরাগী ক্ষমাশীল ও আস্তিক। সাত্ত্বিকগণের এই সত্ত্বগুণ ভগবানের বিশেষ বিভূতি। ৩৬

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭

সান্বয়ব্যাখ্যা। বৃষ্ণীনাং (যাদবানাং) বাসুদেবঃ অস্মি। (ভূভারহরণ-ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশকত্বাত্) পাণ্ডবানাং (মধ্যে অহং) ধনঞ্জয়ঃ (ভগবৎসখ্যানুগৃহীতত্বাৎ) মুনীনাং (বেদার্থ-মননশীলানাং জ্ঞানিনাং মধ্যে ব্যাসঃ (অস্মি) কবীনাং (শাস্ত্রদর্শিনাং সূক্ষ্মার্থবিবেকিনাং মধ্যে অহং) উশনাঃ কবিঃ (শুক্রাচার্য্যঃ অস্মি) ৩৭

বঙ্গানুবাদ। আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুন, বেদার্থজ্ঞগণের মধ্যে ব্যাস এবং সূক্ষ্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রার্থদর্শীদিগের মধ্যে শুক্রাচার্য্য। ৩৭

আলোচনা। যদুকুলের বৃষ্ণিনামক রাজার নাম অনুসারে যাদবদিগকে "বৃষ্ণি-বংশ-সম্ভূত" বলে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃষ্ণি বংশে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার-হরণ ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করেন, এজন্য বৃষ্ণিবংশে বাসুদেব-মূর্ত্তিতে তাঁহার বিভূতি প্রকাশ। পাণ্ডবদিগের মধ্যে অর্জ্জুন ভগবানের সখা এবং পাণ্ডবকুলে অদ্বিতীয় বীর, এই হেতু অর্জ্জুনে ভগবানের বিভূতি প্রকাশ। মুনিদিগের মধ্যে ব্যাসদেব বেদের বিভাগ-প্রচারকর্ত্তা "ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং" এজন্য তাঁহার প্রাধান্যহেতু তাঁহাতে ভগবানের বিভূতি উল্লেখ করা হইয়াছে। শাস্ত্রদর্শী সূক্ষ্মার্থবিবেকী জনগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য শ্রেষ্ঠ, এজন্য শুক্রাচার্য্যে ভগবানের ভূতির প্রকাশ। ৩৭

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। অহং দময়তাং (দমনকর্ত্তৃণাং মধ্যে) দণ্ডঃ অস্মি। যেন অসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডোবিভূতিঃ) জিগীষতাং (জেতুমিচ্ছতাং) নীতিঃ (সাম-দান-দণ্ডাদ্যুপায়রূপা) অস্মি। গুহ্যানাং (গোপ্যানাং) (গোপন-হেতু) মৌনং এব চ অস্মি। (নহি তুষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ঃ জ্ঞায়তে) জ্ঞানবতাং (তত্ত্বজ্ঞানিনাং) জ্ঞানং (অস্মি) ৩৮

বঙ্গানুবাদ। দমনকারিদিগের মধ্যে আমি দণ্ডস্বরূপ। জিগীষুগণের মধ্যে উপায়স্বরূপ সাম-দান-দণ্ডাদিনীতি আমি। গুহ্য বিষয়ের মধ্যে অপ্রকাশহেতু আমি মৌন এবং জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞান। ৩৮

আলোচনা। কুপথগামী অনায়ত্তগণকে হিতার্থে সুপথে আনার জন্য রাজা অভিভাবক বা শিক্ষক যে দণ্ড-ব্যবস্থা করেন, সেই দণ্ড ভগবানের বিভূতি। সাম দান দণ্ড ভেদ চতুর্ব্বিধ নীতিতে কার্য্যোদ্ধার হয়, জিগীষুর পক্ষে যথোপ-যুক্তভাবে সেই নীতিই ভগবানের বিভূতি। গুহ্য বিষয় প্রকাশ হইলে নিজের বা অপরের অনিষ্ট হয়, এমনস্থলে বিশেষ মন্ত্রণাদি এবং ইষ্টচিন্তা ধ্যান ইত্যাদি অপ্রকাশ রাখিবার জন্য যে মৌন সেই মৌনই ভগবানের বিভূতি। জ্ঞানী যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সংসার-পাশ হইতে মুক্ত হন, সেই জ্ঞানই ভগবানের বিভূতি। ৩৮

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনাযত্ স্যান্ময়াভূতং চরাচরম্॥ ৩৯

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন যত্ চ অপি সর্ব্বভূতানাং বীজং (প্ররোহকারণং) তত্ (মায়াপ্রতিবিম্বিতং চৈতন্যং) অহং। ময়াবিনা যত্ স্যাৎ (ভবেত্) তত্ চরাচরং ভূতং ন অস্তি। (অতো মদাত্মকং সর্ব্বমিত্যর্থঃ এতেন সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেতি সিদ্ধং) ৩৯

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন, ভূতসকলের কারণ বীজস্বরূপ আমি। আমি ব্যতীত চরাচর উত্পন্ন হইতে থাকিতে পারে এমন বস্তু কিছুই নাই। ৩৯

আলোচনা। ভগবান্ সর্ব্বভূতের বীজস্বরূপ—একথা সপ্তম অধ্যায়ে ১০ম শ্লোকে ভগবান্ই বলিয়াছেন "বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্" আমরা যথাস্থানে ইহার সম্যক্ আলোচনা করিয়াছি। বৃক্ষের কারণ যেমন বীজ, সেইরূপ সর্ব্বভূতের মূল কারণ মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ভগবানের বিভূতি।

সেই মূল বীজ ব্যতীত চরাচর কোন বস্তুরই উৎপত্তি বা স্থিতি হইতে পারেনা। ইহাতে সমস্তই যে ব্রহ্মাত্মক—ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই যে নাই, তাহাই বলা হইল। ৩৯

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরোময়া॥ ৪০

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে পরন্তপ (অর্জ্জুন) মম দিব্যানাং (দৈবীনাং) বিভূতীনাং অন্তঃ ন অস্তি। (বিভূতীনাং আনন্ত্যাত্ তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে ইত্যর্থঃ) এষ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ (একদেশতঃ সঙ্ক্ষেপতঃ) প্রোক্তঃ। ৪০

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন, আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই। আমার বিভূতি অনেক। তোমাকে সংক্ষেপতঃ কিছুমাত্র বলিলাম। ৪০

আলোচনা। ভগবানের বিভূতি বলিয়া শেষ করা যায় না। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন—"ভগবান্ যাহা বলিলেন, ইহাই ভগবানের সমস্ত বিভূতি।" তাই ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন, আমার বিভূতির অন্ত নাই, তোমাকে সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎমাত্র বলিলাম। ৪০

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মমতেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১

সান্বয়ব্যাখ্যা। পুনশ্চ সাকল্যেন কথয়তি। (লোকে) যদ্ যদ্ সত্ত্বং (বস্তুমাত্রং) বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্তং) শ্রীমত্ (লক্ষ্মীযুক্তং সম্পত্তিযুক্তং) ঊর্জ্জিতং (কেনাপি প্রভাববলাদিগুণেন অতিশয়িতং উৎসাহোপেতং বা) তত্তত্ এব মম তেজসঃ অংশসম্ভবং অবগচ্ছ (জানীহি) ৪১

বঙ্গানুবাদ। জগতে যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত লক্ষ্মীযুক্ত প্রভাববিশিষ্ট এবং বলশালী, তাহা সমস্তই আমার তেজের অংশসম্ভূত জানিবে। ৪১

আলোচনা। উপসংহার-কালে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সংক্ষেপে বলিলেন যে, জগতে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, যাহা সুন্দর এবং প্রভাবসম্পন্ন, যাহাতে অসাধারণ-ভাব দেখিবে, তাহাতেই ভগবানের শক্তির বিকাশ জানিবে। ৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন এতেন বহুনা জ্ঞাতেন কিং (যস্মাত্) ইদং (পরিদৃশ্যমানং) কৃৎস্নং (সমগ্রং) জগৎ একাংশেন (একদেশমাত্রেণ) বিষ্টভ্য (ধৃত্বা ব্যাপ্য) অহমেব স্থিতঃ। ৪২

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন, তোমাকে অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, ইহাই জানিয়া রাখ যে, আমি আমার এক অংশ মাত্রে জগৎ ধারণ করিয়া আছি। ৪২

আলোচনা। এই অধ্যায়ের ২৩ শ্লোক হইতে ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ তাঁহার বিভূতির প্রধান কয়েকটী মাত্র যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল অজ্ঞানান্ধ অল্লাধিকারীর চক্ষুরুন্মীলনের জন্য। অর্জ্জুন জ্ঞানী ভক্ত এবং উত্তমাধিকারী, তাই অর্জ্জুনকে বলিলেন, "তোমাকে আর আমার বিভূতি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অধিক কি বলিব, আমার একাংশে জগৎ অবস্থিত।" এই বিশ্বই ভগবানের রূপ। এই রূপে তাঁহাকে সর্ব্বরূপী বিরাট্পুরুষ বলিয়া ধ্যান কর। ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
বিভূতিযোগোনাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদুর্গাচরণ দাসগুপ্ত।

যশোহরের ভাষা।

এমন একদিন ছিল, যে দিন এই অখ্যাত অবজ্ঞাত "যশুরে ভাষা"ই সমগ্র বঙ্গের সভ্যসমাজের ভাষা ছিল। অধিক দিনের কথা নয়, বঙ্গ-সাহিত্যের বাল্যবন্ধু হুসেন সাহের সময়ে, এমন কি তৎপরবর্ত্তী কালেও, যশোহরবাসিগণ আজও যে ভাষায় কথোপকথন করিতেছেন সেই ভাষা, কি উত্তরবঙ্গ, কি পশ্চিমবঙ্গ, কি পূর্ব্ববঙ্গ সর্ব্বত্রই সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইত। কবিকঙ্কণের ভাষা খৃষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীর বঙ্গসমাজের ভাষা; তাঁহার অনেক কথা এবং অধিকাংশ ক্রিয়াপদ এখন কবিকঙ্কণের জন্মভূমি পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত না থাকিলেও মধ্যবঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে। ধরিতে গেলে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ হইতেই পশ্চিমবঙ্গের ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য আরব্ধ হইয়াছে। যে কারণে মান্দ্রাজবাসিগণ ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত-উচ্চারণশীল হইয়াছেন, সেই কারণেই কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ সকলের অধিবাসিগণের মধ্যে দ্রুত উচ্চারিত "পশ্চিমে ভাষা"র উৎপত্তি হইয়াছে।

কথিত ভাষার টান্‌ই তাহার প্রাণ। যশোহরের বর্ত্তমান "যশুরে টান্" ই প্রাচীন বঙ্গের কথিত-ভাষার টান্। অধুনা পূর্ব্ববঙ্গে এই টান্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে একপ্রকার লোপ পাইতে বসিয়াছে। বর্ত্তমানযুগের ব্যস্ততাই ব্যস্তবাগীশ পশ্চিমবঙ্গবাসিগণের কথিত-ভাষার এই টান্-লোপের প্রধান কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হুসেন্‌সাহী যুগের সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে সময়ে এই "যশুরে টান্" সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ, উত্তরবঙ্গের দ্বিজ বংশী দাস ও পূর্ব্ববঙ্গের বিজয়-গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ তাঁহাদের "চণ্ডী" "পদ্মাপুরাণ" প্রভৃতি কাব্যে ঐ টানের একটা রূপ যথাসম্ভব বর্ণমালার ফাঁদে ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ "চণ্ডী"কাব্যের "আস্য" "আল্য" "আল্যাম্" "আল্যেন" "পলাল্য" "টানাল্য" "বাড়াল্য" "বারল" "বল্য" "কয়্য" "থাক্য" "হল্য" "ডাক্যো" "থাক্যো" "গায়্যো" "ধায়্যা" "চায়্যা" "চিড়া" "মারা কর দূর" প্রভৃতি শব্দ; দ্বিজ বংশী দাসের "যাইবা" "মানিবা" "চাবায়" "চাবাইতে" "ছেও দিয়া" "বাণিয়া" "উড়নি" "খাইছি" প্রভৃতি শব্দ এবং বিজয় গুপ্তের "যাবা" "থোবা" "পাবা" "থুইছে" "হইছে" "নৌকার গুড়া" "ছালার চট্" "দেও" প্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য। কবিকঙ্কণ ও দ্বিজ বংশীদাস প্রভৃতি তাঁহাদের কাব্যে সেই সময়ের কথিত-ভাষা বহুল-পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। উহা হইতেই আমরা জানিতে পারি, তখনকার বঙ্গদেশের কথিতভাষার সহিত বর্ত্তমান মধ্যবঙ্গের ভাষার সম্বন্ধ কি, এবং সাদৃশ্য কত।

মুসলমান্-রাজত্বের শেষ সময়ে ইংরাজ বণিক্‌গণ কলিকাতায় উপনিবিষ্ট হওয়ায় কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের অধিবাসিগণের উপর ব্যস্তবাগীশ ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজগণের চরিত্র ও আচার ব্যবহার প্রভৃতির প্রভাব বিস্তারলাভ করিতে থাকে ও তাহার ফলে তাঁহাদের চরিত্র ইংরাজ-জাতির চঞ্চলতা, কর্ম্মপ্রাণতা, ব্যস্ততা প্রভৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে থাকে। এই চঞ্চলতা ও ব্যস্ততা তাঁহাদের ভাষার মধ্যেও প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল; লোকে এমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, সকল শব্দ স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবার অথবা শব্দের প্রত্যেক অংশ বা তাহার টান্ উচ্চারণ করিবার পরিশ্রম ও সময় টুকুও বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে

পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা এরূপ তাড়াতাড়ি কথা বলিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাহাতে শব্দের বিকৃতি না হইয়া পারে না। শব্দের স্বরবর্ণের কোথাও কোথাও লোপ বা হ্রাস ঘটিয়া "পশ্চিমে ভাষা"র পুষ্টি সাধন ঘটিতে লাগিল। বিশেষ্য বিশেষণ ও সর্ব্বনাম শব্দের স্বর-সংক্ষেপ তত অধিক হয় নাই, কিন্তু ক্রিয়া পদের উপর দিয়াই আক্রমণটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গিয়াছে। এইরূপে লিখিত ভাষার "আসিলাম, পাইলাম, খাইলাম" যশোহরে "আলাম, পালাম, খালাম." থাকিলেও পশ্চিম বঙ্গে "এলুম, পেলুম, খেলুন" ও অধিকতর ব্যস্তস্বভাব-বিশিষ্ট সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি ব্যবসায়িসমাজে "এনু পেনু খেনু" প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। বিশেষ্য প্রভৃতি শব্দেরও যে একেবারে পরিবর্ত্তন ঘটে নাই তাহা নহে। এইরূপে যশোহরের সুগুণ "বাগুণ" অধুনা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া তাহার গুণ হারাইয়া "বেগুনে" পরিণত হইলেও খুল্লনার সাধের সময় 'বাগুণ"ই ছিল। কবিকঙ্কণের "আটে থোড়" যশোহরে" আটে থোড়" হইলেও আজ-কালকার পশ্চিমবঙ্গে "এটে থোড়" হইয়া পড়িয়াছে। যশোহরের "বাসিবিয়ের আ'য়ে রা" পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া "বাসিবিয়ের" অভাবে কেবল ছাঁদলাতলার "এও" হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; খুল্লনার বিবাহের সময় কিন্তু তাঁহাদের এ মানহানি ঘটে নাই।

মুকুন্দরামের "লোণ" এখন বিলাত হইতে আসিয়া কলিকাতা বন্দরে নামিবার সময় "নুন" বেশ ধরিলেও (অর্থাৎ ন্যূনতাপ্রাপ্ত হইলেও) যশোহরের বাজারে আসিয়া আবার বুক ফুলাইয়া 'লোণই' হইয়া দাঁড়ায়। কবিকঙ্কণের "খাজুর গাছ" হইতে কেশবপুরের 'খাজুর গুড়' প্রস্তুত হইয়া আসিয়া কাশী-পুরের কলে পড়িলে "খেজুরে" চিনিতে পরিণত হয়। পূর্ব্বে গোলাহাটে "চই" পাওয়া যাইত, এখনও বসুন্দের হাটে পাওয়া যায়, কিন্তু চেতলার হাটে পৌঁছিলেই তাহার পদবৃদ্ধি হইয়া "চুঁই" হইয়া যায়।

কেবল স্বর নহে, কোন কোন স্থলে পশ্চিমবঙ্গে ব্যস্ততায় ব্যঞ্জনেরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে; তাই যশোহরের 'হানশেলের মজগুর মাছের ব্যান্নন্' পশ্চিমবঙ্গের 'হেঁসেলে' ঢুঁকে 'মাগুরমাছের ঝোল' হয়ে বসে আছে। যশোহরের "দালানের দুয়োর" পশ্চিমের "পাকাঘরে" উঠেই" দো'র" হয়ে বসেছে। কিন্তু 'কাঁকড়া চচ্চড়ি' যশোহরের 'থাল' থেকে পশ্চিমের 'থালা'য় উঠলেই 'ক্যাঁকড়া চচ্চড়ি' হয়ে পড়ে।

উত্তরবঙ্গে কথিতভাষায় সমধিক পরিবর্ত্তন হয় নাই; কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে, বিশেষতঃ কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

এক সময়ে পশ্চিম উত্তর উভয়বঙ্গে যে বর্ত্তমান যশোহরে প্রচলিত ভাষা চলিত, তাহার প্রমাণ স্বরূপ কবিকঙ্কণের চণ্ডী এবং দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ হইতে কতকগুলি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কঃ কঃ চণ্ডীর পত্রাঙ্ক

আন্য—ঘরদল হয় যদি আন্য মোর পুর　　২০৩

আল্যকরি—আল্গা করিয়া

ত্বরা হেতু সভাকার বিপর্য্যয় বেশ।

আল্য করি ধায় কেহ নাহি বান্ধে কেশ॥　　২৫

আল্য—আসিল

রাম আল্য অযোধ্যানগরে　　২৩৭

মারীচ সহায় করি তপস্বীর বেশধরি

আল্য বীর রাম কুড়ে যথা।　　২৩৭

আল্য দেব চক্রপাণি চাপিয়া গরুড়।

বৃষভে চাপিয়া আল্য দেব চন্দ্রচূড়॥　　১৮৫

তোর ছিরে আল্য ঘরে।　　২৯৬

আস্যে—আসিয়া

না জানি দৈবের মায়া, আস্যে কোন্ পথ দিয়া

নারিকেলে সান্ধাইল পানি।　　১৩৭

আম—সঘনে নাড়ায়ে আমডাল　　৪২

কিরা—লহনার মাথায় দেই কিরা　　১০৩

কিরা দিয়া রুই মুড়া দিল খুল্লনায়।　　১০৩

(পাট) কোদাল

দন্তগুলা মেলে যেন পাটুয়া কোদাল।

কয়্যা, বল্য—বলিও

ভাই কর্ণধার বৈস কাছে।

মাকে কয়্যা বারতা বিশেষে॥

নিবেদন কর্য্য রাজপাশে।

বল্য না পাইল পিতার অন্বেষণ॥

কয়্যা এই সকরুণ বাণী।

শ্রীমন্তের ডুবিল তরণী।　　১৫০

বাগুলা—কলার বাগুলা যেন কম্পিতকেশর। ৭১

বিহান্—বিহান্ বিকালে বীর শুনেন পুরাণ। ১১০

লোণ্—তৈল লোণ্ কিনিয়ে বেসাতি। ৭৯

সকল ব্যঞ্জনে বাঁকি নাহি দেয় লোণ্। ১৪২

ভাজে চিথলের কোল রোহিত মৎস্যের ঝোল
খর লোণ্ দিয়া ঘন কাঠী। ১৫৮

বায়ান্ন পুরুষ যার লোণের ব্যাপার। ১৮০

হাটে লয়ে বেচে লোণ্ কেনে ডোম হাড়ি। ১৮০

জাতিতে বণিক্ লোণ্ বেচে সর্ব্বকাল
কেহ লোণ্ বেচে কেহ বেচয়ে বকাল॥

দ্বিজ বংশী দাস।

পদ্মাপুরাণের পত্রাঙ্ক

চৈ—চৈ মরিচ জৈন লাগায় মিঠা পাণ্। ২৮৮

চৈ বাটিয়া রান্ধে রোহিতের অণ্ড। ২৯৭

চাবায়—দড় করি চাপিয়া চাবায় দুই গাল। ৩৫৫

গুয়া পাণ্ চাবাইতে লাগিল কেবল। ৩৫৫

কিসে চাবাইয়া খাব নারিকেল-জল। ৩৭০

থাল—থাল গাড়ু পিড়ি দিল ভোজন করিতে। ২৯৯

মানিবা—লক্ষ বলি মানিবা আমারে পূজিবারে।

বাগুণ—বাগুণ তরই ঝিঙ্গা ভাজে দুগ্ধরাজ ডাঙ্গা। ২৯৫

বাগুণ দ্বিখণ্ড করি তাতে লাউ যোগ। ২৯৬

লাফা বাগুণ দীর্ঘে করি চারি খণ্ড
চৈ বাটিয়া রান্ধে রোহিতের অণ্ড। ২৯৭

আদা হরিদ্রা লাগায় বাগুণ বারমাসি। ২৮৮

সকল প্রদেশই পরিবর্ত্তনের স্রোতে অল্পবিস্তর ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু একমাত্র যশোহর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশই প্রাচীনবঙ্গভাষার দেহাবশিষ্ট শেষ-বিভূতিতে বিভূষিত হইয়া অদ্যাপি লোকসমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত যশোহরের "ঘরামি" কবিকঙ্কণের বিশাইএর ন্যায় ঘর বাঁধিবার সময় 'সাতার বন্ধে' দড়ি টাঙ্গাইয়া থাকে (কঃ কঃ চ ১৮৩) এবং "কাঠ দা" দিয়া ছাটনি (১৮৩) চাঁচিয়া চাল বান্ধে। যশোহরের নীলাম্বরেরা অদ্যাপি

ষষ্ঠীর (৩৮) ডাকে অমঙ্গলের সাড়া পাইয়া যাত্রা স্থগিত রাখিবেন কিনা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। যশোহরের খুল্লনারা এখনও "ভাজিয়া ওলায় বড়ি" আর খায় "কুমড়োর ব্যাকলার" ছেচ্‌কি (১৮৭) ও দুয়ারা সাধের জন্য তোলে "রাঙ্গাশাক" যশোহরের 'নায়ে'রা বাদাবনে যাবার সময় "নায়ে তুলে" "মিঠাপানি" নিয়ে যায়। যশোহরের কোটালের লোকেরা অপরাধীদিগকে "ঢেক্কা" মারিতে মারিতে উত্তরমশানের অভাবে দড়াটানার উত্তরপারে লইয়া যায়। এখনও যশোহরের বাজারে "কুপী ভরি তৈল দেয় তেলী" (কচঃ ৩০) যশোহরের মজলিশে এখনও "উপরে টাঙ্গায় চান্দা" যদিও তাহাতে আর ধবল চামরবান্ধা থাকেনা, (১৫৯) আর সেখানে দরিদ্রের বিছানা এখনও সেই "পায়ালের খড়।" যশোহরের লহনারা পূর্ব্বের মতই কথায় কথায় রাগ করিয়া "নায়রে" যান, (১৬৬) আবার সময় সময় "চিতলের কোল"ও ভাজেন (২১০)। ষোড়শশতাব্দীর "বাদীয়ার পো"রা যশোহরে "বাদীয়ার পো" থাকিলেও আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের কৃপায় "বেদে" প্রবেশলাভ করিয়াছে। কিন্তু, দিন দিন আমরা যেরূপ আত্মহারা হইয়া অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতে বোধহয় যশোহরের এ গৌরব আর অধিক দিন থাকিবে না।

শ্রীবিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ।

পুরুষার্থমীমাংসা-সূত্রম্।

(শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-শারদাপীঠ প্রভাসপত্তন-মঠাধীশ্বর শ্রীযুক্ত ত্রিবিক্রমতীর্থ স্বামিবিরচিতম্)

১। অথাতঃ পুরুষার্থজিজ্ঞাসা। ২। ব্রহ্মীভাবঃ পুরুষার্থঃ। ৩। নির্দ্দোষং সমঞ্চ ব্রহ্ম। ৪। তদ্বত্বং ব্রহ্মীভাবঃ। ৫। দোষঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ। ৬। ততোঽস্যুর্মালিঙ্গং। ৭। ত্রেধা তৎ। ৮। রজস্তমশ্চ তদবিশেষবিশেষাভ্যাম্। ৯। কামাদয়ো রজসঃ উদয়াৎ। ১০। নিদ্রাদয়োঽন্যস্য। ১১। তস্য লোপঃ ক্রমশ ইতরাধিক্যে। ১২। সত্বাৎ তস্য চ। ১৩। জ্ঞানাদয়শ্চ। ১৪। তদা প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা। ১৫। যতস্তৎ কাশতে। ১৬। তদ্বিবর্দ্ধকানি

তু কর্ম্মধ্যানস্বাধ্যায়াদীনি। ১৭। পরার্থানি সৎকর্ম্মাণি স্বস্ববর্ণাশ্রমোচিতানি। ১৮। ব্রহ্মার্পণান্যপি। ১৯। অতঃ কর্ম্মাসগতিরাবশ্যকী। ২০। দেশকালাদিভিঃ ফলভেদোভূয়ান্ যতঃ। ২১। অপ্রমাদাদিনৈব লাভঃ সর্ব্বত্র। ২২। ধৃত্যাদিকমপি অপেক্ষিতম্। ২৩। ধ্যানঞ্চাত্মবিষয়ম্। ২৪। আত্মা পুরুষঃ। ২৫। শুদ্ধোবুদ্ধশ্চ। ২৬। সর্ব্বাত্মবিষয়ং হি। ২৭। স হি বিরাট্। ২৮। ঈশ্বরশ্চ। ২৯। আত্মানাত্মসর্ব্বাত্মজ্ঞানাপেক্ষা চাতঃ। ৩০। অনাত্মা প্রকৃতিঃ। ৩১। জগচ্চ। ৩২। তদ্বিকারত্বাৎ। ৩৩। বৃত্তিনিরোধো জ্ঞানসাধনম্। ৩৪। সর্ব্বজ্ঞে চিত্তপ্রণিধানং বা। ৩৫। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং সঃ। ৩৬। বিবেকানন্তর্য্যমপেক্ষতে চ। ৩৭। শমাদিকমাবশ্যকম্। ৩৮। ইচ্ছাদার্ঢ্যে প্রযত্নারম্ভঃ। ৩৯। অধিমাত্রস্য ফলং ঝটিতি। ৪০। তীব্রসংবেগেহভ্যাসন্নং চ। ৪১। দীর্ঘকালাদি মুখ্যাঙ্গম্। ৪২। যোগ্যোযত্নোহভ্যাসঃ। ৪৩। তৎসাধনেতরোপেক্ষৈব বৈরাগ্যম্। ৪৪। মৈত্র্যাদি তদুপকারি। ৪৫। সর্ব্বজ্ঞো বেদঃ। ৪৬। আচার্য্যশ্চ। ৪৭। অনাদিপরম্পরাতঃ। ৪৮। স্বাধ্যায়ো বৈদিকশ্চাপি। ৪৯। স্বরার্থজ্ঞানভাবনাপূর্ব্বশ্চেৎ সফলঃ। ৫০। গুণাবির্ভাবঃ সম্যগ্ভাবনাতঃ। ৫১। স্বরসাম্যবদপার্থক্যদর্শনং সমত্বং। ৫২। পার্থক্যং ভেদো পূর্ত্তিঃ। ৫৩। অপূর্ত্তেশ্চাবচ্ছেদাৎ। ৫৪। স্বগতাদিশ্চ। ৫৫। অধ্যাসাৎ। ৫৬। অজ্ঞানাৎ সঃ। ৫৭। অবিদ্যাচাপি। ৫৮। তচ্চানাদিবীজাঙ্কুরবৎ সংস্কারপ্রবাহাৎ। ৫৯। সংসারঃ সংস্কারপ্রবাহ এব। ৬০। ততোদুঃখমেব বিবেকিনাম্। ৬১। জ্ঞানাৎ পূর্ত্তিঃ। ৬২। ততঃ সুখম্। ৬৩। ভূমৈব। ৬৪। তদ্ব্রহ্মাত্মানাত্মসর্ব্বাত্মসমাহারত্বাচ্চ। ৬৫। যোগাসমাহারঃ সাম্যেনৈব। ৬৬। নির্দোষত্বাচ্চ। ৬৭। তদনুভূতিরধিষ্ঠানব্যাপ্তিজজ্ঞানাৎ। ৬৮। সচ্চিদখণ্ডানন্দানৈন্ত্যৈক্যবোধাৎ। ৬৯। নিষ্কলত্বানুভবাৎ। ৭০। তাদাত্ম্যেন অবস্থানাৎ। ৭১। অনহংভাবাৎ। ৭২। সর্ব্বস্মিন্নহম্ভাবাদ্বা। ৭৩। সার্ব্বাত্ম্যানুভূতের্ব্বা। ৭৪। সর্ব্বভাবেন শরণকরণাৎ সর্ব্বাত্মনঃ। ৭৫ অস্পার্শযোগাদপি। ৭৬। দহরবিদ্যাদিভিরপি। ৭৭। নিরালম্বনাচ্চ। ৭৮। আবরণনাশস্তস্মাৎ। ৭৯ বিক্ষেপনাশে সত্যেব জ্ঞানযোগাধিকারঃ। ৮০। দৃষ্টিসৃষ্টিঃ। ৮১। তদর্থমুপাসনাযোগঃ। ৮২। আরাধনাযোগো ভক্তিভেদাৎ ত্রিধা। ৮৩। প্রথমা নানা। ৮৪। শ্রৌতী স্মার্ত্তী পৌরাণিকী তান্ত্রিকীচেতি ভেদাৎ। ৮৫। অধিকারিভেদাচ্চ। ৮৬। অহংপ্রতীকগ্রহভেদাভ্যাং মুখ্যা বেধা। ৮৭। প্রাতীকাং শ্রদ্ধারামহংগ্রহাধিকারঃ। ৮৮। ততো নিরালম্বস্থিতিঃ। ৮৯। যথাপ্রকৃত্যাদি

প্রাতীকী। ৮৯। যোগো দেবা। ৯০। হঠলয়ভেদাৎ। ৯১। চতুর্ধা [illegible]। ৯২। রাজমন্ত্রযোগাধিক্যাৎ। ৯৩। ন, রাজযোগস্য জ্ঞানযোগে-[illegible]বাৎ। ৯৪। মন্ত্রযোগস্য চারাধনায়াম্। ৯৫। হঠশ্চোক্তো গোরক্ষাদিভিঃ। [illegible] নাদানুসন্ধানং লয়যোগঃ। ৯৭। যত্রকুত্রাপি মনঃ-স্পন্দরোধনমেব মুখ্যম্। [illegible]দেবতাপ্রণিধানাদপি। ৯৯। ভক্তিযোগে ভাবস্য প্রাধান্যম্। ১০০। [illegible]। ১০১। তদর্থং স্থায়িভাবাদ্যপেক্ষা। ১০২। পরিপাকাচ্চিত্ত-[illegible] ১০৩। মলনাশে সত্যেব উপাসনাধিকারঃ। ১০৪। তদর্থং [illegible]। ১০৫। অত্রাধিকার-ভেদোঽবশ্যম্ভাবী। ১০৬। প্রকৃতি-বৈচিত্র্যাৎ। ১০৭। অত আশ্রমানাং ব্যবস্থা। ১০৮। তদ্‌যোগ্যতা বৈর্বর্ণানাঞ্চ। ১০৯। বর্ণত্বা-বির্জন্মনা। ১১০। সম্ভাবনাৎ। ১১১। আনুবংশ্যগুণদোষদর্শনাভ্যাম্। ১১২। যোগ্যকর্ম্মণা উদ্দীপ্তিস্তস্য। ১১৩। যুক্তং কর্ম্ম বিহিতকরণং। ১১৪। অবিহিতা-করণঞ্চ। ১১৫। গুণসম্পাদর্জ্জনঞ্চ। ১১৬। শ্রুতঃ চ। ১১৭। সমাদরার্হঞ্চৈতৎ। ১১৮। তদ্বিহীনস্য ব্রাত্যত্বম্। ১১৯। সংস্কারহীনত্বাদপি। ১২০। সংস্কারাৎ শ্রুতেন চ বর্ণত্বং তস্য। ১২১। গুণসমুচিতঞ্চ। ১২২। শ্রুতগুণসম্পদা বিহীনস্য সংস্কারযুক্তস্য বর্ণত্বাভিধানমেব। ১২৩। নার্থকরং তৎ। ১২৪। কর্ম্মযোগানুষ্ঠানাৎ ক্রমেণানুভূতিস্তৎসাম্যস্য। ১২৫। কর্ম্মযোগশ্চ বর্ণাশ্রমো-চিতং কর্ম্ম। ১২৬। বর্ণোব্বর্ণাৎ। ১২৭। আশ্রমঃ আস্থিতেঃ। ১২৮। বর্ণশ্চতুর্ধা। ১২৯। আশ্রমশ্চ। ১৩০। শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রব্রাহ্মণাঃ বর্ণাঃ ১৩১। ব্রহ্মচর্য্যগার্হস্থ্য-বানপ্রস্থসন্ন্যাসাঃ আশ্রমাঃ। ১৩২। শূদ্রো জন্মনা। ১৩৩। শুচোদ্রবণাৎ। ১৩৪। সংস্কারাৎ যোগ্যতাপ্রকাশঃ। ১৩৫। গুণাধানার্থং সংস্কারঃ। ১৩৬। দোষনিবারণার্থং চ। ১৩৭। বৈজগার্ভৈনোবারণার্থমপি। ১৩৮। সত্ত্বোদ্বোধনমতঃ। ১৩৯। উপশমশ্চ রজস্তমসোঃ ক্রমেণ। ১৪০। গর্ভাধানাদয়শ্চ সংস্কারাঃ। ১৪১। ততোযথোচিতং দেহাদীনাং বিকাশঃ। ১৪২। বিনয়ন-যোগ্যতাচ। ১৪৩। জীবিকাপরীক্ষণমপি। ১৪৪। দ্বিজত্বসম্ভা-বনাপি। ১৪৫। পরমুপনয়নাদেব দ্বিজত্বম্। ১৪৬। তৎস্থৈর্য্যমাচারাৎ। ১৪৭। আচারস্তু স্বস্ববর্ণাশ্রমোচিতকর্ত্তব্যম্। ১৪৮। তদভাবে পাতিত্যম্। ১৪৯। অবিহিতকরণাদপি। ১৫০। ব্রাত্যাদিসংসর্গাচ্চ। ১৫১। তৎশুদ্ধিস্তু প্রায়-শ্চিত্তেন। ১৫২। পশ্চাত্তাপপূর্ব্বং চেৎ। ১৫৩। প্রায়শ্চিত্তং শাস্ত্রাৎ। ১৫৪। পর্ষদুক্তং বা। ১৫৫। দেশাদিবিচারণাপূর্ব্বম্। ১৫৬। ব্রহ্মচর্য্যারম্ভশ্চ উপনয়নাৎ। ১৫৭। বিদ্যাধ্যয়নঞ্চ। ১৫৮। ব্রহ্মণে ব্রতঞ্চরতীতিশ্রুতেঃ। ১৫৯। অধ্যয়নহেতবঃ।

১৬০। সামর্থ্যোৎপাদনং স্বাস্থ্যৈশ্বর্যসম্পাদনঞ্চ। ১৬১। ব্যবহারনৈপুণ্যঞ্চ। ১৬২। স্বকর্ত্তব্যদাক্ষ্যং। ১৬৩। তদর্থমাত্মানাত্মতত্ত্ববোধঃ। ১৬৪। গুর্ব্বধীনঃ। ১৬৫। প্রসাদাৎ অধিগম্যতে। ১৬৬। প্রসাদস্তু দাস্যাৎ। ১৬৭। দোষ-তিরোধানঞ্চ শিক্ষয়া। ১৬৮। অনুভবযোগ্যতাচ ধিয়ঃ। ১৬৯। উপাসনা-প্রবেশশ্চ ১৭০। তত্তইষ্টাদেরভেদশ্চ। ১৭১। স্বযোগ্যতা প্রকাশশ্চ। ১৭২। শিক্ষাং অনু বর্ণনিশ্চয়ঃ। ১৭৩। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতীতি ব্রহ্মবাদী। ১৭৪। ক্ষত্রাত্রাতৃত্বাৎ ক্ষত্রম্। ১৭৫। শমাদি শৌর্য্যাদিচ লক্ষণে যথাসঙ্খ্যম্। ১৭৬। বিশতি বার্ত্তায়াং এব ইতি বিট্। ১৭৭। যথাবর্ণপত্নীপরিগ্রহঃ, গৃহ-স্বীকারশ্চ। ১৭৮। গৃহান্ত্যধ্যায়োপযোগোঽত্র অর্থার্জ্জনায়। ১৭৯। কামায় চ। ১৮০। ধর্ম্মায় মুখ্যশঃ। ১৮১। অবিরোধেন। ১৮২। প্রজোৎপাদনেন চ। ১৮৩। নিত্যানাং সমনুষ্ঠানং তস্য। ১৮৪। শ্রুতেঃ। ১৮৫। নৈমিত্তিকানাঞ্চ। ১৮৬। স্মৃতেশ্চ। ১৮৭। সৎকাম্যানাং। ১৮৮। প্রায়শ্চিত্তানামপি। ১৮৯। নিত্যানি বর্ণাশ্রমোচিতানি। ১৯০। আহ্নিকানিচ। ১৯১। নৈমিত্তিকানি সংস্কারাদীনি। ১৯২। পাকসংস্থাশ্চ। ১৯৩। সোমসংস্থা অপি। ১৯৪। আভ্যুদয়িকার্থানি কাম্যানি। ১৯৫। পরানর্থকরাণি নচেৎ। ১৯৬। জবন্যানোব শ্রুতেঃ। ১৯৭। পুনঃসন্ধানার্থকানি প্রায়শ্চিত্তানি ধর্ম্মলোপে। ১৯৮। তান্যপি-কর্ত্তব্যানি শ্রূয়ন্তে। ১৯৯। তৎসমনুষ্ঠানাৎ আত্মগুণোদয়ঃ। ২০০। অধ্যাত্ম-ভূমিজয়শ্চ। ২০১। শক্তিবিকাশশ্চ। ২০২। বিত্তাসামর্থ্যলাভশ্চ। ২০৩। নিশ্চয়বলঞ্চ। ২০৪। দয়াদিরাত্মগুণঃ। ২০৫। যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদপিতু। ২০৬। সাবিত্রীজপমাত্রাচ্চ। ২০৭। তদর্থভাবনাপূর্ব্বং সস্বরমুচ্চারণঞ্চ জপঃ। ২০৮। অর্থানুবর্ত্তনং চেৎ ফলদং শীঘ্রম্। ২০৯। স্বরজ্ঞানমূলমর্থজ্ঞানম্। ২১০। ভাবনা তন্মূলা। ২১১। নাস্যমনস্কশ্চেৎ ঋষিসত্বং প্রবিশতি কালেনাস্যমনস্কোপি। ২১২। ততোঽর্থাববোধঃ ভাবনাজ্ঞানং অনুবর্ত্তনং ঈশানুভবশ্চ ক্রমেণ। ২১৩। কেবলং মহাযজ্ঞানুষ্ঠানাচ্চাপিহি। ২১৪। দেবর্ষিপিত্রানৃণ্যং ভূতসেবাচ ততঃ। ২১৫। সমাজরক্ষাচ আশ্রমিসৎকারাদ্ধ। ২১৬। সহানুভূতির্দয়াচ আবশ্যকী তত্র। ২১৭। ভূতমাত্রং প্রতিচ। ২১৮। ততঃ সমব্যাপ্তিঃ ক্রমশঃ। ২১৯। স্ত্রীপুত্রাদি-দৃশোঽভেদশ্চ। ২২০। আত্মৈক্যৈব পরোধর্ম্মঃ সর্ব্বত্রঃ। ২২১। যাবদভেদানু-ভবঃ আত্মত্বম্। ২২২। সমত্বঞ্চ। ২২৩। ততস্তত্রসুখপ্রতীতিঃ সার্ব্বজনীনা। ২২৪। অনুভূতিরেবসত্যম্। ২২৫। সত্যান্নাস্তি পরোধর্ম্মঃ। ২২৬। এতদনু-সাধেন কর্ম্মযোগানুষ্ঠানম্। ২২৭। ক্রমশঃ সর্ব্বাত্মতাভিবৃদ্ধিস্ততঃ। ২২৮।

আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসোদয়ঃ। ২২৯। তদর্থং বনে প্রস্থানম্। ২৩০। বনতি সর্ব্বান্ ইতি আত্মা বনম্। ২৩১। বিবিধাশ্চাত্র দীক্ষা অনুষ্ঠেয়া। ২৩২। দদাতি ক্ষিণোতিচ দিব্যভাবং পাপসঞ্চয়ং চ। ২৩৩। হিংসাদানি পাপকর্ম্মাণি। ২৩৪। অশুভ-বাসনাঃ তন্মূলানি। ২৩৫। আসুরী সম্পৎ চ ফলম্। ২৩৬। অহিংসাদীনি শুভকর্ম্মাণি। ২৩৭। দৈবীসম্পচ্চ ফলম্। ২৩৮। শুভবাসনয়াপ্যতে। ২৩৯। দিব্যভাবঃ স এব। ২৪০। ততোহন্তর্দীক্ষা জায়তে। ২৪১। তদভ্যাসাচ্চাত্ম-সাক্ষাৎকারঃ। ২৪২। মন্ত্রদর্শনমপি অতোহত্রৈব। ২৪৩। দীক্ষাশ্চোক্তা উপনিষৎসু। ২৪৪। গ্রাম্যভোগবতা ন তৎসিদ্ধিরাপ্যতে। ২৪৫। সংশয়নিবৃত্তিঃ হৃদয়গ্রন্থি-ভেদশ্চ সিদ্ধিঃ। ২৪৬। তত আচার্য্যকুলনিবর্হনঞ্চ। ২৪৭। সর্ব্বানুভূতিশ্চান্তে। ২৪৮। সমদৃগ্‌ভূত্বা সর্ব্বত্র পরিব্রজতি ততঃ। ২৪৯। স এব শ্রেষ্ঠঃ কৃতকৃত্যশ্চ। ২৫০। অতঃ পরং সন্ন্যাসঃ। ২৫১। এষণাত্রয়রাহিত্যাৎ। ২৫২। নির্দোষত্বঞ্চাপি। ২৫৩। পরমং সাম্যঞ্চোপৈতি। ২৫৪। তস্য চাতুর্ব্বর্ণে ভৈক্ষ্যাচর্য্যা। ২৫৫। তস্মিন্ শূদ্রবিট্‌ক্ষত্র ব্রহ্মত্বাদিঃ একত্রৈবস্থিতাবিরাজীব। ২৫৬। অতএব ন বর্ণী নাবর্ণী। ২৫৭। নাশ্রমী নানাশ্রমী। ২৫৮। অত্যাশ্রমীত্যুচ্যতে। ২৫৯। আচার্য্যঃ খলু যথার্থস্য স এব। ২৬০। বেদবিচ্চ। ২৬১। লোকসংগ্রহমেবাস্য কর্ম্ম, ২৬২। সর্ব্বভূতহিতে রতত্বাদেবাস্য ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তকত্বং চাতঃ। ২৬৩। অর্য্যাঃ সৈষো ব্রাত্য ইতি হি শ্রুতেঃ। ২৬৪। তস্যৈব সাম্যানুভবঃ পূর্ণঃ। ২৬৫। তদানীং জীবন্মুক্তিঃ। ২৬৬। ততোবিদেহমুক্তির্হি। ২৬৭। সৈব পরঃ পুরুষার্থঃ। ২৬৮। শাস্ত্রাদেবাস্যাবগতিঃ। ২৬৯। তদঙ্গকর্ত্তব্যনিশ্চিতিঃ। ২৭০। প্রবৃত্তিশ্চ যথাযোগ্যা। ২৭১। সৈব সাধ্যতাং সৈব সাধ্যতাম্। ওঁ শান্তিঃ :— *

পঞ্জিকা-সংস্কার।

আজকাল পঞ্জিকা-সংস্কার লইয়া বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে। শুনিলাম "বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ-সভা" পঞ্জিকা-সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। পূর্ব্বে মীন ও মেষ রাশির সংযোগস্থলে সূর্য্য উপনীত হইলে দিবা ও রাত্রি সমান হইত, অর্থাৎ বিষুবপাত হইত, আর আজকাল সূর্য্য মীনরাশির ৭৷৹ অংশের নিকট উপনীত হইলেই দিবা ও রাত্রি সমান হইয়া থাকে—অর্থাৎ বিষুবপাত পশ্চাদ্-

* পর পর সংখ্যায় ক্রমশঃ এই সমস্ত সূত্রের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইবে। হিঃ পঃ সঃ।

গতিতে (Precession of equinox) প্রায় ২২॥০ অংশ * পশ্চিমে সরিয়া আসিয়াছে। এই বিষয়টীই বঙ্গে পঞ্জিকা-বিভ্রাটের একমাত্র কারণ নহে। ইংরাজি-মতে ২১ মার্চ্চ সূর্য্য বিষুবরেখায় first point of Aries এ উপনীত হইলে মার্চ্চ-মাসের শেষ ও পরদিন ১ এপ্রিল ধরা হয়না। বাঙ্গালাপঞ্জিকাতেও ৭ই। ৮ই চৈত্র সমদিবা-রাত্রির দিন চৈত্রমাসের শেষ ও পরদিন ১ বৈশাখ ধরা হয় না। বস্তুতঃ ঐরূপ ধরিলেই যে পঞ্জিকা-বিভ্রাট দূর হইবে তাহাও নহে। ইংরাজিতে 'ক্রান্তিপাত' যে অর্থে ধরা হয়, বাঙ্গালা-পঞ্জিকার "সংক্রান্তি"র অর্থ সেরূপ নহে। সূর্য্যের রাশি-প্রবেশকালকে সংক্রান্তি বলা হয়, এবং এক রাশিতে প্রবেশ হইতে পরবর্ত্তী রাশিতে প্রবেশের পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত কালকে সৌরমাস বলা হয়। যেদিন সূর্য্য মেষরাশিতে প্রবেশ করেন, সেইদিন বঙ্গাব্দের বর্ষ-গণনা আরম্ভ হয়, এবং পঞ্জিকায় 'মহাবিষুব সংক্রান্তি' বলা হয়। এই 'মহা-বিষুব' শব্দটীর আজকাল আর কোনও সার্থকতা নাই, অবশ্য পূর্ব্বে ছিল। পঞ্জিকার গণকগণ এক্ষণে 'মহাবিষুব' শব্দটী তুলিয়া দিয়া কেবলমাত্র 'মেষ-সংক্রান্তি' শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোন লাভ নাই। কথা হইতেছে পঞ্জিকার গণনা লইয়া। সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি-ভ্রমণ-কালকে সৌরবর্ষ বলা হয়, সৌরবর্ষের অপর নাম নাক্ষত্রিক বর্ষ। ইহাতে অয়নের কোন সংস্কার করা হয় না। এইজন্য পাশ্চাত্য 'সায়ন বর্ষের' সহিত আমাদের সৌরবর্ষ মিলেনা। ইহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি তত বেশী কিছু নাই। কথা হইতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য ও অপর গ্রহগণের ভগণকাল লইয়া।

একদিন যে নক্ষত্রের সহিত সূর্য্য পূর্ব্বক্ষিতিজে উদিত হন, সেই নক্ষত্র পরদিন নিশাশেষে আবার যখন পূর্ব্বক্ষিতিজে উদিত হয়, তখন সূর্য্যোদয় হয় না, সূর্য্যোদয় কিছু বিলম্বে হইয়া থাকে। যে রাশিতে সূর্য্য থাকেন, সেই রাশির উদয়কালকে সূর্য্যের দৈনিক গতি দ্বারা গুণ এবং রাশিগত কলা দিয়া ভাগ করিলে, যে সময় পাওয়া যায়, সেই সময় বিলম্বে সূর্য্যোদয় হয়। এই সময় নাক্ষত্রিকদিনের সহিত যোগ করিলে এক স্পষ্ট সাবন দিন হয়। এই দিন সর্ব্বদা সমান থাকেনা; কারণ উহা প্রথমতঃ সূর্য্যের দৈনিক গতি এবং দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ভিন্ন রাশির উদয়কালের উপর নির্ভর করে। এই দুইটী বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। নাক্ষত্রিক দিনের পরিমাণও ঠিক্ ঠাক্ ৬০ দণ্ড নহে, কিছু কম হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন

* বাঙ্গালা-পঞ্জিকার মতে ২১।১৫।১৮ অংশ।

কিরূপ এবং কত কম, তাহা নির্ভুল ও সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করার উপরেই পঞ্জিকার বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

চন্দ্র, সূর্য্য ও অপরাপর গ্রহগণের ভগণ অর্থাৎ আকাশের কোনও নির্দ্দিষ্ট বিন্দু বা তারা—যেমন রেবতীনক্ষত্র (Zeta piscium) হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া আকাশ ঘুরিয়া পুনরায় ঐ স্থানে আসিতে যে সময় লাগে তাহা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-মতে ভিন্নরূপ হইতে পারেনা। যেহেতু ইহা বলাই বাহুল্য যে, একই চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণ আকাশের একই পথে একই প্রকার স্ব স্ব গতিতে ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীর সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-হেতু গ্রহগণের কৌণিক দূরত্বের অনুপাতে অথবা সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ ও পাতনামক দেবতাদিগের আকর্ষণে এবং প্রবহনামক বায়ুপ্রবাহের জন্য গ্রহগণের গতি বক্র, অনুবক্র, কুটিল প্রভৃতি ভেদে আট প্রকার হইয়া থাকে। ঐ আট প্রকার গতি আবার সরল ও বক্রভেদে দুইশ্রেণীতে বিভক্ত। সূর্য্যের ন্যায় কোন গ্রহ কোন নির্দ্দিষ্ট তারার সহিত একদিন উদিত হইলে, পরদিন আর ঐ তারার সহিত উদিত হয়না। গ্রহের সরল-গতির সময়ে কিছু বিলম্বে এবং বক্রগতির সময়ে কিছু পূর্ব্বে উদিত হয়। এই সকল বিষয় সূক্ষ্ম ও নির্ভুল গণিত হইলে পাশ্চাত্য Nauticul Almanac এবং আমাদের পঞ্জিকার গ্রহস্ফুট না মিলিয়া পারেনা। এই সকল গণনা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সূক্ষ্ম হয় না বলিয়াই আমাদের পঞ্জিকার কোন কোন গণনা প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে সময়ে সময়ে মেলে না; নাবিক-পঞ্জিকার গণনা বেশ মেলে।*

একবার পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে চন্দ্রের যে সময় লাগে তাহাকে চন্দ্রের ভগণ (Sidereal month) বলে। উহার পরিমাণ পাশ্চাত্য-মতে ২৭·৩২১৬৬ দিন, প্রাচ্যমতে ২৭·৩২১৬ দিন। চন্দ্র যে সময়ে একবার পৃথিবী ঘুরিয়া আইসে, সেই সময় পৃথিবী একস্থানে স্থির হইয়া থাকেনা, সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিবার জন্য আপন কক্ষার কতক পথ অতিক্রম করিয়া

* আমাদের পঞ্জিকাকারগণ আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন দ্বারা স্ব স্ব পঞ্জিকার বিশুদ্ধতা-প্রচারের যতই কেননা চেষ্টা করুন এবং পাশ্চাত্য নাবিক-পঞ্জিকা 'অশাস্ত্রীয় ও অহিন্দু' বলিয়া যতই কেননা প্রচার করুন, তাহাতে প্রকৃত লাভ নাই। আমাদের পঞ্জিকায় এবারে শুক্র ও শনৈশ্চরের স্ফুট গণনায় যে ভুল হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেহেতু উক্ত জ্যোতিষ্কদ্বয়ই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছে। যাঁহারা আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা শুক্র ও শনৈশ্চরের এই রঙ্গ (phenomenon) দেখিয়াছেন।

যায়. সুতরাং চন্দ্রকেও পৃথিবীর সহিত ভূ-কক্ষার কতক অংশ ভ্রমণ করিতে হয়। এই ভ্রমণে যে অতিরিক্ত সময় লাগে, তাহা চন্দ্রের ভগণের সহিত যোগ করিলে চান্দ্রমাস পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এক অমাবস্যা হইতে পুনঃ অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময়কে চান্দ্রমাস (synodical month) বলে। পাশ্চাত্যমতে উহার পরিমাণ ২৯.৫৩০৫৯ দিন, প্রাচ্যমতে ২৯.৫৩০৫ দিন উহার স্থূল-পরিমাণ। কার্য্যক্ষেত্রে চান্দ্রমাসকে ৩০ ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার এক এক ভাগকে তিথি বা চান্দ্রদিন বলা হয়। ধর্ম্মকার্য্যের কাল ও যাত্রার শুভাশুভ এই তিথি দ্বারা নিরূপিত হয়। * সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গণনার সূক্ষ্মতা ও নির্ভুলতার উপরেই পঞ্জিকার বিশুদ্ধতা নির্ভর করে।

আকাশে রাশি ও নক্ষত্রগণের সীমা এবং অবস্থিতির বিষয়ও বিচার-সাপেক্ষ। রেবতীনক্ষত্রের শেষ অংশে সূর্য্য উপনীত হইলে বঙ্গাব্দের শেষ ও নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। গ্রহগণের ভগণও এই রেবতীনক্ষত্রের শেষ হইতে গণিত হয়। রেবতীনক্ষত্রের শেষ আকাশে রবিপথের কোন্ বিন্দুতে তাহা স্থির করিতে হইবে; এবং যাহাতে উহা সর্ব্ববাদিসম্মত হয়, তাহা করিতে হইবে। আকাশের যে সকল তারাকে এক্ষণে 'অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র' ধরা হয়, উহারা ঠিক্ কিনা, উহাদের সীমা সর্ব্ববাদিসম্মত কিনা, বিচার করিতে হইবে, নতুবা গ্রহগণের সঞ্চার বা রাশি-প্রবেশ এবং তিথির সহিত নক্ষত্র প্রত্যক্ষদর্শনে সর্ব্বথা মিলিবে না। এখনও প্রায়ই মেলেনা। চন্দ্রের যেদিন পূর্ব্বাষাঢ়া অথবা শ্রবণা নক্ষত্রে থাকিবার কথা, প্রত্যক্ষ-দর্শনে দেখা গিয়াছে যে, ঐ নক্ষত্রদ্বয় (delta sagittarie ও alpha Aquilae) যে বিষুবাংশে (R. A.) অবস্থিত, চন্দ্র ঐদিন তথা হইতে অনেক পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। আচার্য্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রমুখ আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিতগণ, যাঁহারা পঞ্জিকা গণনা করেন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া, এই সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এবং যে সকল 'সারণী' অবলম্বনে পঞ্জিকা গণিত হয়, তাহাতে কি কি দোষ আছে, গণনায় কি ভুল হইতেছে, এই সকল বিষয় বিচারপূর্ব্বক বীজসংশোধন করিলে, অনেক সুফলের আশা করা যায়।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

---

* সকল তিথির পরিমাণ সমান নহে, চন্দ্রের গতির তারতম্য অনুসারে তিথির কম বেশী হইয়া থাকে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শোক-সংবাদ।

নদীপুরের মহারাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর এফ্ আর্ এস্ এ মহাশয় গত ৩রা মে তারিখে তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে লোকান্তরিত হইয়াছেন। মহারাজ রণজিৎ কর্ম্মী মহাপুরুষ ছিলেন। দেশের বহু সৎকর্ম্মের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। মহারাজ যোগ্যতায় ও বিজ্ঞতায়, মহত্ত্বে ও গুণগরিমায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে পরলোকে শান্তিদান করুন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

উপাধিলাভ।

কলিকাতার খ্যাতনামা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পৌত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন পুরীধামের 'মুক্তিমণ্ডপ'সভার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'দর্শননিধি' উপাধি পাইয়াছেন। ভগবৎকৃপায় কবিরাজ মহাশয় উপাধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হউন্।

সৈন্যদলে প্রবেশ।

কুমিল্লার নবাব বাহাদুরের পুত্র ও নবাব সিরাজুল্ ইস্লাম্ খাঁ বাহাদুরের জামাতা সম্প্রতি 'বাঙ্গালী সৈনিক' হইয়া রণবিদ্যাশিক্ষার্থ করাচী যাত্রা করিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর-ফলোপধায়ক, সন্দেহ নাই।

মুক্তি।

শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর মজুমদার বি-এ ময়মনসিংহ—আসমিঠায় আটক ছিলেন, সম্প্রতি বঙ্গীয়গবর্ণমেণ্ট জামিন্ লইয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

সৈন্যসংগ্রহে সাহায্য।

ভাগ্যকুলের বিখ্যাতনামা রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়, রায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় বাহাদুর ও মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় বাহাদুর প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, মুন্সীগঞ্জ-মহকুমার অন্তর্গত স্থানের অধিবাসিবর্গের মধ্য হইতে যে সমস্ত লোক "বাঙ্গালী সৈন্য"দলে যোগদান করিবে, তাহাদের প্রত্যেককে তাঁহারা এককালীন ৫০৲ টাকা ও যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত মাসিক ৮৲ হিসাবে বৃত্তি প্রদান করিবেন। ঐরূপ কোনও সৈনিকের (দুর্ভাগ্যক্রমে) যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহারা তাহাদের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ বার্ষিক ৫০৲ টাকা দিবেন। সৈনিকের সরকারী বেতন ইহার মধ্যে নহে। এ সুবিধা স্বতন্ত্র। সাধু চেষ্টা।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৫ বর্ষ, ২৫শ খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩২৫ সাল।
১৮৪০ শকাব্দ।

অনুভূতি।

তুমি মঙ্গলময়,
তোমারি ইঙ্গিতে ইন্দু কেমন
গগনে উদিত হয়;
কোটি কোটি কোটি তারা—
বহে আলোক-ধারা;
কত যুগ-যুগান্তের গাথা
গাহে জলদচয়!
নিত্য এ লোকে ও লোকে
জাগিছ পুণ্য-পুলকে,
তব অমৃত-পরশ লইয়া
প্রভাত-সমীর বয়!
পোহালে তিমির-রাতি
জাগে আনন্দ-ভাতি

ফোটে কুসুম কানন-কান্তারে
রটে তোমার জয়!
দিকে দিকে কত বাণী
উঠিছে জগৎস্বামী,
ছুটিছে প্রেম-নির্ঝর তব
টুটিছে সকল ভয়!

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ

পরকাল।

(১)

মানবসমাজে পরকাল সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিশ্বাস থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বিশ্বাস গুলি পরস্পর নিতান্তই বিরুদ্ধ ও বিপরীত। চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ বলেন,—"মানবের পূর্ব্বকাল-পরকাল কিছুই নাই, সমস্তই ভ্রান্তি; মৃত্যুর পর ভস্ম ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা।

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।"—চার্ব্বাকদর্শন

তাঁহাদের মতে দেহাদি ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই এবং দেহ ভস্ম হইয়া গেলে তাহার আর পুনরাগমন সম্ভব নয়। যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায় ততদিন সুখভোগ করাই পুরুষার্থ।

পৃথিবীতে এমন ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা অন্যধর্ম্মাবলম্বীর জন্য "অনন্তনরক" ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতে মানবাত্মা ক্রমেই উন্নত-রাজ্যে উত্থিত হইতেছে, কোনও কারণেও তাহার আর অধঃপতন হইবে না।

হিন্দুদিগের শাস্ত্রমত ও বিশ্বাস অন্যরূপ। উল্লিখিত মতের সহিত তাহার কোনরূপ সৌসাদৃশ্য নাই। হিন্দুদের মতে পাপ-পুণ্য আত্মার অবস্থাঘটিত; যিনি যে পরিমাণে বিশুদ্ধ, তিনি সেই পরিমাণে সদগতি লাভ করিবেন। মানবাত্মার সদগতি কোন ধর্ম্মবিশেষে বা সম্প্রদায়বিশেষে নিবদ্ধ নহে।

পরলোক সম্বন্ধে আর্য্যগণের সিদ্ধান্ত কিরূপ, মৃত্যুকে তাঁহারা কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বারা পরলোকগত আত্মার কোন

উপকার সাধিত হয় কিনা, আমরা তাহারই আলোচনা করিব। শ্রাদ্ধাদির উপকারিতা এখন কেহ বড় একটা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, কাজেই এই বিষয়ের আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুর বিশ্বাস যে, ইহলোক ব্যতীত পরলোক আছে এবং ইহলোকে অনুষ্ঠিত কর্ম্মনিচয় পরলোকের গতি নিরূপণ করে। এই জড়দেহ নশ্বর, এই দেহ ভিন্ন আরও কয়েকটী দেহ আছে। ঐ সকল দেহের শুদ্ধি-সাধন করিতে পারিলে, মানব, জন্ম-মরণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নিত্যসুখের অধিকারী হয়। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান ও নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ। হিন্দুর সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মানুমোদিত সংযমের দ্বারা পরিচালিত; সংযম তাঁহাদের মূল মন্ত্র।

আর্য্যশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। আমাদের অনেকবার জন্ম হইয়াছে ও হইবে। মৃত্যুর পর জন্ম ও জন্মের পর মৃত্যু—এইরূপ সংসার-চক্রের আবর্ত্তনে জীব নিয়ত ভ্রাম্যমান।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। গীতা

জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চিত এবং মরিলেই জন্ম নিশ্চিত। মুক্ত পুরুষ ব্যতীত সকলকেই জন্ম-মৃত্যু রূপ-সংসারে যাতায়াত করিতে হয়।

আর্য্যঋষিগণ দেহের অতিরিক্ত "দেহী" মানিতেন। তাঁহাদের মতে শরীর অনিত্য, শরীরের অধিষ্ঠাতা জীব নিত্য। মৃত্যুকালে দেহের সহিত দেহস্থিত চৈতন্যের অর্থাৎ জীবাত্মার বিচ্ছেদ হয় মাত্র। দেহনাশ হইলে জীবের নাশ হয় না।

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। গীতা ২।২০

শরীর নষ্ট হইলে ইহা নষ্ট হয় না।

প্রাণিশরীর পঞ্চভূতাত্মক সুতরাং কাল-সহকারে উহা বিনষ্ট হইয়া যায় কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস হয় না।

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১১।৩

জীব-পরিত্যক্ত এই শরীরই মরে (বিনষ্ট হয়) কিন্তু জীব মরে না।

চৈতন্য জড়দেহের গুণ হইতে পারেনা। এ সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনকারের যুক্তি ও মীমাংসা অতিসমীচীন ও সুসঙ্গত।

পাঞ্চভৌতিকঃ দেহঃ। সাংখ্যসূত্র ৩অঃ ১৭ সূত্র।

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ। ঐ ২০ সূত্র।

দেহ পাঞ্চভৌতিক। জীবের চৈতন্য, উক্ত ভূতের বিমিশ্রণে উপজাত নহে; কারণ পৃথগ্‌রূপে অবস্থিতিকালে কোন ভূতে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না।

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ। ঐ ৩অঃ ২১ সূত্র

চৈতন্য ভূতসকলের ধর্ম্ম হইলে দেহধারীর মরণ, সুষুপ্তি প্রভৃতি চৈতন্য-বিহীন অবস্থা সকল দৃষ্ট হইত না। চৈতন্য দেহ-ধর্ম্ম হইলে সর্ব্বদাই দেহে বর্ত্তমান থাকিত।

মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ। ঐ ২২ সূত্র

যদি বল যে, সুরা প্রভৃতির মাদকতার ন্যায় ভূতসকলের মিশ্রিত অবস্থায়ই চৈতন্যরূপ ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়, তবে উত্তর এই যে, মাদকতা-শক্তি কেবল বিমিশ্রিত অবস্থায় উপজাত হয় না, অবিমিশ্রিত অবস্থায়ও ঐ সকল দ্রব্যে অল্পপরিমাণ মাদকতা থাকে, বিমিশ্রিত অবস্থায় মাদকতার বিকাশ হয় মাত্র। কাজেই চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম নহে, দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ এবং দেহের সহিত ঐ চৈতন্য নষ্ট হয় না। এই চৈতন্যই আত্মা বা জীবাত্মা।

এই বিশ্ব সংসারে দেখা যায় যে, প্রত্যেক কর্ম্মেরই ফল আছে। এমন কোন কার্য্য হইতে পারেনা, যাহার কোন কারণ নাই। (অবশ্য কার্য্যের কারণ সঠিক্ নির্ণয় করা অনেক সময় শক্ত হইয়া উঠে।) যদি দেহের সহিত জীব নষ্ট হয়, তাহা হইলে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। কর্ম্মের বিনাশ নাই; জীব যাহা কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহার ফল-ভোগ তাহাকেই করিতে হয়। দেখা যায়, জীব অনেক সময় অনেক কর্ম্ম করে, কিন্তু তাহার ফলভোগ না করিয়াই মরিয়া যায়। যদি মৃত্যুর সহিত তাহার সব ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কৃত কর্ম্মের ফল কে ভোগ করিবে? একজনের কৃত কর্ম্মের ফল অপর ব্যক্তি ভোগ করে না। অন্যায় কার্য্য করিব আমি, আর রামদাস বা শ্যামদাস ফল ভোগ করিবে, ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অন্যোহি নাশ্নাতি কৃতং হি কর্ম্ম।

একজনের কৃতকর্ম্মের ফল অপরব্যক্তি ভোগ করেনা। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।

একোহনুভুঙক্তে সুকৃতং এক এবতু-দুষ্কৃতং ॥ ৪। ২৪০

জীব একাকীই উৎপন্ন হয় এবং একাকীই বিলয় পায়। একাকী স্ব স্ব সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে। অনেকস্থলে দেখা যায়, পিতা নিজ দুরাচারবশতঃ যে সকল ব্যাধি অর্জ্জন করিয়াছেন, পুত্রে তাহা সংক্রামিত হইতেছে। লোকে বলে—"নিরপরাধ পুত্রে পিতার ফল ফলিতেছে", কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুত্রের জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই তদনুকূল অবস্থা-সম্পন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ ঘটিয়াছে। নচেৎ পিতার দুষ্কৃত সন্তানে ফলিবে—ইহা কখনও বিশ্বনিয়ন্তার ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারেনা। কাজেই দেখা যায় যে, আমরা যে সকল কর্ম্ম করিয়া মরিয়া যাই, তাহার ফল-ভোগ করিবার জন্য আমাদিগকে পুনরায় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হইবে।

দেবত্বমথ মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা।

কৃমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ যাতি জন্তুঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥

জীব নিজ কর্ম্মবশে দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কৃমি ও স্থাবর বৃক্ষাদি-জন্ম লাভ করিয়া থাকে। ভোগ ভিন্ন শতকোটি কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। জীবকে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে।

যাঁহারা বলেন—নিত্য নূতন জীব সৃষ্টি হইতেছে এবং পূর্ব্বজন্ম নাই, তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যদি দেহ-বিনাশের পরে কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাহইলে দেহ-প্রাপ্তির পূর্ব্বেও কিছু একটা ছিল। নচেৎ নূতন জীব সৃষ্ট হইলে, কেহ সুখী—কেহ দুঃখী হইবে কেন? সকলেই সমানাবস্থা-সম্পন্ন হওয়া উচিত। দেখা যায়, কেহ বাল্যকাল হইতেই প্রতিভাসম্পন্ন; অন্য শত চেষ্টা দ্বারাও তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। কেহ প্রবল বিষয়বাসনা নিয়া, কেহ প্রবল বৈরাগ্য নিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছেন। আমাদের যদি পূর্ব্বের কোন কর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে সংসারে এত বিভিন্ন জীব দৃষ্ট হইত না। সৃষ্টিবৈচিত্রই পূর্ব্বজন্মের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের ৩৩ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন :—

ধনী দরিদ্র উত্তম অধম ভেদে সৃষ্টি ও সংহারাদি দ্বারা ব্রহ্মের বৈষম্য (পক্ষপাতিত্ব) ও নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) প্রকাশিত হয় না; কারণ লোকের সুখ-দুঃখাদি বিভিন্ন ফলভোগ তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম-সাপেক্ষ; যেমন ধান্য-যবাদির পার্থক্যের কারণ মেঘ নহে, তদ্দ্ বীজগত বৈষম্যই কারণ, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।

পাতঞ্জলদর্শন ২। ১৩

কর্ম্মের পরিণাম তিন প্রকার—জাতি, আয়ু ও ভোগ। জীব কোন্ দেশে, কোন্ কুলে, কাহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার আয়ুঃ কতদিন হইবে, কি পরিমাণ সুখ ও দুঃখ তাহার জীবনের সহিত জড়িত থাকিবে—এ সমস্তই তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। এই "জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" প্রধানতঃ জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত হয়। ইহজন্মে যাহাদের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—যেমন পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি; জীবন-যাত্রার উপকরণ যে প্রকারের ও যে পরিমাণের হয়, দেহের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য যতদূর হয়, সমাজের যে স্তরে তাহার আসন নির্দ্দিষ্ট হয়, যে পরিমাণ সুখ ও দুঃখের সহিত তাহার সংস্রব হয়, এ সমস্তই তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল। এইরূপ পরজন্মও কর্ম্মদ্বারা নিয়মিত হয়।

পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম থাকিলে আমাদের তাহার স্মৃতি থাকে না কেন? এরূপ একটা প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হয়। অবশ্য এ জন্মের সকল সময়ের কথাও আমাদের স্মরণ নাই। আমাদের অতিশৈশবকালের কথা আমরা সকলেই বিস্মৃত হইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া "শৈশবকাল ছিল না" এরূপ সিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হইবেন না। শাস্ত্র বলেন—"ক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা চিত্ত মার্জ্জিত ও নির্ম্মল হইলে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে।"

বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্॥

মনু ৪। ১৪৮

সর্ব্বদা বেদাভ্যাস, অন্তর্বাহ্য শৌচ, তপস্যা ও অহিংসা এই সকল কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য "জাতিস্মর" হয়। সাধু মহাত্মগণ জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে নিজের ও অপরের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারেন। ত্রৈলিঙ্গস্বামীর জীবন-চরিত প্রণেতা শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের মনে এক সময় প্রশ্নের উদয় হয়—

"পূর্ব্বজন্ম আছে কিনা"

স্বামী তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"দেখ, তুমি যে বিষয় মনে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তাহা সত্য। ত্রিকালদর্শী আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মগণ তপোবলে, জ্ঞানবলে ও যোগবলে যে সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। জীবের সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্মজন্মান্তরপরিগ্রহ করিতে হয় ইহাও সম্পূর্ণ সত্য। যদি কেবল মাত্র একজীবন অর্থাৎ ইহজীবনই শেষ-জীবন হইত, তাহা হইলে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেন ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ বেহারা, কেহ মেথর; কেহ রোগী, কেহ নিরোগ এবং কেহ মহৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন,—জীবনের এত প্রভেদ কেন? কোনপ্রকার অন্যায় কার্য্য না করিলে কোন প্রকার দণ্ড কখনই ভোগ করিতে হয় না। ঈশ্বরের কি তবে কোন প্রকারের ভালমন্দ-বিচার নাই? যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন? কখনই না। কর্ম্মফল অনুসারে জীবনে এত প্রভেদ হইয়া থাকে। জীব নানাপ্রকার কর্ম্মফলের অধীন হইয়া নানাপ্রকার সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকে। ভাল কার্য্য করিলে ভাল হয়, মন্দ কার্য্য করিলে মন্দ হয়। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে এজন্মে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি ব্রাহ্মণোচিত সৎকার্য্য করিয়া যাও ও সৎপথে থাক, তবে আত্মোন্নতি করিতে পারিবে। পরজন্মে কি প্রকার জন্ম হইবে, এজন্মে তুমি নিজেই স্থির করিতে পারিবে।"

স্বামী তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্তও বলিয়া দিয়াছিলেন।

"অমুক গ্রামে অমুক নামে যে লোকটী বাস করেন, তিনি তোমাকে অতিশয় ভালবাসেন, তুমিও তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাস এবং স্নেহ কর, ইহার কারণ কি জান? তিনি তোমার পূর্ব্বজন্মে পিতা ছিলেন। তুমি পুত্র, তিনি পিতা—বলিয়া পূর্ব্বের যেমন স্নেহ তেমনই আছে, কেবল-মাত্র দেহ-পরিবর্ত্তনহেতু কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছ না।"

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন গয়ায় ছিলেন, তখন একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে ফল্গুর অপরপারে রামগয়ায় উপস্থিত হইলে হঠাৎ তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে।

"পূর্ব্বজন্মের সমস্ত স্মৃতিই আমার সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে জেগে উঠ্‌ল"।

"বহু তীর্থদর্শন ও বহুস্থান পর্য্যটন কর্‌তে কর্‌তে কেহ পূর্ব্বজন্মের সাধন-ভজনের বা বিশেষ সম্বন্ধের একটা স্থানে উপস্থিত তা'র পূর্ব্বভাব বা স্মৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে উদয় হ'তে পারে।"

আমাদিগের প্রথমজন্মের সুখ দুঃখ কোথা হইতে আসিল—এই তর্কের কোন স্থল নাই; কারণ সৃষ্টিপ্রবাহের আদি নাই। জীব অনাদিকাল হইতে জন্ম-মৃত্যু ভোগ করিতেছে। বিধাতা চিরকালই বিধানকর্ত্তা। তিনি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া সংহার এবং সংহার করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ক্রিয়া নিয়তই চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জীব অনন্তকাল এই চক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রলয়ে জীব নিজ নিজ কর্ম্মের বীজ নিয়া তাহার মধ্যে সুপ্তাবস্থায় থাকে, প্রলয়াবসানে পুনরায় কর্ম্মফলসহ জাগিয়া উঠে—ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

শ্রীকালীচরণ সেন বি এল্।

সামবেদ-সংহিতা।

(পূর্ব্বতোমুবৃত্তা)

অথ দ্বাদশে খণ্ডে

সেয়ং প্রথমা।

প্রয়োগো ভার্গব ঋষিঃ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্র মংহিষ্ঠায় গায়ত ঋতাব্নে বৃহতে শুক্রশোচিষে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উপস্তুতাসো অগ্নয়ে। ১।১০৭॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উপস্তুতাসঃ॥ হে উপস্তোতারঃ! যূয়ং মংহিষ্ঠায় দাতৃতমায় ঋতাব্নে যজ্ঞবতে সত্যবতে বা বৃহতে মহতে শুক্রশোচিষে দীপ্ততেজসে অগ্নয়ে প্রগায়ত স্তোত্রং পঠত। ১। ১০৭

হে উপস্তোতাগণ! তোমরা অতিশয় দাতা, সত্যশীল, মহৎ এবং শুভ্র-দীপ্তিশালী অগ্নিদেবকে উদ্দেশ করিয়া স্তোত্র পাঠ কর। ১। ১০৭।

অথ দ্বিতীয়া।

দ্বয়োঃ সৌভরির্ঋষিঃ।

১র ২র৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

প্র সো অগ্নে। তবোতিভিঃ সুবীরাভিস্তরতি বাজকর্ম্মভিঃ।

১ ৩ ২ ৩ ১র ২র

যস্য ত্বং সখ্য মাবিথ॥ ২। ১০৮

হে অগ্নে! তব ঊতিভিঃ রক্ষাভিঃ সঃ যজমানঃ প্রতরতি প্র . . । ঊতয়ো বিশেষ্যন্তে সুবীরাভিঃ শোভনবীরাঃ পুত্রাদয়ো যাসু তাভিস্তথোক্তাভিঃ। বাজকর্ম্মভিঃ বাজানামন্নানাং বলানাং বা কর্ম্ম রক্ষণং যাসু তাদৃশীভিঃ হে অগ্নে, ত্বং যস্য যজমানস্য সখ্যং সখিত্বং মিত্রত্বং আবিথ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ স প্রতরতীতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। "তরতি বাজকর্ম্মভিঃ," "তিরতে বাজকর্ম্মভিঃ" ইতি চ পাঠৌ। "আবিথ", "আবরে" ইতি চ। ২। ১০৮

হে অগ্নে! তোমার যে সকল কার্য্যে উপযুক্ত পুত্র-পৌত্রগণ নিযুক্ত আছেন, যে সকল কার্য্যে অন্নের বা বলের রক্ষা হয়, তোমার সেই সমুদায় কার্য্য দ্বারা তুমি যে যজমানের সহিত মিত্রত্ব লাভ করিতেছ, তিনি এক্ষণ সমৃদ্ধিমান্ হইতেছেন। ২। ১০৮

অথ তৃতীয়া।

১ ২ ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তং গূর্দ্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেব মরতিং দধন্বিরে।

৩ ২ ৩ ১ ২

দেবত্রা হব্য মূহিষে। ৩। ১০৯

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ। তং প্রসিদ্ধমগ্নিং গূর্দ্ধয়া স্তুহি। গূর্দ্ধয়তিঃ স্তুতিকর্ম্মা। কীদৃশং? স্বর্ণরং সর্ব্বস্য নেতারং সর্ব্বৈঃ যজমানৈঃ কর্ম্মাদৌ নেতব্যং বা অথবা স্বর্গং প্রতি হবিষাং নেতারং। দেবাসঃ দীব্যন্তি স্তুবন্তীতি দেবা ঋত্বিজঃ। দেবং দানাদিগুণযুক্তং। অরতিং স্বামিনং, যদ্বা অভিপ্রাপ্তব্যং। দধন্বিরে ধন্বন্তি গচ্ছন্তি স্তুত্যাদিভিঃ প্রাপ্নুবন্তি। ধুবির্গত্যর্থঃ। প্রাপ্য চ তেনাগ্নিনা দেবত্রা দেবান্ দেবমনুষ্যেত্যাদিনা (পাণি ৫। ৪। ৫৬) দ্বিতীয়ার্থে ত্রা প্রত্যয়ঃ। হব্যং চরুপুরোডাশাদিলক্ষণং হবিঃ। আ উহিষে অভিপ্রাপয়। বহের্লিটি যজাদিত্বাৎ (পাণি ৬। ১। ১৫) সম্প্রসারণম্। ৩। ১০৯

হে স্তোতঃ! যিনি স্বর্গে হবিঃ-সমুদায়ের নেতা, যিনি দানাদিগুণযুক্ত, যিনি আমাদিগের স্বামী, যাঁহাকে ঋত্বিক্‌রূপী দেবগণ স্তুতি দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তুমি সেই প্রসিদ্ধ অগ্নিদেবকে স্তুতিবাক্য দ্বারা স্তব করিয়া প্রাপ্ত হও; এবং দেবোদ্দেশে প্রদত্ত চরুপুরোডাশাদি হবির্দ্রব্য-সমুদায়ের অগ্নি-প্রাপ্তি সম্পাদন কর। ৩। ১০৯

অথ চতুর্থী।

প্রয়োগোভার্গব ঋষিঃ।

সৌভরিঃ কাণ্বো বা।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২

মা নো হৃণীথা অতিথিং বসু রগ্নিঃ পুরুপ্রশস্ত এষঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২

যঃ সুহোতা স্বধ্বরঃ॥ ৪। ১১০

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিক্‌সজ্ঘ! নঃ অস্মৎসম্বন্ধি যজ্ঞে অতিথিং অতিথিবৎ প্রিয়ং অগ্নিং মা হৃণীথাঃ মা হরঃ। কমগ্নিং? ইত্যত আহ যঃ অগ্নিঃ সুহোতা সুষ্ঠু দেবানামাহ্বাতা। স্বধ্বরঃ শোভনযজ্ঞো ভবতি এষঃ অগ্নিঃ পুরু-[illegible]ঃ স্তুতঃ। বসুঃ বাসকশ্চ ভবতি তমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। "মা [illegible] ছন্দোগাঃ। "মা হৃণীতামতিথিঃ" ইতি বহ্বৃচাঃ। ৪। ১১০

[illegible] যিনি দেবগণের সুন্দর আহ্বাতা, যিনি স্বয়ং সুন্দর যজ্ঞ-[illegible] আমরা সেই অতিথির ন্যায় প্রিয় অগ্নিদেবকে আমাদের যজ্ঞে হরণ করিও না, কারণ [illegible] বহুস্থানে বিস্তৃত থাকিয়াও এক্ষণ আমাদিগের যজ্ঞে বাস করিয়া রহিয়াছেন। ৪। ১১০

অথ পঞ্চমী।

ত্রিসৃণাং সৌভরির্ঋষিঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগ। ভদ্রো অধ্বরঃ।

৩ ২ ৩ ১র ২র

ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ॥ ৫। ১১১

সায়ণ-ভাষ্যং।

আহুতঃ হবির্ভিস্তর্পিতোঽগ্নিঃ নঃ অস্মাকং ভদ্রঃ কল্যাণো ভবতু। হে সুভগ! শোভনধনাগ্নে! ভদ্রা কল্যাণী রাতিঃ দানঞ্চ অস্মাকং ভবতু। ভদ্রঃ

কল্যাণঃ অধ্বরঃ যাগশ্চ ভবতু। উত অপিচ, কল্যাণ্যঃ প্রশস্তয়ঃ প্রশংসাঃ স্তুতয়শ্চ ভবন্তু ॥ ৫।১১১

হবিঃ দ্বারা তর্পিত অগ্নিদেব আমাদের কল্যাণপ্রদ হউন্। হে সুভগ তুমি আমাদিগের কল্যাণপ্রদ দ্রব্য দান কর। আমাদের যজ্ঞ কল্যাণজনক হউক্ এবং আমাদিগের কৃত স্তুতিগুলিও কল্যাণপ্রদ হউক্ ৫।১১

অথ ষষ্ঠী।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ত্বা বরৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্ত্যম্।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ৬।১১২

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! যজিষ্ঠং যষ্ট্তমং ত্বা ত্বাং বরৃমহে বৃণীমহে সম্ভজামহে, কীদৃশং ত্বাং? দেবত্রা দেবেষু মধ্যে দেবং অতিশয়েন দানাদিগুণং, হোতারং দেবানামাহ্বাতারং, অমর্ত্ত্যং অবিনাশিনং, অস্য যজ্ঞস্য যাগস্য সুক্রতুং সুষ্ঠু কর্ত্তারম্ ॥ ৬।১১২

হে অগ্নে! তুমি যজ্ঞকার্য্যে অত্যন্ত দক্ষ; তুমি দেবগণের মধ্যে অতিশয় দানাদিগুণযুক্ত; তুমি দেবগণের আহ্বান-কর্ত্তা; তুমি অবিনাশী, তুমি এই যজ্ঞের শোভনকার্য্যকর্ত্তা; তোমাকে আমরা সম্যক্ প্রকারে ভজনা করিতেছি ॥ ৬।১১২

অথ সপ্তমী।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তদগ্নে! দ্যুম্নমাভর যৎ সাসাহা সদনে কঞ্চিদত্রিণম্।
৩ ১র ২র ক ২র
মন্যুং জনস্য দূঢ্যম্ ॥ ৭।১১৩

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! তৎ দ্যুম্নং অন্নং যশো বা আভর অস্মভ্যমাহর। যৎ যদা আসদনে যজ্ঞগৃহে বর্ত্তমানং কঞ্চিৎ কমপি অত্রিণং অত্তারং রাক্ষসাদিকং সাসাহা অত্যর্থমভিভব। তথা দূঢ্যং দুর্দ্ধিয়ং পাপবুদ্ধিং শত্রুং জনস্য মন্যুং ক্রোধঞ্চ অভিভব তদেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। "দূঢ্যা", "দূঢ্যম্" ইতি চ পাঠৌ ॥ ৭।১১৩

অগ্নে! তুমি আমাদিগের জন্য সেই দ্যুম্ন অর্থাৎ অন্ন বা যশ আহরণ করিয়া দাও; যখন তুমি যজ্ঞগৃহে বর্ত্তমান কোন রাক্ষসের অত্যন্ত অভিভব

করিবে, তখন সেইরূপে মনুষ্যগণের দুষ্কিয় পাপবুদ্ধিরূপী শত্রুর এবং পাপ ক্রোধেরও অভিভব করিবে॥ ৭। ১১৩

অথ অষ্টমী।

বিশ্বমনা ঋষিঃ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২
যদ্ বা উ বিশ্পতিঃ শিতঃ সুপ্রীতো মনুষো বিশে।
১উ ৩ ২উ ৩ ১ ২
বিশ্বেদগ্নিঃ প্রতি রক্ষাংসি সেধতি॥ ৮। ১১৪

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্পতিঃ বিশাং পতিঃ পালয়িতা, শিতঃ হবির্ভিস্তীক্ষ্ণীকৃতঃ, সোঽগ্নিঃ সুপ্রীতঃ সুষ্ঠুপ্রীতঃ সন্ মনুষঃ মনুষ্যস্য বিশে বিশ নিবেশনে গৃহে যদ্ বৈ যদা খলু বর্ত্ততে তদানীম্ অগ্নিঃ বিশ্বাইৎ বিশ্বান্যেব তস্য বাধকানি রক্ষাংসি প্রতি সিসেধতি হিনস্তি। ষিধুগত্যাং ভৌবাদিকঃ। উ প্রসিদ্ধৌ। "বিশে", "বিশি" ইতি চ পাঠৌ॥ ৮। ১১৪

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ পরমেশ্বর বৈদিক-মার্গ-প্রবর্ত্তক শ্রীবীরবুক্ক ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে আগ্নেয়পর্ব্বণি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ প্রথমোঽধ্যায়শ্চাগ্নেয়ং পর্ব্ব চ।

লোকসকলের প্রতিপালক, হবির্দ্বারা প্রবর্দ্ধিত সেই অগ্নিদেব যখন উত্তমরূপে প্রীত হইয়া মনুষ্যের গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তখন ইনি যজ্ঞের বিঘ্নকারী রাক্ষস সকলকে নষ্ট করিতেছেন। ৮। ১১৪

আগ্নেয়কাণ্ড সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

পূর্ণতা।

(সনেট)

হৃদয় সুখের মৃদু-জোৎস্না-ধবলিত,
সরসী সরিতে ভরা দুকুল ভাষায়;

ক্ষরিত সুধার রস বিপুলধারায়
সে কি গো আপন-হারা প্রেম-পুলকিত—
বিথারি' বিরাট শূন্য করে তিরোহিত
সারাটী ভুবন বায়ু আপন প্রভায়।
মানবের মাঝে ওগো শুধু হায়-হায়!!
রহে যেন সুপ্তি-মগ্ন আধজাগরিত,
যখন সে প্রাণে আসি হয় সমুদিত
একখানি সুধামাখা আধ-ফোটা গান;
অমনি প্রসুপ্তভাব হ'য়ে বিকসিত
যেন প্রতিষ্ঠিত করে প্রাণহানে প্রাণ!
যাহার ঝঙ্কারে শুধু জেগে ওঠে প্রাণ—
আমার এ নহে, ওগো? এযে তারি গান!

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।



গীতায় বর্ণভেদ।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥"

এই কথাটী মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়ের ভৃগুর উক্তি। ভৃগু এই অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে বলিয়াছেন যে, "পূর্ব্বে যে সময় জগৎ সৃষ্টি হয়, সে সময়ে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যাচার-পরায়ণ ও তপস্বী ছিলেন। পরে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া কামভোগ-প্রিয় ও ক্রোধন-স্বভাব হইলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়বর্ণ হইলেন। যাঁহারা লোভ-পরায়ণ ও কর্ম্মোপজীবী, তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা শৌচাচারপরিভ্রষ্ট তাঁহারা শূদ্র হইলেন।" ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে বর্ণবিভাগ ছিল না, পরে ব্যক্তি-বিশেষের গুণ ও তজ্জনিত কর্ম্মের দ্বারাই বর্ণবিভাগ হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়েও মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন যে, "ষট্‌কর্ম্ম-নিরত শৌচাচারপরায়ণ ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন হইয়া

যে ব্যক্তি ক্ষত্রজ কর্ম্ম করে, তাহাকে ক্ষত্রিয় বলে। কৃষিবাণিজ্য-নিরত বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন ব্যক্তিকে বৈশ্যবর্ণ বলা হয়। ত্যক্তবেদ আচারহীন ব্যক্তিকে শূদ্রবর্ণ বলে।" ইহা বলিয়াই মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন যে, "শূদ্রে যদি লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে, আর ব্রাহ্মণে না থাকে, তবে সে শূদ্র শূদ্র নয় এবং ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়"—অর্থাৎ শূদ্রই যে শূদ্র হয় তাহা নহে এবং ব্রাহ্মণই যে ব্রাহ্মণ হয় তাহাও নহে। ইহার তাৎপর্য্য যে শূদ্রত্ব শূদ্রবর্ণ-নিষ্ঠ,—শূদ্রজাতি-নিষ্ঠ নহে; ব্রাহ্মণত্ব ব্রাহ্মণ-বর্ণনিষ্ঠ,—ব্রাহ্মণ-জাতি-নিষ্ঠ নহে। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণজাতীয় লোক লোভ-মোহবশতঃ বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী স্থলে শাস্ত্র ব্রাহ্মণজাতিকে বর্ণরক্ষার জন্য উপদেশ দিয়াছেন—

"সর্ব্বোপায়ৈস্তু লোভস্য ক্রোধস্য চ বিনিগ্রহঃ।
এতৎ পবিত্রং জ্ঞানানাং তথা চৈবাত্মসংযমঃ॥
বার্য্যৌসর্ব্বাত্মনা তৌ হি শ্রেয়োঘাতার্থমুচ্ছ্রিতৌ।
নিত্যং ক্রোধাচ্ছ্রিয়ং রক্ষেৎ তপোরক্ষেচ্চ মৎসরাৎ॥
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাত্মানন্তু প্রমাদতঃ।
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা নিরাশীর্ব্বন্ধনাদ্বিজ॥
ত্যাগে যস্য হুতং সর্ব্বং সত্যাগী স চ বুদ্ধিমান্।
অহিংস্রঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ॥
পরিগ্রহান্ পরিত্যজ্য ভবেদ্বুদ্ধ্যা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অশোকং স্থানমাতিষ্ঠেদিহ চামুত্র চাভয়ম্॥
তপোনিত্যেন দান্তেন মুনিনা সংযতাত্মনা।
অজিতং জেতুকামেন ভাব্যং সঙ্গেষ্বসঙ্গিনা॥
ইন্দ্রিয়ৈঃ গৃহ্যতে যদ্ যত্তত্তদ্ব্যক্তমিতিস্থিতিঃ।
অব্যক্তমিতি বিজ্ঞেয়ং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্॥
অবিশ্রম্ভেন গন্তব্যং বিশ্রম্ভে ধারয়েন্মনঃ।
মনঃপ্রাণে নিগৃহ্নীয়াৎ প্রাণং ব্রহ্মণি ধারয়েৎ॥
নির্ব্বেদাদেব নির্ব্বাণং ন চ কিঞ্চিদ্‌বিচিন্তয়েৎ।
সুখং বৈ ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম নির্ব্বেদেনাধিগচ্ছতি॥
শৌচেন সততং যুক্তঃ সদাচার-সমন্বিতঃ।
সানুক্রোশশ্চ ভূতেষু তদ্দ্বিজাতিষু লক্ষণম্॥"

ব্রাহ্মণত্ব যদি ব্রাহ্মণজাতি-নিষ্ঠ হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণজাতি হইতে পৃথক্ বর্ণাদির উৎপত্তি সম্ভব হইত না, সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব অর্থে ব্রাহ্মণবর্ণ বুঝাইবে। কিন্তু এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণজাতি [illegible] ৎপন্না। ইহার উত্তরে বলা যায়—তাহা নহে, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ' ব্রাহ্মণত্বই একমাত্র জাতি। কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব যদি একমাত্র জাতি হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণত্ব নিত্য পদার্থ, কারণ জাতি নিত্য; সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব হইতে শূদ্রত্ব উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, "সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ" এই শ্লোকে 'ব্রাহ্ম' পদে ব্রাহ্মণজাতির উল্লেখ করা হয় নাই, এখানে মাত্র বলা হইয়াছে যে, সকলেই এক ছিল। প্রমাণ "ন বিশেষোঽস্তিবর্ণানাং" অর্থাৎ মূলতঃ বর্ণ-সকল একই বস্তু। ইহাও আপত্তি হইতে পারে যে, জাতি নিত্য নহে, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"বহুস্যাং প্রজায়েয়মিতি।" এক হইতেই বহু হইয়াছে, একজাতি হইতে বহুজাতি হইয়াছে; সুতরাং বলিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণত্ব ব্রাহ্মণবর্ণের জাতি অর্থাৎ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তির জাতি। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"যচ্চ কেষাঞ্চিৎ কুতশ্চিৎ ভেদং করোতি তৎসামান্য-বিশেষোজাতিঃ।" গৌতম বলিয়াছেন—"সমানপ্রসবাত্মিকাজাতিঃ।" ভাষাপরিচ্ছেদেও এই উপক্রমেই বলা হইয়াছে যে, "সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেবচ" ইত্যাদি।

এই সকল প্রমাণে এমত সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বর্ণ ও জাতি এক পদার্থ—অর্থাৎ বর্ণই জাতি। সুতরাং বর্ণভেদে জাতিভেদ অবশ্যম্ভাবী। 'আকৃতিগ্রহণাজাতিঃ' ইত্যাদি লক্ষণের "[illegible]" এই অংশের দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণবর্ণে জাত ব্যক্তি [illegible] হইবেন।

উপরে দেখা গিয়াছে যে—

"শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণোমচ॥"

এই শ্লোক-প্রতিপাদ্য অর্থ বনপর্ব্বের কয়েকটি শ্লোকেও দেখা যায়। সর্প উবাচ—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচৈব হি।
শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এবচ॥
আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণাচৈব যুধিষ্ঠির।
বেদ্যং যচ্চাত্র নির্দুঃখমসুখঞ্চ নরাধিপ॥
তাভ্যাং হীনং পদং চান্যন্ন তদস্তীতি লক্ষয়ে।"

সর্পের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন যে—

"শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো নচ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

ব্রাহ্মণে যে সকল লক্ষণ আছে, কোন কোন শূদ্রেও সেই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে, ব্রাহ্মণলক্ষণ-সম্পন্ন শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে। যাহাতে বৈদিক আচারাদি পরিদৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ; যাহাতে তাহা নাই, সেই শূদ্র। যদি বৃত্ত অনুসারে ব্রাহ্মণ হয়, তবে সে কৃতী না হইলে তাহার জাতি বৃথা। বস্তুতঃ দেখা যায় যে, বর্ণ-ভেদ-প্রথা প্রচলিত হইলে বর্ণ-সঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে ও বর্ণসঙ্কর-হেতু জাতিনির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, সুতরাং এই বিশৃঙ্খলা-নিবারণার্থ নিশ্চয় করা হইল যে, যে পর্য্যন্ত বেদাধিকার না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মানব "শূদ্র" থাকে, বেদাধিকার হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ বলা যায়—'সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে'। রাজা যুধিষ্ঠিরের সময়েও ব্রাহ্মণাদিবর্ণের বংশগত জাতি সম্বন্ধে আন্দোলন হইয়াছিল, এতৎ সম্বন্ধে মহাভারতে বহুলপ্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা যুধিষ্ঠির যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা বনপর্ব্বের উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে, বাস্তবপক্ষে যদিও ধর্ম্মবিশেষের দ্বারাই ব্যক্তিবিশেষের বর্ণ স্থির হয় বটে, কিন্তু কাম-মোহাদির জন্য সর্ব্বদাই বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়, সুতরাং সমাজের বিশৃঙ্খলভাব অনিবার্য্য। অতএব প্রাচীনসমাজে বর্ণ সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম স্বীকৃত হয় যে, যে সকল বংশে বৈদিক-নিয়মানুসারে সংস্কারপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাঁহারা বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত হইলেই তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণাদি-পদবাচ্য করা হইত, আর যাঁহারা সংস্কার ক্রিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন বা না করিতেন, তাঁহারা শূদ্র রহিতেন। এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণাদি-শব্দ জাতি-বাচক হইল। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ একই জাতির অন্তর্গত; কারণ, বাক্, মিথুন, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি গুণ ইহাদের সকলের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান; সুতরাং শূদ্রের যে সাধারণ গুণ, তাহা শূদ্রেতর বর্ণত্রয়েও আছে। তবে উভয়ের পার্থক্য কি প্রকারে হয়? বেদে জাত হইলেই উভয়ের পার্থক্য হয়। সুতরাং এরূপ বলিলে দোষ হয় না যে, "সকলেই শূদ্র, কেবল বেদোক্ত-সংস্কারাদি-ক্রিয়ানুষ্ঠানশীল

মাত্র দ্বিজ।" আপত্তি হইতে পারে যে, "এস্থলে বংশের উল্লেখ নাই, কেবল শূদ্রের উল্লেখ আছে", তাহা নহে; কারণ, ব্যক্তিগত-বর্ণ বর্ণসঙ্করের দ্বারা পূর্ব্বেই বাধিত হইয়াছে। আরও দেখা যায় যে, ভগবান্ মনুও ৮।১০ শ্লোকে 'ব্রাহ্মণব্রুব' এই পদের দ্বারা ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। অতএব ভগবান্ মনুর সময়ে ব্রাহ্মণ-জাতি বলিয়া এক শ্রেণী ছিল, তন্মধ্যে "নামে ব্রাহ্মণ" এবং "প্রকৃত ব্রাহ্মণের"ও ভেদ ছিল, ইহাই বুঝা যায়। মাত্র বৈদিকসংস্কারে সংস্কৃতবংশজ ব্রাহ্মণগুণ-বর্জ্জিত ব্যক্তি "নামে ব্রাহ্মণ" এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণগুণে-ভূষিত ব্যক্তি "প্রকৃত ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত হইতেন। "জাতিজানপদান্ ধর্ম্মান্" (মনু ৮৪১) ইত্যাদি শ্লোকেও ব্রাহ্মণাদিজাতির ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি-শব্দ জাতিবাচক বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। 'দ্বিজাতি' শব্দেরও ব্যবহার প্রায়শঃই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং স্মৃতি ও পুরাণের অভেদই দেখা যায়। আপত্তি হইতে পারে যে, "এই যুক্তিপর সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে, কারণ, বেদই প্রমাণ এবং বেদের মন্ত্রাদি দ্বারা এই সিদ্ধান্ত বাধিত হয়," কিন্তু তাহা নহে; কারণ, বেদের মধ্যে এমন কোনও মন্ত্র পাওয়া যায় না যে, যাহার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত বাধিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে বেদ-মন্ত্র দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিতই হইয়া থাকে। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং" ইত্যাদি শ্লোকের সমর্থন করা হইল। তৎপরে "যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা" ইত্যাদি দ্বারা বিভাগ প্রমাণিত হইল। কি প্রকারে বিভাগ প্রমাণিত হইল? পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গরূপে অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অঙ্গরূপে—"ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীৎ" ইত্যাদিরূপে।"

ত্রিবৃৎ, অগ্নি, গায়ত্রী, রথন্তর এ সকলই জাতিবাচক ও নিত্য; ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির ন্যায় মুখ্য এবং পুরুষের মুখ। যথা—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বলিয়াছেন—"প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত" ইত্যাদি (৭, ১, ১, ৪—৫), তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণেও এই প্রমাণই পাওয়া যায়, (৬, ১, ৬—১১) কিন্তু শতপথ-ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে, ঐষাবীর ব্রাহ্মণগণ অতিনিকৃষ্ট। ইহাও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উত্তর-প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ কুরু-পাঞ্চাল ব্রাহ্মণগণের নিকট ভীত হইতেন এবং তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। (শতপথ-ব্রাহ্মণ ১১।৪।১।১—২)।

যদি কোনও ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নিজবর্ণের বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিম্নবর্ণের বিহিত কর্ম্ম করিতে থাকেন, তাহা হইলে সেই কর্ম্মফলে পরজন্মে

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করিয়া, উক্তস্বভাবসম্পন্ন জাতি ও কুলে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং শাস্ত্র বিধান করিয়াছেন, যে, স্ববর্ণোক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া জাতি-রক্ষা করিবে। এই কারণেও জাতিভেদ-প্রথা রক্ষা করা আবশ্যক। এখন দেখা যাউক্, গীতার মত কি প্রকার। এ বিষয়ে গীতা বলিয়াছেন যে,

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥"

অর্থাৎ কোনও জীবই প্রকৃতিজাত গুণ হইতে বিমুক্ত থাকিতে পারেনা। ক্রিয়া, কারক ও ফল এই তিন লইয়াই সংসার। এই সংসার ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক এবং অবিদ্যা-পরিকল্পিত, সুতরাং জগৎ-কারণও ত্রিগুণাত্মক, কাজেই নির্ণয় কঠিন,—এই আশঙ্কার নিরাশের জন্য ভগবান্ বলিতেছেন—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্বভাব-প্রভব গুণের দ্বারাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ইহারা বেদাধ্যয়নে অধিকারী, শূদ্রেরা নহে। ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকেই "স্বভাব" বলা যায়। ঐ মায়া হইতে যে গুণ সমূহ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই স্বভাবপ্রভব গুণ বলে এবং এই স্বভাবপ্রভব গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কর্ম্ম সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অথবা ইহাও বলা যায় যে, ব্রাহ্মণ-স্বভাবের সত্ত্বগুণই কারণ, তথা ক্ষত্রিয়-স্বভাবের কারণ সত্ত্বোপসর্জ্জন রজোগুণ, বৈশ্য-স্বভাবের কারণ তমউপসর্জ্জন রজোগুণ, এবং শূদ্র-স্বভাবের রজউপসর্জ্জন তমোগুণই কারণ। ইহা জাতিগত প্রশান্তি, ঐশ্বর্য্য, প্রবৃত্তি, মূঢ়তা প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রাণিগণের পূর্ব্বজন্মকৃত সংস্কার বর্ত্তমানজন্মে ফল দিতে উন্মুক্ত হয়; কারণ, গুণ-প্রাদুর্ভাব কোন কারণবশতঃই হয় এবং এই স্বভাবই সেই কারণ। পুনশ্চ বলা যাইতে পারে, স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে প্রাদুর্ভূত যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, এই তিনের দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শমাদিগুণ প্রবিভক্ত হইয়াছে। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের যে শমাদিগুণের ব্যবস্থা, তাহা ব্রাহ্মণাদির স্বভাবসিদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে।

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥
কৃষি-গৌরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥"

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, জাতিবিহিত কর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে স্বভাবতঃ স্বর্গ-প্রাপ্তিরূপ ফল হয়। স্মৃতিশাস্ত্র বলেন যে, বর্ণ ও আশ্রমোচিত স্বকর্ম্মনিষ্ঠ হইলে মৃত্যুর পর কর্ম্মফল অনুভব করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্মের ফল-স্বরূপে দেশ-বিশেষে বিশিষ্টকুলে জন্ম ও ধর্ম্ম, আয়ু, বিদ্যা, চরিত্র, সুখ এবং বুদ্ধিলাভ হয়, কিন্তু অন্য কারণ হইতে এই বক্ষ্যমাণ ফল হইয়া থাকে। স্ব স্ব কর্ম্মে তৎপর হইলে মানব সংসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে শরীর এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অশুদ্ধি-ক্ষয় হয় এবং অশুদ্ধি-ক্ষয় হইলে জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা হয়, ইহাই সংসিদ্ধি। সংসিদ্ধি কিরূপে হয়?

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥"

যাঁহা হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হয়, এই জগৎ যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত, স্বকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া মানব সিদ্ধি অর্থাৎ সংসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

শাস্ত্র বলিতেছেন যে, স্বভাবজ কর্ম্ম করিলে পাপ-স্পর্শ ঘটেনা, যেমন বিষজাত ক্রিমি বিষ হইতে নষ্ট হয় না। যাহা জন্মের সহিত উৎপন্ন হয় তাহাই স্বভাবজ। উক্ত স্বভাবজ কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই নষ্ট হইতে হইবে। যে বিষে কৃমির জন্ম, সে বিষ হইতে কৃমিকে স্থানান্তরিত করিলেই কৃমি নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ব্রাহ্মণাদিবংশে জাত ব্রাহ্মণস্বভাব ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে তাঁহার নাশ হইবে। অপর সকল কর্ম্মই ত্রিগুণাত্মকতা দোষে দূষিত, আর সদোষ কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ অসম্ভব, সুতরাং সকল কর্ম্মই পরিত্যাগ করা উচিত, কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং সহজকর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া, যে ব্যক্তি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার সহজ কর্ম্ম করাই তাহার কর্ত্তব্য। এই সকল শাস্ত্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক শাস্ত্রানুশাসনের অন্যথাচরণ করিলে অনর্থই ঘটিবে। এই সকল কারণেই জাতিভেদ-প্রথা রহিত হয় নাই এবং হইতেও পারেনা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমাচার

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

নিজের মুখ নিজ-চক্ষে দেখা যায় না। যদি দেখার প্রয়োজন হয়, তবে একখানা প্রতিবিম্ব-গ্রহণক্ষম নির্ম্মল দর্পণের প্রয়োজন হয়, এবং তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইলে তবে দেখা যায়। সেইরূপ নিজের স্বরূপ নিজে দেখিতে হইলেও একখানা দর্পণের প্রয়োজন, সেই দর্পণ প্রতিবিম্বগ্রহণক্ষম নির্ম্মল হওয়াও প্রয়োজন; সেই দর্পণই জীবের মন। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ মনোদর্পণই বিষয়-পঙ্কে অত্যন্ত মলিন থাকায় প্রতিবিম্বগ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই সাধন-ভজন দ্বারা মনটাকে মাজিয়া ঘসিয়া বিষয়মলশূন্য করিয়া প্রতিবিম্ব-গ্রহণক্ষম করিতে হয়, তাহা হইলে সহজেই জীবের স্বরূপ উপলব্ধ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধন-ভজন অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-ভেদে দ্বিবিধ। বহিরঙ্গ-সাধন দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয় ও অন্তরঙ্গ-সাধনে রসাস্বাদন হয়। এই উভয়বিধ সাধনেরই আবার কতকগুলি স্তর বা সোপান আছে। বহিরঙ্গ-সাধনের প্রথমস্তর বা প্রথমসোপানই বর্ণাশ্রমাচারপ্রতিপালন। বর্ণ চারিটি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। আশ্রমও চারিটি—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। আচার বলিতে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি নিয়ম। তাহা হইলে স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত কতকগুলি নিয়ম-প্রতিপালনই বর্ণাশ্রমাচার-প্রতিপালন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সাত্ত্বিকপ্রকৃতির পক্ষে যে সমুদয় আহার বিহার বা নিয়ম-পালন হিতকর, রাজসদিগের তাহা উপযুক্ত নহে, আবার রাজসদিগের যাহা অনুকুল, তামসদিগের তাহা প্রতিকুল হইতে পারে। শ্লেষ্মপ্রকৃতির যাহা সুপথ্য, পিত্ত-প্রকৃতির তাহা কুপথ্য, আবার পিত্তপ্রকৃতির যাহা অনুকুল, বাতপ্রকৃতির তাহা প্রতিকুল হইতে পারে—এজন্য বর্ণভেদে খাদ্যাখাদ্যের বিধি দেখা যায়। পরে আশ্রম,—ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম আর কিছুই নহে ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়ন, সুতরাং ইহাকে শিক্ষাজীবন বলা যাইতে পারে। গার্হস্থ-আশ্রম,—ইহাকে কর্ম্মজীবন বলা যাইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে যাহা শিক্ষা করা যায়, গার্হস্থ-আশ্রমে সে শিক্ষার কার্য্যে পরিণতি। পরে বানপ্রস্থাশ্রম,—ইহাকে কর্ম্মার্পণের জীবন বলা যায়। এই

সময়ে সংসারভার পুত্রে অর্পণ করিয়া, কর্ম্মসমূহ ভগবানে অর্পণ করিয়া, সন্ন্যাস অবলম্বন-পূর্ব্বক জ্ঞানচর্চ্চার জন্য বনে প্রস্থান করিতে হয়—এজন্য ইহাকে বানপ্রস্থ বলে। তৎপরে সন্ন্যাস-আশ্রম,—ইহাকে কর্ম্মত্যাগের জীবন বলা যাইতে পারে। এই সময় সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্ববিচারে নিরত থাকিতে হয়। শিক্ষাজীবনের ও কর্ম্মজীবনের কর্ত্তব্য এক হইতে পারে না, এইরূপ কর্ম্ম-জীবনের কর্ত্তব্য ও কর্ম্মার্পণজীবনের কর্ত্তব্য এবং কর্ম্মার্পণ-জীবনের কর্ত্তব্য ও কর্ম্মত্যাগ-জীবনের কর্ত্তব্য এক হইতে পারে না,—তাই আশ্রমচতুষ্টয়ের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদিও মানবজীবনকে চারিটি আশ্রম বা চারিটি অবস্থায় বিভক্ত করা হইয়াছে ও তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বা শিক্ষা-জীবন প্রথমসোপান এবং সন্ন্যাস-আশ্রম বা ত্যাগজীবন চরম পরিণতি বলিয়া অনেকস্থলে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সেটি জ্ঞানমার্গের সাধকের পক্ষে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত কেবল মাজাঘষার ব্যাপার চলিল—অর্থাৎ কেবল মনকে গঠন করিবার পক্ষে যে কিছু কর্ত্তব্য তাহাই চলিল—তাই রায় রামানন্দ স্বধর্ম্মাচরণ হইতে জ্ঞানমিশ্র ভক্তি পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলিলেন—সকলই "বাহ্য" বলিয়া মহাপ্রভু উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। জ্ঞানমার্গের চরমসীমা যেখানে, ভক্তি-মার্গের প্রারম্ভ সেখান হইতে। মনে করুন, আপনি বাল্যকালে বিদ্যা-ভ্যাস করিলেন—এটি আপনার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বা শিক্ষাজীবন, পরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন—এটি আপনার গার্হস্থ্যাশ্রম বা কর্ম্মজীবন, পরে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যে সমুদয় রাজস্ব আদায় করিলেন তাহা রাজকোষে অর্পণ করিলেন—এটি আপনার কর্ম্মার্পণজীবন। যদি তখন রাজস্ব রাজকোষে অর্পণ না করিয়া তাহার এক কপর্দ্দকও আত্মসাৎ করেন, তাহা হইলে রাজদণ্ডে কারারুদ্ধ হইবেন, আর তহবিল বুঝাইয়া দিতে পারিলে আপনার আবদ্ধ হইবার আশঙ্কা নাই। তদ্রূপ, আপনারা গার্হস্থ্যাশ্রমে যে সমুদয় কর্ম্ম করিবেন, তাহা যদি রাজার রাজা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আর আপনাদের বন্ধনের আশঙ্কা নাই; আর যদি কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে এই ভবকারাগারে নিশ্চয় আপনাদের রুদ্ধ থাকিতে হইবে। এইরূপে সাধুভাবে যথারীতি রাজ-কার্য্য করিতে করিতে প্রভু যখন আপনাকে "কর্ম্মের অযোগ্য" বলিয়া মনে করিবেন, তখন তিনি দয়া করিয়া আপনাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দিয়া পেন্সন দিবেন। তখন আপনি পেন্সনভোগী হইয়া যথা ইচ্ছা তথা যান

করিতে পারেন, বা রাজার প্রতি সমধিক অনুরাগ থাকিলে চিরকাল রাজবাটীতে থাকিয়া ইচ্ছানুরূপ রাজসেবা করিতে পারেন। অনাসক্তভাবে ভগবানে ফল-অর্পণ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে করিতে যখন আপনার কর্ম্মবন্ধন-ক্ষয় হইবে, তখন তিনিই দয়া করিয়া আপনাকে কর্ম্ম হইতে অবসর করিয়া দিবেন। আপনি যদি জ্ঞানী হন, তাহা হইলে "মুক্ত হইলাম" মনে করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিবেন, আর যদি ভক্ত হন, রাজার প্রতি সমধিক অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে আপনার যোগ্যতানুসারে শান্তদাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে রাজসেবা করিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধনার দুটি উদ্দেশ্য—একটি মনের মালিন্য-মার্জ্জন ও অপরটি রসাস্বাদন। এই পেন্‌সনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত মার্জ্জন-ব্যাপার গেল, পরে যখন কর্ম্মত্যাগের পর অবসর পাইলেন এবং শ্রীভগবানের কৃপায় যখন প্রেম-পেন্‌সন্ পাইলেন, তখন হইতে রসাস্বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাই বলিতেছিলাম, জ্ঞান-রাজ্যের চরমসীমা হইতে ভক্তিরাজ্যের আরম্ভ। মনে রাখিতে হইবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই যদি কেহ কর্ম্মত্যাগ করেন, তাহা হইলে পেন্‌সনের আশায় বঞ্চিত হইতে হয় এবং শেষজীবনে অন্নকষ্টও উপস্থিত হইতে পারে, সেইজন্য যাবৎ না চিত্তশুদ্ধি হয়—যাবৎ না প্রেমপেন্‌সন্ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাবৎ কর্ম্মত্যাগ করা যায় না—তাবৎ বর্ণাশ্রমাচার অবশ্যই পালন করিতে হয়; পরে প্রেম-লাভ হইলে আর উহার কোনই প্রয়োজন থাকেনা—"উত্তীর্ণেতু সরিৎপারে নাবা বা কিম্প্রয়োজনং"—নদী পার হইলে নৌকার কোনই প্রয়োজন থাকেনা, কিন্তু মধ্যনদীতে নৌকা ত্যাগ করিলে হাবুডুবু খাইয়া মরিতে হয়। তাই ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—একটি চারা রোপণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে খুব শক্ত করিয়া বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে হয়, নচেৎ ছাগলে মুড়িয়া খায়, পরে যখন চারাটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন আর ঘিরিবার প্রয়োজন ত হয় না, পরন্তু সেই গাছে কত গরু ঘোড়া এমন কি হাতী পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখা যায়, তখন তাহারা ঐ গাছের সুশীতল ছায়ায় তৃপ্ত হয় এবং ফল পত্রাদি ভোজনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। তদ্রূপ, সাধনার প্রথমাবস্থায় খুব কঠোরভাবে আচারাদি প্রতিপালন করিতে হয়, পরে সিদ্ধিলাভ করিলে আর আচারাদি অনুষ্ঠানের আবশ্যক থাকেনা। তখন কত পতিত অধম ব্যক্তি তাঁহার পাদচ্ছায়ায় তৃপ্ত হয় ও উপদেশামৃতপানে ভবক্ষুধার শান্তি করে। ছেলেবেলায় মেয়েদের মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, যে, এক রাজার দুইটি

পত্নী ছিল, জ্যেষ্ঠাপত্নী বন্ধ্যা, কনিষ্ঠার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। একদা সেই শিশুটি আপন মনে ক্রীড়া করিতেছে ও মৃদু মৃদু হাসিতেছে—তদ্দর্শনে রাজা শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিয়া বলিতেছেন—"নিদন্তের হাসি, আমি বড়ই ভালবাসি"—সপত্নীপুত্রের ঈদৃশ আদর দেখিয়া ঈর্ষাপরায়ণা জ্যেষ্ঠাপত্নী নোড়া দিয়া নিজ দন্তগুলি ভাঙ্গিয়া রাজার সমীপে আসিয়া বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন। রাজা ঈদৃশ বীভৎস-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাক্ষসীজ্ঞানে তাহাকে দূর দূর করিয়া পদাঘাতে তাড়াইয়া দিলেন। তখন জ্যেষ্ঠাপত্নী বলিলেন যে—"তুমি "নিদন্তের হাসি" ভালবাস শুনিয়া, আমি দন্তোৎপাটন করিয়া আসিয়া তোমার নিকট হাস্য করিলাম, কৈ তাহাত তুমি ভাল বাসিলে না? তবে সেটি তোমার মুখের কথামাত্র। তুমি সপত্নী ও তৎপুত্রকেই সমধিক ভাল বাস।" পাঠক মহোদয়গণ! যাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে, কৃত্রিম উপায়ে তাহা করিতে গেলে এইরূপ হাস্যোদ্দীপক ব্যাপারই হয়। যথাশাস্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যখন কর্ম্মবন্ধনক্ষয় হইয়া আপনা হইতে কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যায়, তখনই প্রকৃত ত্যাগী হওয়া যায়। শাস্ত্রাদিতে ত্যাগের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া লুব্ধচিত্তে যে ত্যাগ, অথবা কায়ক্লেশ-ভয়ে যে ত্যাগ, সে রাজসিক ত্যাগ। তাহাতে ত্যাগ-ফলত হয়ই না, পরন্তু রাজরাণীর দন্তোৎপাটনের ন্যায় হাস্যোদ্দীপন হয়। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ সকৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈবত্যাগফলং লভেৎ"—দুঃখবোধে কায়ক্লেশ ভয়ে যে ত্যাগ, সে রাজসিক ত্যাগ, তাহাতে ত্যাগ-ফল হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ননির্ব্বিদ্যেত যাবতা, মৎকথাশ্রবণাদৌবা যাবৎ শ্রদ্ধা নজায়তে"—যতকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত না হয় অথবা আমার কথা-শ্রবণাদিতে যাবৎ না শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার পর আর কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। এ "শ্রদ্ধা" সাময়িক শ্রবণেচ্ছা মাত্র নহে, সুদৃঢ়শ্রদ্ধা। রাসারম্ভ-সময়ে বংশীধ্বনিমুগ্ধা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে সমাগতা হইলে, ভগবান্ যখন তাহাদের শ্রদ্ধাপরীক্ষার্থে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, তখন গোপীগণ বলিলেন,—চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে, পাদৌপদং নচলতস্তবপাদমূলাদ্ যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিম্বা"—এতদিন আমাদের যে চিত্ত গৃহকার্য্যে নিরত ছিল, তাহা তুমি অপহরণ করিয়াছ। চিত্তই সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক, সুতরাং আমাদের চিত্ত অপহৃত হওয়ায় সমুদয়

ইন্দ্রিয়ই বিকল বা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। এখন যে তুমি আমাদিগকে গৃহকার্য্য করিতে উপদেশ দিতেছ, তাহা আর কি করিয়া করিব? আমাদের এই করযুগল ত আর চিত্তের অভাবে গৃহকার্য্যে সক্ষম নহে! বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? তোমার পাদমূল হইতে আমাদের এই পদদ্বয় একপদও চলিতে সমর্থ নহে। আমরা কি করিয়াই বা ব্রজে যাইব, আর গিয়াই বা কি করিব? "যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য, অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ"—হে অম্বুজাক্ষ, রমার আনন্দপ্রদ অরণ্য-জনপ্রিয় তোমার পাদযুগল যেদিন হইতে আমারা স্পর্শ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি, তদবধি আমরা অন্যের সমক্ষে ক্ষণকাল অবস্থান করিতেও পারি না—"কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন সম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেত্রিলোক্যাং? ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ বিলোক্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্—হে ভুবন-সুন্দর! তোমার এই লয়-মূর্চ্ছনাদি সমন্বিত কলপদায়ত বিশ্ববিমোহন বেণুবাদন শ্রবণ করিয়া এবং তোমার এই ত্রৈলোক্যসুভগরূপ, যাহা দর্শন করিয়া পশু পক্ষী দ্রুমলতা প্রভৃতিও পুলকাঞ্চিতকলেবর হইতেছে, ইহা দেখিয়া, ত্রিলোকের মধ্যে এমন কে আছে যে সম্মোহিত হইয়া আর্য্যভাব হইতে বিচ্যুত না হইয়া থাকিতে পারে?" পাঠকমহোদয়গণ! যাঁহারা এই ত্রৈলোক্যসুভগরূপ স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন, যাঁহারা সেই বিশ্ববিমোহন বেণুবাদন স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন, যাঁহারা সেই রমারমণ অভয়চরণ স্বকরে স্পর্শ করিয়াছেন, যাঁহাদের করযুগল হরিমন্দিরমার্জ্জনাদিরূপ ভগবৎসেবা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য করিতেই সমর্থ নহে, যাঁহাদের শ্রুতিযুগল ভগবল্লীলা-গাথা ভিন্ন অন্য কিছুই শুনিতে পায় না, যাঁহাদের রসনা হরিনাম ভিন্ন অন্য কিছুই উচ্চারণ করিতে পারে না, যাঁহাদের পদদ্বয়—"পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ"—ভগবৎপদমূল হইতে একপদও অন্যত্র চলিতে অক্ষম, তাঁহারাই শ্রদ্ধাশালী তাঁহারাই কর্ম্মত্যাগের প্রকৃত অধিকারী। ঈদৃশ অধিকারী ব্যক্তিই ভেকাশ্রয় করিবার যোগ্যপাত্র, কারণ ইঁহারাই গোপীগণের ন্যায় বলিতে পারেন—"যামঃ কথং গৃহমথোকরবাম কিম্বা"—কি করিয়া গৃহে ফিরিব? আর ফিরিয়াই বা কি করিব? কারণ আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ই আর গৃহকার্য্যের উপযোগী নহে, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা যদুবীর নিখিল ইন্দ্রিয়গণকে সবলে আত্মাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন, সে

আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া বিপরীত দিকে যায় কা'র সাধ্য ? কাজেই তাঁহারা ভেকাশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ানুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন করেন। ভেক আর কিছুই নহে, উহা বৈষ্ণবসন্ন্যাস মাত্র। সন্ন্যাস-আশ্রমে আচারানুষ্ঠানের আবশ্যক থাকে না, (১) ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং ভেকাশ্রিত বৈষ্ণবগণের আচার দর্শন করিয়া যদি বৈষ্ণবধর্ম্মকে আচারহীন বলিতে হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসীর আচার দেখিয়া বৈদিকধর্ম্মকে এবং অব-ধূতের আচার দেখিয়া তান্ত্রিকধর্ম্মকেও বর্ণাশ্রমাচারহীন বলিতে হয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন—"স্বীকার করিলাম, ভেকাশ্রয় সন্ন্যাস-গ্রহণ এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে আচারানুষ্ঠান অনাবশ্যক, কিন্তু সে সন্ন্যাসও ত অবৈধভাবে গ্রহণ করা হয়, কারণ এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোনও বর্ণেরই সন্ন্যাসগ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত নহে।" প্রত্যুত্তরে বলিব—শাস্ত্রে ওরূপ নিষেধ আছে, কিন্তু সে নিষেধ বৈদিক সন্ন্যাস বিষয়ে। তান্ত্রিক সন্ন্যাসে সর্ব্ববর্ণেরই অধিকার আছে ;—"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ সামান্যা এবচ, কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা"—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য নীচজাতিসমূহেরও তান্ত্রিক সন্ন্যাসে অধিকার আছে। বৈষ্ণবগণ তন্ত্রমতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাঠক মহোদয়গণ ! তন্ত্রের নাম শুনিয়াই পঞ্চ'ম'কারের আশঙ্কা করিবেন না। তন্ত্রের মধ্যে বহুবিধ আচারের বিধি আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মচারীর ন্যায় আচারকে বৈষ্ণবাচার বলে, বৈষ্ণবগণ উহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভেকাশ্রয় করিয়াও শক্তি গ্রহণ করেন, উঁহাদের সহিত মহাপ্রভুর কোনই সম্বন্ধ নাই, উঁহারা বাউল-সম্প্রদায়ভুক্ত। পাঠক মহোদয়গণ ! এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, হরিভক্তিবিলাসগ্রন্থের কোথাও বর্ণাশ্রমাচারের প্রতিকূলে কোনও কথাই নাই, পরন্তু অনুকূলেই বহুল প্রমাণ আছে। ভেকাশ্রিত বৈষ্ণবগণ সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসাশ্রমে আচারানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকেনা। তন্ত্রমতে সর্ব্ববর্ণই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে। শাস্ত্রে যে ব্রাহ্মণেতরের সন্ন্যাস নিষিদ্ধ আছে, সে বৈদিক-সন্ন্যাস। যেমন অন্যান্য সকল ধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় আচারাদির কঠোর ব্যবস্থা দৃষ্ট হইলেও চরমাবস্থায় কোনই নিয়ম থাকেনা, বৈষ্ণবধর্ম্মেও তাহাই। অতএব মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মকে যাঁহারা বর্ণাশ্রমাচারবিহীন বলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিষয়ক কোন সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন নাই। ব্যক্তিবিশেষের ব্যভিচার দর্শন করিয়া সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি দোষারোপ করা কখনই সঙ্গত নহে। আর তাহা করিলে, বর্ত্তমানযুগের সর্ব্বধর্ম্মই আচারবিহীন বলিতে হইবে।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

---

(১) সন্ন্যাসীরা চতুর্থাশ্রমের আচার অবশ্য পালন করিবেন। শাস্ত্রে সন্ন্যাসীর যে আচারের বর্ণনা আছে, তাহা আমরা প্রকাশ করিব। হিঃ পঃ সঃ।

রণ-গাথা।

(৩য় কবিতা)

(১)

ঝঙ্কার ঝঙ্কার ঝঙ্কার রে বীণা,
রে বীণা, ঝঙ্কার তুমি বারবার,
কভু বিলম্বিত কভু দ্রুতপদে।
ঝঙ্কার পশিয়া শ্রবণে, হৃদয়ে,
জাগা'ক্ বঙ্গের অধিবাসিগণে।
শিখ্ হিন্দু বৌদ্ধ মোশ্‌লেম্ খৃষ্টান্
সবাই জাগুক্ এই জাগরণে।
সবাই পশুক্ এই মহারণে—
জ্বলিয়া পুড়িয়া সমর-অনলে—
হউক্ বাহির খাঁটি সোণা হ'য়ে।
করুক্ উজ্জ্বল জননীর মুখ,
হউক্ সুধন্য ধরণীমাঝারে।
জয় বিশ্বপতি-জয়,
জয় সম্রাটের জয়,
জয় সাম্রাজ্যের জয়,
জয় ভারতের জয়,
জয় বঙ্গমাতা জয়।
বল কি ভয় কি ভয়?
যতোধর্ম্মস্ততো জয়,
বল কি ভয় কি ভয়?

(২)

বঙ্গের মোশ্‌লেম্‌বৃন্দ! পারস্য, আরব,
তাতার, মিশর, মঙ্গোলিয়া, তুর্কীস্থান
বহুদেশ হ'তে আসি ভারতবর্ষে—
হ'য়েছ ভারতবাসী আজি বহুদিন।

ভারতের জলবায়ু, ভারতের মাটী,
ভারতের নদ-নদী পাহাড় পর্ব্বত,
ভারতের মরুভূমি অরণ্য সাগর,
ভারতের বৃক্ষ-লতা পত্র-পুষ্প-ফল,
ভারতের চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রতারকা—
পশি মরমে মরমে অস্থিমজ্জা মাঝে
করিয়াছে তোমা সবে ভারত-সন্তান।
ভারতের ভাষা সব এবে "মাতৃভাষা"
তোমাদের,—বাঙ্গালা, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী,
তামিল, তেলেগু, মারহাট্টা, কানাড়ী,
আসামী, পাঞ্জাবী, পার্ব্বতীয়া, গুজরাটী।
কোটি কোটি ভারতসন্তান ইস্‌লামে
হইয়া দীক্ষিত, তোমাসহ মিশে গেছে।
বহুকাল ভ্রাতৃভাবে থাকি পরস্পর
হিন্দু মোস্লেম্ পার্শী খৃষ্টান্ "ভাই ভাই"
এবে সবে ; ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই যদি
কখনো বা হয়, কিন্তু তবু ভাই-ভাই।
কেবল কথার পেঁচ ধর্ম্মের বিরোধ—
মস্‌জিদে মন্দিরে বা গির্জ্জায় এক ঈশে
পূজে মানব-সন্তান, পৃথিবীর মাঝে।
জয় বিশ্বপতি জয়,

* * *

(৩)

জেনে রেখো সারসত্য, হে মোস্লেম্‌কুল,
"আত্মাই আত্মার শত্রু অন্য কেহ নহে।"
ইহাও জানিও, "ইংরাজ মোদের মিত্র,
শত্রু নহে কভু ; আর সুজলা-সুফলা
শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালা মাতৃভূমি তব।"
এস ভ্রাতৃভাবে সবে কর আলিঙ্গন—
হ'য়ে একমনপ্রাণ কর স্বদেশের

উদ্ধার-সাধন। ভারতের রক্ষাহেতু
ছুটিছে মোস্লেমবর্গ পঞ্চনদ হ'তে,
আগরা অযোধ্যা দিল্লী বোম্বাই মান্দ্রাজ।
মোস্লেম্-ভূপতিবর্গ ভূপাল, ভাওয়াল,
প্রবল নিজাম, সবে সর্ব্বস্ব অর্পিছে
এই মহারণযজ্ঞে সাম্রাজ্যসেবায়—
সম্রাট্-সেবায়। শুধু বাঙ্গালী মোস্লেম্
ঘুমায়ে রবে কি এই মহাজাগরণে ?
জয় বিশ্বপতি জয়.

* * *

(৪)

বাঙ্গালার শিরোমণি "ঢাকার নবাব"
মোস্লেম্-গৌরবরবি প্রবেশি এ রণে
সামান্য সৈনিকরূপে, মোস্লেম্-গৌরব
স্মরি, ডাকিছেন এবে তোমা সবাকারে।
সুদূর বৃটন্ হ'তে ডাকেন সম্রাট্
উচ্চৈঃস্বরে যোগ দিতে এই মহারণে,
স্থাপিতে সাম্যের রাজ্য পৃথিবীর মাঝে।
সে নহে পুরাণ কথা, সমগ্র মেদিনী
কেঁপেছিল যবে মোস্লেমের বীরদাপে।
সে নহে পুরাণ কথা, যবে পিতৃগণ
তব, জ্বালিয়া জ্ঞানের আলোক, নাশিল
ঘোর অজ্ঞান-তিমির বঙ্গদেশ হ'তে।
অক্ষয় মোস্লেম্ কীর্ত্তি হ'তেছে ঘোষিত—
সহস্র কবির কণ্ঠে দশদিক্ হ'তে।
জয় বিশ্বপতি জয়.

* * *

(৫)

বীরের শোণিত শিরায় শিরায় তব
বহে সদা দ্রুতবেগে, তীরন্দা-অখ্যাতি-

নাহি করে কলঙ্কিত মোস্লেমে কখনো।
ঘোষিলেন এই সাম্য নীতি হজরৎ
মহম্মদ, চালিত মোস্লেমবর্গ তাহে—
সমস্ত মেদিনী মাঝে। ন্যায়, সাম্য, ধর্ম্ম,
স্বাধীনতা তরে অকাতরে বিসর্জ্জিতে
প্রাণ, কে সমর্থ বল মোস্লেমের প্রায়?
না—না—চলিবেনা—না জাগিলে তোমাসবে
এই মহাজাগরণে। সাজেনা এ নিদ্রা—
এই মোহনিদ্রা—হে মোস্লেম্ বীরবৃন্দ!
পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরি, নিষ্কোষিত কর অসি,
দেখাও মোস্লেমবীর্য্য রণক্ষেত্রে পশি,
শিখাও দানবে 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়.'
"আল্লাহো আক্‌বর," উঠুক্ সহস্রকণ্ঠে,
ঝন্ ঝন্ শব্দ করুক সহস্র কৃপাণ
কম্পিত হউক্ ধরা বীরপদ-ভরে।
রাজভক্তি দেশভক্তি সত্য-সাম্য ভক্তি
দেখুক্ সমস্ত পৃথ্বী বঙ্গের মোস্লেমে।
বাড়ুক্ বঙ্গের যশ সমস্ত ভারতে।
ওই শুন—ওই শুন ভেরীর আহ্বান,
ওই শুন—ওই শুন সাম্যের আহবান,
সুদূর বৃটন্ হ'তে ডাকে তোমা সবে;
ভ্রাতৃভাবে মিলি এবে হও আগুয়ান্—
শাসহ অসুরকুলে পশি এই রণে।
উঠুক্ সহস্রকণ্ঠে "আল্লাহো আক্‌বর!"
করুক্ সহস্র অসি ঝন্-ঝন্‌ৎকার।

জয় বিশ্বপতি জয়,
জয় সম্রাটের জয়.
জয় সাম্রাজ্যের জয়,
জয় ভারতের জয়,
জয় বঙ্গমাতা জয়।
বল কি ভয় কি ভয়?
যতোধর্ম্মস্ততো জয়,
বল কি ভয় কি ভয়?

শ্রীযদুনাথ মজুমদার।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতোমম॥ ১

সান্বয়ব্যাখ্যা। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগত্ ইতি ভগবতাভিহিতং শ্রুত্বা জগদাত্মরূপমাদ্যমীশ্বরং সাক্ষাৎ-কর্ত্তুমিচ্ছন্ অর্জ্জুন উবাচ। মদনুগ্রহায় (মদনুগ্রহার্থং শোকনিবৃত্তয়ে) পরমং (নিরতিশয়ং) গুহ্যং (গোপ্যং) অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতং (আত্মানাত্মবিবেক-বিষয়ং) যত্ বচঃ (অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং ইত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং) ত্বয়া উক্তং, তেন মম অয়ং মোহঃ (অহং হন্তা এতে হন্যন্তে ইত্যাদিলক্ষণোভ্রমঃ) বিগতঃ (বিনষ্টঃ।) ১

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন—আমার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থ পরম-গোপনীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের গুহ্য-কথা যাহা আপনি বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া আমার মোহ বিদূরিত হইল। ১

আলোচনা। পূর্ব্বাধ্যায়ে ভগবান্ আত্মবিভূতি বর্ণনা করিয়া শেষশ্লোকে বলিয়াছেন যে, 'আমি আমার একাংশে সমুদায় জগত্ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি।' অর্জ্জুন এই ভগবদ্‌বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বরীয়রূপ-দর্শনার্থ অভিলাষী হইয়া বলিতেছেন,—"হে ভগবন্! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, পরমগোপনীয় আত্মানাত্মবিষয়ক কথা, যাহা আপনি আমাকে ২য় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোক হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, তাহাতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, "আমি হন্তা, ভীষ্ম-দ্রোণাদি বধ্য" আমার এই সংস্কার ভ্রম মাত্র। আপনার উপদেশে আমার মোহ গত হইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি যে, কোন কার্য্যেই আমার কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই। ১

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে কমল-পত্রাক্ষ (পদ্মপলাশলোচন) ত্বত্তঃ (ত্বত্ সকাশাত্) (অহং কৃত্স্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ইত্যাদৌ ৭ম ৬ শ্লো) ভূতানাং

ভবাপ্যয়ৌ (ভবঃ সৃষ্টিঃ উত্পত্তিঃ, অপ্যয়ঃ প্রলয়ঃ) ময়া বিস্তরশঃ (পুনঃ পুনঃ) শ্রুতৌ, অব্যয়ং (অক্ষয়ং) মাহাত্ম্যমপিচ (শ্রুতম্) ২

বঙ্গানুবাদ। হে পদ্মপলাশলোচন, আপনার নিকট ভূতগণের উত্পত্তি ও বিনাশ এবং আপনার অক্ষয় মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিলাম। ২

আলোচনা। ভগবান্ ইতঃপূর্ব্বে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে—(৭অ ২৪ শ্লো) অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং—" (৯ অ ৪ শ্লো) "ময়াততমিদং সর্ব্বং—" (৯ অ ৯ শ্লো) "নচ মাং তানি কর্ম্মাণি—" ইত্যাদি বহু স্থলে তাঁহার বিশ্বসৃষ্টি-কর্তৃত্ব সর্ব্বভূত-নিয়ন্তৃত্ব, শুভাশুভকর্ম্মফলদাতৃত্ব প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং জীবের সর্ব্ব-কার্য্যে অকর্তৃত্ব বলিয়াছেন, তত্তাবৎ অবগত হইয়া, ও ভগবদ্বাক্যে অটল আস্থাবান্ হইয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন—"হে ভগবন্, আপনার কৃপায় আমার "অহংকর্ত্তা"-ইত্যাকার মোহ দূরীভূত হইয়াছে। ২

এবমেতদ্ যথাত্থত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে পরমেশ্বর, যথা (বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ইত্যাদি) ত্বং আত্মানং (ঐশং রূপং আত্মস্বরূপং) আত্থ (ব্রবীষি) এতৎ এবম্ (তথা এব ন অন্যথা, তত্র অবিশ্বাসো মে নাস্তি) (তথাপি) হে পুরুষোত্তম, তে (তব) ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুং (সাক্ষাৎকর্ত্তুং) ইচ্ছামি। ৩

বঙ্গানুবাদ। হে পরমেশ্বর, আপনার বিষয় যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা সেই রূপই বটে, তথাপি হে পুরুষোত্তম, আমি আপনার ঐশ্বরিকরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩

আলোচনা। ভগবানের কথিত বিশ্বব্যাপক-রূপে অর্জ্জুনের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তথাপি তাহা চক্ষে দেখিবার ইচ্ছা হওয়ার কারণ কৌতুহল-নিবৃত্তি এবং সেইরূপ ধ্যানপূর্ব্বক অপরোক্ষ-জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া কৃতার্থতা-লাভ। ৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়াদ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে প্রভো (স্বামিন্), হে যোগেশ্বর (যোগিন এব যোগাস্তেষামীশ্বরঃ) যদি তত্ (তদ্রূপং) ময়া দ্রষ্টুং শক্যং ইতি মন্যসে (চিন্তয়সি) ততঃ ত্বং মে (মহ্যং) অব্যয়ম্ (নিত্যং) আত্মানং (আত্মস্বরূপং) দর্শয়। ৪

বঙ্গানুবাদ। হে যোগেশ্বর, হে প্রভো, যদি আমাকে সেই ঐশ্বরিক-রূপ দর্শনে সমর্থ মনে করেন, তবে আমাকে সেই অব্যয় আত্মরূপ দর্শন করান। ৪

আলোচনা। ভগবানের যে বিশ্বরূপের দর্শন দেবতাগণেরও প্রার্থনীয়, অর্জ্জুনও তাহা দেখিতে অসমর্থ; তবে ভগবানের কৃপা হইলে সবই হইতে পারে। অর্জ্জুন গোঁড়াতেই বলিয়াছেন—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং" (২অ ৭শ্লো।) আমি আপনার শিষ্য এবং শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দান করুন। অর্জ্জুন শিষ্য ভক্ত এবং জ্ঞানী, সুতরাং তাঁহার আব্দার করা চলে। তথাপি অর্জ্জুন বলিতেছেন—"আপনার সেই বিশ্বরূপ-দর্শনে যদি আমারে সমর্থ মনে করেন।" আমি জানি, আপনার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি দ্বারা আপনি অসমর্থকেও সমর্থ করিয়া লইতে পারেন। অর্জ্জুন নিজ পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে ও ক্ষুদ্রশক্তিতে সে রূপ দেখিতে অশক্ত, তাই ভগবানের কৃপাভিখারী হইয়া সেই বিশ্বরূপদর্শনের প্রার্থী হইয়াছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ। হে পার্থ মে (মম) দিব্যানি (অলৌকিকানি) নানাবিধানি (অনেকপ্রকারাণি) নানাবর্ণাকৃতীনি (নানাবর্ণানি শুক্লপীতনীলাদিবর্ণানি নানাকৃতীনি চ) শতশঃ সহস্রশঃ (অনেকশ ইত্যর্থঃ) রূপাণি পশ্য। ৫

হে ভারত (মমদেহে) আদিত্যান্ (দ্বাদশ) বসূন্ (অষ্টৌ) রুদ্রান্ (একাদশ) অশ্বিনৌ (দ্বৌ) তথা মরুতঃ (ঊনপঞ্চাশত্) বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি (পূর্ব্বং কুত্রাপি ন দৃষ্টানি) আশ্চর্য্যাণি পশ্য। ৬

হে গুড়াকেশ, ইহ (অস্মিন্) মম (বিশ্বাত্মকে) দেহে একস্থং (অবয়বরূপেণ স্থিতং) কৃৎস্নং (সমগ্রং) সচরাচরং (স্থাবর-জঙ্গম-সহিতং) জগৎ অন্যচ্চ যত্ দ্রষ্টুং ইচ্ছসি (তত্) অদ্য (অধুনৈব) পশ্য। ৭

অনেন (ইহ প্রাকৃতেন) স্বচক্ষুষা এব তু মাং (অপ্রাকৃততেজঃপুঞ্জং বিশ্বরূপধরং অপ্রমেয়ং) দ্রষ্টুং ন শক্যসে (অতঃ) তে (তুভ্যং) দিব্যং

(অলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং) চক্ষুঃ দদামি, মে (মম) ঐশ্বরং (অসাধারণং) যোগং (অঘটন-ঘটন-সামর্থ্যং) পশ্য। ৮

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! আমার অলৌকিক নানাবর্ণ নানা-আকৃতি-বিশিষ্ট শত-শত সহস্র-সহস্র দিব্য রূপ দর্শন কর। ৫

হে ভারত! আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশৎ বায়ু, যাহা পূর্ব্বে কখন দেখ নাই—এমন বহুবিধ আশ্চর্য্য পদার্থ অবলোকন কর। ৬

হে অর্জ্জুন, আমার এই বিশ্বাত্মক দেহে একত্র অবস্থিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ এবং আর যাহা কিছু তোমার দেখিতে ইচ্ছা হয়, তৎসমুদয় অবলোকন কর। ৭

কিন্তু তুমি তোমার এই চক্ষু দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার অসাধারণ যোগ (অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য) দর্শন কর। ৮

আলোচনা। মানবে যাহা অসম্ভব, ভগবানে তাহা সম্ভব—ইহাই ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। মনুষ্যের প্রাকৃতিক চক্ষু দ্বারা ভগবান্‌কে দর্শন করা যায় না, তাঁহাকে দেখিতে হইলে দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন। আমরা সাধারণ চক্ষুর অগোচর বস্তু সকল বিজ্ঞান-লব্ধ অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পারি। ভগবান্‌কে দর্শন করিতে হইলে ততোধিক শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান-চক্ষুর প্রয়োজন। সাধনা-বলে ও ভগবৎকৃপায় মনুষ্য দিব্যচক্ষু লাভ করিতে পারে, ইহা জ্ঞানবানের কাছে অসত্য নয়। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"তোমার সাধারণ চক্ষু দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইবেনা; আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি, ইহা দ্বারা তুমি আমার বিশ্বরূপ দর্শন কর।"

ভগবান্ অনন্তশক্তির আধার, মানবে সেই শক্তির কণামাত্র বিকাশ। যাহাতে ভগবদ্ভাব যত অধিক, তিনি তত শ্রেষ্ঠ। মানবশক্তি যতই অধিক হউক না কেন, তাহা সীমাবিশিষ্ট। সাধারণ মানবচক্ষু পরিমিতগ্রাহী। যোগ-সাধনে এবং ভগবৎকৃপায় এই শক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে। অর্জ্জুন কেবল ভগবানের ভক্ত ও সখা নহেন, তিনি পরমযোগীও বটে। ভগবান্ যে বলিলেন—"আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, তুমি আমার বিশ্বরূপ-দর্শন কর—" এই দিব্যচক্ষু অলৌকিক জ্ঞান-চক্ষু, ইহাকে তৃতীয়চক্ষু বা যোগনেত্র বলা যায়। তন্ত্রমতে

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞা-চক্রে ইহার স্থান। প্রজ্ঞালোকে ইহার বিকাশ হয়। ভগবৎকৃপাপাত্র ও যোগী ভিন্ন ইহার অধিকারী অন্যে নয়। সুপণ্ডিত বাবু দেবেন্দ্রবিজয় বসু গীতার যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, যে, কেহ বলেন আমাদের মস্তিষ্ক মধ্যে এক স্থান আছে, যাহাকে পাইনাল্ গ্লাণ্ড বলে, তাহাই এই যোগজ তৃতীয় চক্ষুর স্থান; তাহার বিকাশে দিব্য দৃষ্টি জন্মে, সেই দৃষ্টি লাভ করিলে প্রকৃত তত্ত্বদর্শী হওয়া যায়।

ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন; অষ্টসিদ্ধি তাঁহার বিভূতি মাত্র। যোগসাধন-বলে মানব সেই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। অষ্টসিদ্ধি-সম্পন্ন যোগী দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, দূরগমন, দেহান্তর-ধারণ, ইচ্ছা-মরণ, নিজের কি অন্যের পরমায়ুঃ বর্দ্ধন করিতেও পারেন। ইহার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য, মণ্ডন মিশ্রের পত্নীর নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া কামশাস্ত্র-শিক্ষার জন্য রাজার মৃতদেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—ইহা শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত-পাঠে জানা যায়। ঈদৃশ সিদ্ধ পুরুষেরা আপন শক্তি অপরে সঞ্চারিত করিতে পারিতেন। পূর্ব্ব-কালে তপঃশালী সিদ্ধ ঋষিগণ শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া, আপন অধিগত বেদাদি শাস্ত্র, শক্তি-সঞ্চার দ্বারা শিষ্যগণকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিতেন, শাস্ত্রীয় ইতিহাস-পাঠে ইহার বহু সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগেশ্বর ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে (শক্তি সঞ্চার করিয়া) দিব্য চক্ষু প্রদান করিবেন, ইহা অসাধারণ ও অলৌকিক হইলেও অসম্ভব নহে।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে দিব্য-চক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কল্পনা-প্রসূত বা ক্ষণিক মায়াময় নহে। মায়াবাদীরা ভগবান্‌কেও ঐন্দ্রজালিকচূড়ামণি বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—"ঈশ্বর ঐন্দ্রজালিক-চূড়ামণি" তিনি ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া জীবকে মোহিত করিতেছেন—

য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ৩।১

—ঈশ্বর মায়াময় সত্য, তাঁহার মায়াপ্রসূত জগৎও ব্যবহারিক সত্য। এই মায়া ও জগৎ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভগবানের এই মায়া—রাবণের মায়াসীতা-বধ অথবা ভোজবাজী, কি পাশ্চাত্য-হিপনটিজমের মত দর্শকের ভ্রম জন্মান নয়। অর্জ্জুন দিব্যদৃষ্টি দ্বারা যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন

তাহা সত্য—পারমার্থিকভাবে সত্য। অর্জ্জুন স্বয়ং যোগী, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান্ তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দিয়া ভগবানের সমগ্র স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া, বিশ্বরূপ-দর্শনের উপযোগী করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সেইরূপ দেখিবার যোগ্য হইয়াছিলেন। ভগবান্ অর্জ্জুনের সম্মুখে সারথি-রূপে অবস্থিত; তখন ভগবান্ মানবদেহধারী তাঁহার সারথি মাত্র। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলেন। ভগবান্ অর্জ্জুনের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, একাগ্র করিয়া, দিব্যশক্তিসম্পন্ন করিয়া, সেই মানবদেহ মধ্যে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। অর্জ্জুনের চিত্ত একাগ্র করাইবার জন্য প্রথমে বলিলেন—তোমাকে দিব্যচক্ষু দিলাম, তুমি আমার এই দেহ মধ্যেই বিশ্বরূপ দেখ। এই কথা শুনিয়াই অর্জ্জুন যোগযুক্ত হইলেন। সম্মুখে আর ভগবানের মানবদেহ দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার স্থানে দেখিলেন, সে দেহ বিশাল বিরাট্ বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে, সমস্ত বিশ্ব তাহার মধ্যে নিহিত আছে। এই সমুদায় জগৎ সে দেহের এক-স্থানে মাত্র অবস্থিত রহিয়াছে। ৫। ৬। ৭। ৮

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলচরণ দাশগুপ্ত।

ভারতের ব্রাহ্মণ।

(১)
পাতসাহ সেকন্দর।
ভারতের দ্বারে উপনীত যবে,
সবে কাঁপে থর থর।

(২)
লভিয়া বিজয় যবে,
নৃপতি চলিলা আপনার দেশে;
হরষিত হ'ল সবে।

(৩)
পাতসাহ ভাবে মনে,
লারা জগতের শ্রেষ্ঠ ভারত;
ছাড়ি যাই এইক্ষণে।

(৪)
মোর দেশবাসী জনে,
'ভারত হইতে কি আনিলে ভূপ
সুধাইবে যেইক্ষণে,—

(৫)
কি দিব তা'দি'কে আমি,
নিখিল জগৎ বিজয় করিয়া—
আমি জগতের স্বামী;

(৬)
চিন্তিত নরপতি;
কি আছে ভারতে শ্রেষ্ঠ রতন ?
—হা! হা! ভারতের কৃতি;

(৭)

ভারতের মহাঋষি ;
যাঁহাদের জ্ঞান-গৌরভ লভি'
উজলিত দশদিশি।

(৮)

আমি শুধু তাঁরে চাই ;
মণি-মুকুতার উজল কিরণ—
এঁর কাছে শুধু ছাই !

(৯)

আদেশ করিলা তবে ;—
"মহাতপস্বী ভারত-গরব
ব্রাহ্মণে আন সবে।"

(১০)

তবে পাতসাহ-চর ;
বিশ্ব-বিজয়ী নৃপের আদেশে—
ফিরে ঘর পর পর।

(১১)

অতুল-বিভব-লোভে,
আসিল না কেহ ; দূত ঘরে ঘরে
ফিরে নিস্ফল ক্ষোভে।

(১২)

শুনিলা নৃপতি শেষে ;
জ্ঞান-গরিমায় ধরমে ও তেজে—
আছে সেই পূত দেশে,

(১৩)

ব্রাহ্মণ একজন ;
নৃপতি অশেষে জানাইলা তাঁরে
আপনার নিবেদন।

(১৪)

"মণি-মুকুতার ভার,
যাহা চাহ দিব" কহে পাতসাহ,
"তোমারে কি দিব আর ?"

(১৫)

"রাজকোষ হতে লহ ;
যাহা চাহ ঋষি ; সুধু অনুরোধ
রক্ষিবে মোরে কহ।"

(১৬)

টলিল আসন তার ;
পাতসাহ সনে, চলিলা ব্রাহ্মণ—
সিন্ধুনদের পার।

(১৭)

তবে কতদিন পরে,
স্বদেশের কথা জাগিয়া উঠিল,
পরাণের থরে থরে।

(১৮)

ভাবিলেক মনে মনে :
ছি ! ছি ! একি লাজ ! অর্থের লোভে
ত্যজিয়াছি নিজ জনে।

(১৯)

ভারতের পূত গেহ ;
ভারতের গাথা, ভারত-সাধনা,
গড়িয়াছে মোর দেহ।

(২০)

ভুলিয়া সে সব আজি,
আসিয়াছি এ যে সিন্ধুর পারে
পাতসাহ-দাস সাজি।

* সিন্ধুনদ।

(২১)

ব্রাহ্মণ উঠে তবে,
মহাবেদনায় পূর্ণ পরাণ ;
পাতসাহ বসি যবে,

(২২)

সভা-সজ্জন মাঝে ;
মহাগৌরবে ব্রাহ্মণ আসি
দাঁড়াইল নিজ সাজে।

(২৩)

কহিলা সবার শেষে,
"অনুমতি দেহ ফিরে যাই আমি
মোর নিজ পূতদেশে।"

(২৪)

পাতসাহ সেকন্দর ;
করিলা মিনতি বহুরূপে তবে,
"কেন যাবে ফিরে ঘর ?

(২৫)

"মহাগৌরবে রহ ;
কি অভাব তব ? হে তাপস মোরে
নির্ভয়ে আজি কহ।"

(২৬)

"শুন নরপতি তবে ;
ভারতের ঋষি জগতের সেরা—
সিন্ধুর পার হবে !

(২৭)

স্বপনেও ভাবি নাই ;
ভারতের জ্ঞান-গৌরবে ভরা—
এ জীবনে শুধু চাই,

(২৮)

তিল তিল নিশিদিন,
মিলাইয়া দিতে ; ভারতের ধূলি-
মাঝে হইবারে লীন।

(২৯)

অনুরোধ নাহি পারি
রাখিবারে ভূপ ; ক্ষম মোরে আজি
ভারতের নর-নারী—

(৩০)

সাক্ষী করিয়া সবে
অর্থ-লালসা পূর্ণিত প্রাণ—
ত্যজিতে আমার হবে।

(৩১)

নীরব সভার লোক !
নিশ্বাস ফেলি বলিলা ভূপতি
"হে তাপস, তাই হোক্" ।

(৩২)

ব্রাহ্মণ দেশে ফিরি
অনুগত জনে করিলা আদেশ
"এস মোরে সবে ঘিরি"—

(৩৩)

"তুষানলে দেহ শেষ
করিতে বাসনা করিয়াছি আমি,
পাপের না রাখি লেশ।"

(৩৪)

গরজি অনল উঠে,
দেখিতে দেখিতে বন্ধন শত
পড়ে ভূমিতলে লুটে।

(৩৫)

পঞ্চভূতের দেহ,
মিশি গেল তবে ভূতের মাঝারে
না বলিল কিছু কেহ।

শ্রীকেশবলাল বসু।

সৃষ্টি ও তাহার পরে।

সৃষ্টির প্রথমে কেবল পরমজ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ছিলেন।

"নাহোন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি
র্নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ॥"

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয়াধ্যায়

অর্থাৎ অহোরাত্রি নভোভূমি অন্ধকার আলোক কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের অগোচর প্রধান ও পুরুষ ছিলেন। প্রধান বা প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। ত্রিগুণাত্মক পুরুষভাব ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ব্রহ্মের প্রথম গুণময় ভাবই। তাঁহারই শক্তি আদ্যাশক্তি, বৈষ্ণবদের রাধা বা যোগমায়া। তিনিই প্রকৃতি এবং তিনিই জগজ্জীবকে মোহিত করেন। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায়—

"অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ
তদণ্ডমভবৎ হৈমং সহস্রাক্ষ-সমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোক-পিতামহঃ।

অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্ম আকার ধারণ করিয়া জলের (কারণ-বারির) সৃষ্টি করেন, তাহাতে অণ্ডাকার সুবর্ণময় শুক্র নিক্ষেপ করেন। তাহাতেই সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মা উদ্ভূত হন। ব্রহ্মা নিজেই উৎপন্ন হন, এইজন্য তাঁহাকে "স্বয়ম্ভু" বলে। শিব আর দেহত্যাগ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে অনাদি বলে। ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণু মহামায়ায় বিমোহিত রহিলেন। এই মহামায়া বহু-জন্মের পর আবার শিবকে পতিত্বে বরণ করেন।

বেদ সেই সাকার ব্রহ্মের বাক্য, ইহা সাধারণ-পুরুষ-প্রণীত নহে, এইজন্য বেদকে "অপৌরুষেয় বাক্য" বলা হয়। ইহা চারিভাগে বিভক্ত—ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব। ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে; বিষ্ণু বিষ্ণুলোকে বা গোলকে; শিব শিবলোকে বা কৈলাসে; সৃষ্টি স্থিতি ও সংহাররূপী হইয়া আছেন। পূর্ব্বোক্ত ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণু জগজ্জীবের মঙ্গলহেতু সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।

গীতা—

"যদা যদাহিধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

অর্থাৎ যে সময় ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সে সময় আমি আত্মাকে সৃজন করি, এবং সাধুদিগের পরিত্রাণ জন্য ও পাপিদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

দেবগণ অসুরাদি দুষ্ট কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া যে সময় "হা ভগবন্! হা ভগবন্!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন, তখন তিনি শরীরধারণ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ-সাধন করেন। সেই সাকার ব্রহ্মরূপ বিশ্বশিল্পীর কৌশলে এই চতুর্দ্দশ ভুবন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সমুদ্র পর্ব্বত প্রভৃতি যেন একসূত্রে গাঁথা। সেই বিশ্বনিয়ন্তার আজ্ঞায় এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড জীবের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছে। আবার কোন সময় দেবগণ ও মনুষ্যগণ অসুরাদি কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া "ত্রাহি জগদম্বে—ত্রাহি জগদম্বে" বলিয়া শক্তিরূপা মহামায়াকে ডাকেন, তখন তিনি আবির্ভূতা হইয়া দানব-দলন করেন।

ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয় নাভি-কমলে প্রকাশমান ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইলে তিনি যোগমায়ার স্তব করেন। তখন যোগমায়া মহাবিষ্ণুকে ত্যাগ করেন। তাহার পর বিষ্ণু, চক্রের দ্বারা তাহাদের মস্তক ছেদন করেন। পরে ঐ মধু কৈটভের মেদ দ্বারা এবং সমুদ্রের ফেন দ্বারা মেদিনীর উৎপত্তি হয়।

বেদান্তদর্শনের ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ১২ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করের উক্তি—

"শ্রুত্যন্তরমপি সমানাধিকারমন্যাঃ পৃথিবীতি ভবতি তদ্ যদপাং সরঃ আসীৎ তৎ সমহন্যত সা পৃথিব্যভবদিতি।

যথা—সৃষ্টিকালে যে জলের সর হইয়াছিল তাহা সংহত অর্থাৎ কঠিন হইলে পৃথিবী হইল।

ঋগবেদে আছে—

"চক্ষুষঃ পিতা মনসাহি ধীরো
ঘৃতমেনে অজনন্নম্নমানে

যদেদং ত্বা অদদৃংহচ্চপূর্ব্বি
আদি দেব্যা পৃথিবী অপ্রথেতাং।"

সেই ধীর পিতা উত্তমরূপে সৃষ্টি করিয়া মনে মনে আলোচনা করিয়া জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবাপৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। যখন ইহার চতুঃসীমা ক্রমশঃ দূর হইয়া উঠিল, তখন দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিলেন।

"শুধ্বরং তানি কথ্যন্তে ভুবনানি চতুর্দ্দশ"

পাতাল অবীচি—তদূর্দ্ধে যথাক্রমে আর ছয়টী নরকস্থান। মৃত্তিকাস্থান জলস্থান অগ্নিস্থান বায়ুস্থান আকাশস্থান ও অন্ধকারময় মহাকাশস্থান। পূর্ব্বোক্ত ছয়টী স্থান অম্বরীষ রৌরব মহারৌরব কালসূত্র তামিস্র ও অন্ধতামিস্রনামে অভিহিত। ইহা ভিন্ন উপনরক—মহাতাল রসাতল তলাতল সুতল বিতল অতল ও পাতাল এই সাতটী।

সপ্তস্বর্গ—ভূলোক মেরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত, তদূর্দ্ধে ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষলোক, তদূর্দ্ধে স্বর্গলোক,—মহেন্দ্রলোক, তদূর্দ্ধে মহর্লোক, তদূর্দ্ধে প্রজাপতিলোক বা ব্রহ্মলোক ইহা তিনভাগে বিভক্ত যথা—জন, সত্য ও তপোলোক। ভূলোকে সপ্তকুলাচল ও লবণেক্ষু সুরা প্রভৃতি সপ্তসমুদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ইক্ষু সুরা প্রভৃতি রসাস্বাদনযুক্ত জল দেখা যায় না। রহস্য বুঝা কঠিন। পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণ একটু ভূলোকের সংবাদ জানিয়াই আত্মাকে গর্ব্বিত মনে করেন, আর আর্য্য ঋষিগণ যোগবলে চতুর্দ্দশ ভুবনের সংবাদ জানিতেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যোগবলে অন্যলোকে যাইতে পারিতেন; নারদাদি ঋষিগণ যোগবলে সমস্ত লোক ভ্রমণ করিয়া জীবকে সদুপদেশ দান করিতেন—প্রাচীনগ্রন্থে তাহার ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার পর ভগবান্ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়হেতু বিষ্ণু জগতের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্ট মনুষ্যদিগকে চারিটী বর্ণে বিভক্ত করেন। গীতা—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"

সৃষ্ট বর্ণের মধ্যে প্রথমবর্ণ ব্রাহ্মণকে জ্ঞানের চর্চ্চায় নিয়োগ করিলেন, দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়কে রাজকার্য্যে, তৃতীয়বর্ণ বৈশ্যকে কৃষি বাণিজ্যে এবং শেষবর্ণ শূদ্রকে সেবাকার্য্যে নিয়োগ করিলেন।

এখানে বলিয়া রাখি, ভগবান্ ভিন্ন কেহই উক্ত বর্ণের সৃষ্টি করিতে পারেনা।

"পৃথিব্যাং ভারতং বর্ষং কর্ম্মভূমিরুদাহৃতা
ন খল্বত্র মর্ত্ত্যানাং ভূমৌ কর্ম্ম বিধীয়তে"

অর্থাৎ পৃথিবীতে ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, অন্যত্র মানবের বিশেষ কর্ম্মের বিধান নাই।

ইহার দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, আর্য্যেরা ভারত ভিন্ন অন্য দেশও জানিতেন, কিন্তু এরূপ সুজলা সুফলা ভূমি কুত্রাপি নাই জানিয়া সে সব দেশের আদর করিতেন না। অন্যত্র এরূপ ষড়্‌ঋতু বিরাজমান নাই। কোন দেশ মরুময়, কোন দেশ প্রায়শঃ কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন থাকে, কোন দেশ অনুর্ব্বর, কোন দেশ পার্ব্বত্য ও বন্ধুর, কোন দেশে বারমাস শীত ও বরফ। কিন্তু ভারতে সেরূপ কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। ভারতের চারিটী জাতি হইতে বহু বর্ণসঙ্কর-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পাপিষ্ঠ বেণ রাজার রাজত্বকালে কতকগুলি বর্ণসঙ্করজাতির সৃষ্টি হয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মও এই চারিটী জাতির ধর্ম্ম হইতে বহির্গত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথা—

সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্যচ,
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকারহ।
অর্দ্ধং শকানাং শিরসোমুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ,
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ।
পারদামুক্তকেশাশ্চ, পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ
নিস্বাধ্যায়বষট্‌কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা"

কতকগুলি ক্ষত্রিয় একত্র হইয়া সূর্য্যবংশীয় সগররাজার পিতাকে বধ করেন। সগর সে সময় গর্ব্ভে ছিলেন। পরে জন্মগ্রহণ করিয়া কালে মহাবলপরাক্রান্ত হইলেন; ধনুর্ব্বেদে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার হইল। শেষে তিনি একদিন তাঁহার জননীর নিকট শুনিলেন, তাঁহার পিতাকে জ্ঞাতিরা বধ করিয়াছেন। তিনি শুনিবামাত্রই ক্রোধান্ধ হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। বশিষ্ঠদেব এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের জীবনরক্ষার জন্য অনুনয় করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালন-জন্য ধর্ম্মনষ্ট করিতে ব্যবস্থা দিলেন, কারণ ধর্ম্ম নষ্ট করিলেই মানুষের একরূপ মৃত্যু হয়। কুলগুরু বশিষ্ঠদেব তেজস্বী নির্লোভ ও ক্ষমতাশালী গুরু ছিলেন। সুতরাং সগরও তাঁহার কথা অবহেলা করিতে পারিলেন না। তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য হইল—সগর তাঁহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া অন্যরূপ বেশ করাইলেন। শকগণের মস্তক অর্দ্ধমুণ্ডিত করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন; যবন ও কাম্বোজদিগের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করাইয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

পারদদিগকে মুক্তকেশ করাইয়া ও পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করাইয়া বহিষ্কৃত করিলেন এবং তাহাদিগকে বেদাধ্যয়ন ও মন্ত্র উচ্চারণ হইতে বিরত করিলেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিই পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন হিন্দুরাজারা যে সমস্ত ধর্ম্মহীন হিন্দুদিগকে দেশান্তরিত করিতেন, তাঁহাদের বংশধরেরা কালক্রমে নানা মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। জলবায়ুর পার্থক্যে স্বরের ও ভাষার পার্থক্য হয়, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন। কত হিন্দুস্থানী বালক এদেশে আসিয়া একেবারে বাঙ্গালীর মত কথা বলিতে শিখে। এইরূপ ভিন্ন দেশে যাওয়ায় ঐ সমস্ত মনুষ্যের ভাষা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত জাতির মধ্যে প্রথমে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল, পরে ১৯১৮ বৎসর পূর্ব্বে যীশুখৃষ্ট ও ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মোহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে স্বমত প্রচার করেন।

হিন্দুধর্ম্ম অত্যন্ত প্রাচীন। বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতিযুগের মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির কতকাংশ ধরিয়া ৬৮৯৩০১৯ বৎসর হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্ম ইহার অনেক পরে প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ যে মনুষ্য-জাতির প্রথম ও প্রধান আবাসস্থল, আদিসংস্কৃতভাষা হইতে যে সমস্ত ভাষা বাহির হইয়াছে একথা নিরপেক্ষ পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। অনেক পাশ্চাত্যপণ্ডিতের মতে হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই এবং ব্রাহ্মণদিগের নিকট পৃথিবী কতঋণী, তাহা অদ্যাপি সকলে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। বাস্তবিক সামর্থ্য সত্বে সমস্ত বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ কেবল জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া জগজ্জনকে জ্ঞানী করিয়া গিয়াছেন। দধীচির স্বার্থ-ত্যাগ, আরুণির গুরুভক্তি এবং সাবিত্রী প্রভৃতির সতীত্ব এই দৃষ্টান্তের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং হিন্দুদিগকে শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে।

আদিসংস্কৃতভাষা হইতে যে অন্যান্য ভাষা বাহির হইয়াছে, তাহা কতকগুলি শব্দের দ্বারা বেশ অনুভব করা যায়। যথা—

সংস্কৃত	ইংরাজি	পার্শি
ক্রমেলক	Camel	
হয়	Horse	
মাতা	Mother	

উদক্	Water	
অপ্		আব্
আদিপুরুষ		আদম্

ইহা হইতে বুঝা যায়, সংস্কৃত শব্দগুলি মূল ও প্রাচীন, অন্যগুলি বিকৃত ও অর্ব্বাচীন। সৃষ্টিকাল হইতেই আদিসংস্কৃত বিদ্যমান, অপরগুলি তাহার পরে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন।

শীতলা-মঙ্গল। (১)

শীতলা-মঙ্গল বলি,　　শুন সবে কুতূহলী,
দেবীগুণ যেরূপে প্রচার।
রামেশ্বর যেই রীত,　　রচিলা শীতলা-গীত,
শুন সবে সেই সমাচার॥
সরকার খলিফাতাবাজ,　　তার মধ্যে শূদ্ররাজ
রায় কন্দর্প মহাশয়।
ইমাঁদপুরেতে বাড়ী,　　কায়স্থ উত্তররাঢ়ী,
দান-পুণ্যে ধর্ম্মবন্ত হয়॥
পঞ্চ করণে আদ্য,　　ঘোষ, দাস, আদি বৈদ্য,
সিংহ-কুলে কমল-প্রকাশ।
যাঁর গুণে রাঢ় ছাড়ি,　　সৈয়দপুরেতে বাড়ী,
শতাবধি সিংহ ঘোষ দাস॥

---

(১) 'শীতলামঙ্গল'-নামক প্রাচীন কাব্যের রচয়িতা গোপবংশীয় ৺রামেশ্বর ঘোষ যশোহরের অধিবাসী এবং চাঁচড়ার রাজবংশের আশ্রিত। রামেশ্বর যেরূপে ভ্রাতার বসন্তরোগের সংবাদ পাইয়া যাইতে পথে শীতলাদেবীর প্রত্যাদেশ লাভ করেন এবং তাঁহারই আদেশে 'শীতলামঙ্গল' রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা এই কবিতায় বিবৃত হইয়াছে। চাঁচড়ার রাজবংশের সহিত এই কবি রামেশ্বর ঘোষের বিশেষ সংস্রব আছে, কবি রামেশ্বর, শ্রীরাম রায় মহাশয়ের 'বিশ্বাস' ছিলেন। প্রাচীন কবি ও প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাসের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া এই প্রাচীন-কবিতা প্রকাশিত হইল। হিঃ পঃ সঃ।

যাঁহার পুণ্যের তেজে, শত্রু সবান্ধবে মজে
যে-জন তাঁহার মন্দ ভাবে।
নির্জ্জিয়া সকল অরি, রাজা এক অধিকারী
অংশ করি লয় ভ্রাতৃ-সবে॥
সদনুজ পুণ্যকায়, সত্যবাদী গুণী রায়
দানেতে তুষিলা সর্ব্বজন।
তবে রায় "শ্রীরাম", নিজ গুণে অনুপাম,
পুত্রবৎ প্রজার পালন॥
সর্ব্বানুজ শূদ্রমণি, সকল গুণেতে জ্ঞানী
শ্রীমধুসূদন তাঁর নাম।
চারি ভাই এক মতি, যেন ছিলা দাশরথি,
অবণীতে কি দিব উপাম॥
তাঁর অধিকারে ঘর, ব্রজগোপ রামেশ্বর,
শ্রীরাম রায়ের "বিশ্বাস"।
বসতি আমদাবাজে, নিয়োজিত সর্ব্ব কাজে,
পুত্রের তুলনা "নিজ-দাস"॥
দুই পরগণা "কুল্য" "করবি" সমান মূল্য,
বৈকুণ্ঠ দাস, "শীকদার"।
রামেশ্বর "চাঁচরায়" ভাইর বসন্ত গায়,
"দেয়ানে" আইল সমাচার॥
ভাইর মন্দ-বার্ত্তা পাই, মনিবের স্থানে কই,
বিদায় হৈলা "শীকদার" ঠাই।
নিশিযোগে একেশ্বর, চলি যায় রামেশ্বর,
বলিয়া কাঁদেন "ভাই ভাই"॥
নিশিতে রহিলা পথে, আর কেহ নাহি সাথে,
কহেন দেবী ভক্ত-বৎসলা—
"উঠ গোপ রামেশ্বর, জীবে তব সহোদর
আমি তার সহায় শীতলা॥
প্রভাতে গিয়া ভাই দেখ, আমার বচন রাখ,
রচনা কর আমার মঙ্গল।

প্রচারিয়া শিষ্য মুখে, সেই গীত গাবে লোকে
আমারে পূজিবে মহীতল॥"
শুনি কহে রামেশ্বর, ভক্তিযুক্ত জোড় কর—
"কোন্ অধ্যায় রচি, কি-গীত ?
পূর্ব্বের কবিত্ব নাই, জিজ্ঞাসিব কার ঠাই
কেমতে রচিব তব গীত ?"
শুনিয়া কহেন দেবী, "একান্ত মনেতে ভাবি,
গীত-রূপে করহ প্রকাশ।
পুরাণ-সংবাদ-কথা, ভারত-প্রবন্ধ গাথা
তান্ত্রিক-পূজার ইতিহাস॥"
এই আজ্ঞা পাই তথা, শীতলা-মঙ্গল গাথা,
আরম্ভ করিলা তারপর।
পাদপদ্ম দিয়া মাথে, রক্ষ দেবী রামনাথে,
এই কর্ম্ম করে রামেশ্বর॥

সংগ্রাহক—শ্রীআশুতোষ দত্ত গুপ্ত।

অভিনন্দনগীতি।

১

এস হে বঙ্গ-গগন-চন্দ্র। এস হে ধর্ম্ম-কর্ম্মবীর।
স্বনাম-ধন্য, ভারত-মান্য, কীর্ত্তি-কিরণ-দীপ্তশির।

২

পুণ্য-জননী যশোহর-ভূমি, জগতের যশঃ করিলা জয়,
"রায় বাহাদুর যদুনাথ" তাঁর যশের কেতন, করুণালয়।

---

* যশোহর-ডিষ্ট্রীক্ট্-বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে সমাগত রায় বাহাদুর শ্রীযদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি এম্. এ. বি, এল্, মহোদয়ের,—(নড়াইল টাউন্-হলে) সর্ব্বসাধারণ অভ্যর্থনা-সভায় গীত। ৩রা আগষ্ট, শনিবার ; ১৯১৮।

শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করি, দিব্য অমৃত করিয়া দান,—
মধুর "হিন্দু-পত্রিকা" সুরে করিছ আর্য্য-মহিমা-গান ॥

৩

"ভক্তি-সূত্রে" বাঁধিয়া হৃদয় "ব্রহ্মসূত্রে" ধরেছ তান,
ধীরে "আমিত্ব-প্রসার" করিয়া জাগায়েছ কোটি—মানব-প্রাণ!
ঢালি' পবিত্র সাধনার বারি, "পল্লীস্বাস্থ্য" কর প্রচার;
শুভ সাহিত্য-সম্মিলনের তুমি সুদক্ষ কর্ণধার!!

৪

তোমার স্থাপিত বিদ্যালয়েতে কত যে ছাত্র লভিছে জ্ঞান।
তব দাতব্য-চিকিৎসালয়ে লক্ষ পীড়িত লভিছে প্রাণ।
জেলা-বোর্ডের সভাপতিরূপে যশোরে করে'ছ উচ্চশির,
ব্যবহারাজীব-সমাজে উজ্জ্বল, যোগ্য পুত্র জননীর ॥

৫

ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝিয়াছ তুমি, তোমার তুলনা কোথায় পাই?
যোগ্য পুত্রে সমরাঙ্গনে হাসিতে হাসিতে দিয়েছ তাই!
পাণ্ডুক-কুল-গৌরব-রবি, বেদবেদান্ত-পারগ, ধীর!
তোমার গরিমা স্মরিয়া পুলকে ঝরিছে মোদের অশ্রু-নীর!!

রচয়িতা—শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

সংবাদ ও মন্তব্য।

সমরে সাহায্য।

মাননীয় শোণপুরাধীশ্বর যুদ্ধ-ব্যয়নির্ব্বাহার্থে—১২০০০ বাদশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। দাতা ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই।

জলতলে।

জুন মাসের ১৯ হইতে ২৩ তারিখ পর্য্যন্ত যে সকল পত্রাদি লণ্ডন হইতে ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং ২৩জুন হইতে ২৭জুন পর্য্যন্ত যে সমস্ত পার্শেল বা পুলিন্দা লণ্ডন হইতে ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই শত্রুপক্ষের দৌরাত্ম্যে জলতলে নিমজ্জিত হইয়াছে। ভগবান্ এই উপদ্রবের শান্তি করুন।

বাগেরহাট কলেজ।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, ইণ্ডিয়াগভর্ণমেণ্ট বাগের-হাট-কলেজের এফিলিয়েশন্ মুঞ্জুর করিয়াছেন। বাগেরহাটের উক্ত কলেজে আই এ পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়ান যাইবে। এই বর্ষে ১ম ও ২য় বার্ষিক শ্রেণী খোলা হইবে। মফস্বলের প্রত্যেক সহরে কলেজ স্থাপন করা দরকার, নচেৎ শিক্ষাদারিদ্র্য দূরীভূত হইবে না।

যোগ্যতার সমাদর।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, পাটনা-কলেজের অধ্যাপক পাটনা-মিউসিয়মের বর্ত্তমান কিউরেটার শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, (এফ আর এ এস্; এফ্ আর হিষ্ট্ এস্ ইত্যাদি) সংপ্রতি ভারতীয়-শিক্ষা বিভাগে (Indian Educetional Service এ) অস্থায়িভাবে উন্নীত হইয়াছেন। ভগবৎকৃপায় শ্রীমান্ স্থায়িভাবে উন্নতি লাভ করুন।

সমর-জ্বর।

এদেশে প্রায় সর্ব্বত্র সম্প্রতি এক নূতন জ্বরের আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহাকে কেহ 'সমরজ্বর' নাম দিতেছেন, কেহ বা 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' কেহবা 'ডেঙ্গু' বলিয়া ইহার নামকরণ করিতেছেন। মোটের উপর এ জ্বরের আক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও অনেকটা তীব্র—ইহা অস্বীকার করা যায় না। কলিকাতার ন্যায় বহুজনাকীর্ণ সহরে এজ্বরের মৃত্যুসংখ্যাও কম নহে। ভগবান্ এই নবউপসর্গ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করুন।

বম্বে-কংগ্রেস্।

সংস্কার-প্রস্তাবের আলোচনার জন্ম বম্বেনগরে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হইবে, দেশের অন্যতম সুসন্তান মিঃ হাসান্ ইমাম্ মহাশয়, তাহার সভাপতি হইবেন, স্থিরীকৃত হইয়াছে। সংস্কার-প্রস্তাব সম্বন্ধে নিপুণভাবে আলোচনা করা দেশের প্রত্যেক মনস্বিব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের কর্তৃত্বে দেশের প্রকৃত কল্যাণচিন্তা ও সমস্যার সুমীমাংসা হইলে পরম সুখের কারণ হইবে।

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন। (একাদশ অধিবেশন—জলপাইগুড়ি)

আগামী ১২ই ভাদ্র (বৃহস্পতিবার, ২৯শে আগষ্ট) হইতে দিবসত্রয় জলপাইগুড়িতে উত্তর-বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনের (একাদশ) অধিবেশন হইবে। যাহাতে সম্মিলনের গৌরব অক্ষুন্ন থাকে, তৎপক্ষে উদ্যোক্তাগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টার সফলতা বঙ্গমাতার সুসন্তান বঙ্গ-সাহিত্য-সেবিগণের সাহায্য-সাপেক্ষ। অধিবেশনের উদ্যোক্তাগণের একান্ত প্রার্থনা যে, বঙ্গ-সাহিত্য-সেবিগন স্ব স্ব অধিকারগত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতঃ তাহা সম্মিলনে পঠিত হইবার জন্ম অনুগ্রহ করিয়া আগামী ৫ই ভাদ্রের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া মাতৃসেবায় সহায়ক হইবেন। সাধারণ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প, কৃষি আদি সাহিত্যের অন্তর্ভূত যাবতীয় বিষয়ে সুলিখিত প্রবন্ধ আদরের সহিত গৃহীত হইবে। প্রবন্ধ-লেখক ও সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণকে এই অধিবেশনে শুভাগমন করতঃ যোগদান করিতে উদ্যোক্তাগণ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন,

অধ্যক্ষ—সাহিত্য-বিভাগ,

একাদশ উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

---

২৫ বর্ষ, ২৫শ খণ্ড ৫ম সংখ্যা।	ভাদ্র।	১৩২৫ সাল। ১৮৪০ শকাব্দ।

কুসুম।

কে তুমিগো, হাসিছ নীরবে চিরদিন এ বিশ্ব-ভবনে,
জুড়াইতে জগতের জ্বালা দুঃখ দৈন্য, পরম যতনে!
নির্ম্মল-নলিন-নেত্রপাতে দূর করি' বিশ্বের বেদনা,
জাগাইছ মর্ম্মের মাঝারে অভিরাম প্রেমের চেতনা।
বিধাতার স্নেহ মূর্ত্তিমান্, তোমার ও উল্লাস সরল,
নিরমল পরিমল-বাসে ত্রিভুবন পুলক-চঞ্চল!
সকরুণ মধুরিমামাখা প্রীতিপূর্ণ তব চারুদল
পড়ে যবে নয়নে আমার,— ফুটে উঠে হৃদয়-কমল।
আত্মহারা তোমারে হেরিয়া বড় সাধ জাগে মোর মনে,
তব পূত সৌরভ হইয়া ফিরি সুখে পবনে পবনে।
প্রকৃতির উদার ভবনে বিতরিছ সৌগন্ধ-সম্ভার,
নাহি চাহ কোন প্রতিদান, নাহি জান ক্রুর লোকাচার!
সুন্দর মধুরতররূপে বিকশিয়া রাখিয়াছ হাসি,
তোমারে ত পরশিতে নারে জগতের পাপতাপ-রাশি।

কভু হাস আপন গরবে বিলাসীর প্রমোদ-কাননে,
ঢালো নিজ নিরমলবিভা কাননেৰনয়নে আননে।
অতিদূর বনান্তের কোলে নিদারুণ গহন নির্জ্জনে,
রহ জাগি করুণার মত নিশিদিন আপনার মনে।
হেরিতে সে চারুরূপরাশি কেহ হায় ফিরিয়া না চায়,
পরিপূর্ণ নীরব সঙ্গীতে ঝরে' পড়' মরণের পায়।

কোন শ্যাম পল্লীর হৃদয়ে, কলস্বনা তটিনীর তীরে—
প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়স্নেহ-নীড়, চিরশান্ত সুস্নিগ্ধ কুটীরে,
নিরমল-কোমলতাময়ী, অপরাহ্ণে যবে পল্লীবালা,
শিরীশ-কুসুম-সুকুমার-করে গাঁথি মল্লিকার মালা—
প্রিয়তম প্রেম-দেবতার গলে দেয় প্রীতি-উপহার,
তখন কি উল্লাস-আবেশে হয় তব পুলক-সঞ্চার!

অতিদূর দ্বাপরের দিনে আনন্দ-মন্দির বৃন্দাবনে
কত সুখে হ'তে বিকশিত, পুঞ্জে পুঞ্জে নিকুঞ্জ-কাননে!
মধুময়ী যমুনার কূলে মধুমাসে গোপবালাদলে
দিত ফুল্ল তমালের তলে গুঞ্জামালা মাধবের গলে!
উথলিত লহরে লহরে শ্রীহরির বাঁশরীর তান;
কালিন্দীর নীল বারিরাশি প্রেমানন্দে বহিত উজান!

ত্রিদিবের নন্দন উদ্যানে মন্দগতি মন্দাকিনীতীরে
পারিজাত-পরিমল কভু বিতরিত কর' ধীরে ধীরে।
যুগে যুগে জগতের মাঝে চির প্রীতি করিছ প্রচার,
তোমার সৌন্দর্য্য-নিমগন সুবিশাল এ বিশ্ব সংসার!
প্রাণারাম দেবতার পদে ভকতির শুভ উপচার—
সুপবিত্র মধুর সুন্দর, তোমা বিনা কিছু নাই আর!!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

পরকাল।

(২)

মৃত্যু।

যতদিন নশ্বরদেহের সহিত জীবাত্মার মিলন থাকে, ততদিন জীবদেহ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং জগতে জীবিত থাকিয়া কার্য্য করে। জীব এই দেহ হইতে অন্তর্হিত হইয়া দেহান্তরে গমন করিলে, ইহার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি বা মৃত্যু ঘটিল—এইরূপ কথিত হয়। জীবাত্মার কখনও বিনাশ হয় না, কর্ম্মবন্ধন-হেতু জীব অন্যদেহে প্রবিস্ট হয় মাত্র।

জীবঃ সংক্রমতেঽন্যত্র কর্ম্মবন্ধনিবন্ধনঃ
(মহাভারত—বনপর্ব্ব ২০৯। ২৪)

অর্থাৎ কর্ম্ম-নিমিত্ত জীব অন্যদেহে গমন করে।

পঞ্চেন্দ্রিয়-সমাযুক্তঃ সকলৈর্বিবুধৈঃ সহ।
প্রবিশেৎ স নবে দেহে গৃহে দগ্ধে গৃহী যথা॥
গরুড়পুরাণ—উত্তরখণ্ড—তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহ দগ্ধ হইলে গৃহী যেমন গৃহান্তরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জীবও পঞ্চ-কার্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া নূতন দেহে প্রবেশ করে।

যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতনবস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ-শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতনদেহ ধারণ করে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ২। ১৩ গীতা

আত্মার এই দেহেতেই যেমন বাল্যাবস্থার পরিবর্ত্তনে কৌমার, কৌমারের পরিবর্ত্তনে যৌবন, যৌবনের পরিবর্ত্তনে বার্দ্ধক্য অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে, মৃত্যুও সেইরূপ একটা স্বতন্ত্র অবস্থা মাত্র। মৃত্যুতে কেবল এই দেহের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; কিন্তু আত্মার কিছুই হয় না; অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিমুগ্ধ হয়েন না।

এই দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধের বিচ্ছেদেই মৃত্যু। জড়দেহ ছাড়িয়া জীবাত্মা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর বিবিধপ্রকার সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া তদুপযোগি সূক্ষ্মলোকে গমন করে ও তথায় নানাপ্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া পুনরায় এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম করিবার জন্য প্রত্যাগত হইয়া প্রাণিদেহ গ্রহণ করে।

প্রমাণ—তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যাঽস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে। শ্রুতি—

সূক্ষ্মলোক।

আর্য্য মহাপুরুষগণ যোগবলে এই পার্থিব রাজ্যের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ অনুরূপ আরও ছয়টী রাজ্যের বিষয় বিদিত ছিলেন। ঐ সকল রাজ্য অসীম, অনন্ত এবং এই রাজ্যের মত নানাপ্রকার স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিপুঞ্জ ও নদ-নদী-পর্ব্বতাদির দ্বারা বিচিত্রিত। ইহাদের নাম যথাক্রমে ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য। এই সমস্ত লোকগুলিই আর্য্যজাতির পরলোক। এই লোকগুলি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম উপাদানে রচিত। ইহার পরেও আর একটী রাজ্য আছে—তাহার নাম লোকাতীতলোক, গুণাতীতলোক, চিতিধাম, আত্মধাম বা ব্রহ্মধাম। ইহাই গীতোক্ত পরম-ধাম।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। গীতা ১৫। ৬

যোগিগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে আবর্ত্তন করেন না, সেই পদকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশ করিতে পারেনা; এবং তাহাই আমার পরমধাম অর্থাৎ স্বরূপ। এই দিব্যলোক-প্রাপ্তির নামই মুক্তি। ইহাই জীবের চরম অবস্থা। যতদিন জীবের দিব্যজ্ঞান-লাভ না হয়, যতদিন এই লোক-প্রাপ্তি হয় না।

আমাদের শাস্ত্রে—"ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই ত্রিলোকের কথাই অধিক শুনিতে পাওয়া যায়; ইহার কারণ এই যে, সাধারণ মানবের এই তিন লোকের সহিতই সম্বন্ধ; তাহারা এই তিনলোকেই যাতায়াত করিয়া থাকে, ইহাদের ঊর্দ্ধে তাহাদের গতি হয় না।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি লোকগুলি ভৌগোলিক স্থানবিশেষ নহে। সমস্ত লোক একই স্থানে ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে রচিত বলিয়া এক লোকের সত্তা অপর-লোকবাসী উপলব্ধি করিতে পারে না। যেখানে ভূর্লোক, সেই খানেই ভুবর্লোক এবং সেই খানেই স্বর্গলোক। বায়ু-মণ্ডলের মধ্যে আমরা যাতায়াত করিতে যেমন কোনরূপ বাধা অনুভব করিনা, সেইরূপ আমরা বায়ু অপেক্ষা বহুগুণে সূক্ষ্ম ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকের মধ্যে থাকিলেও সেই সকল লোকের সহিত আমাদের সঙ্ঘর্ষ হয় না এবং আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা সেই সকল লোকের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না। ভুবর্লোকের প্রথমস্তরের পরমাণু আমাদের ভূর্লোকের অতি সূক্ষ্ম

ব্যোমের পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। যোগিগণ এখানে থাকিয়াই সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রভাবে ঐ সকল লোক প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন, এজন্য আমরা পুরাণশাস্ত্রে প্রমাণ পাই যে, যোগিগণ কথায় কথায় যমলোক কি স্বর্গলোকে উপস্থিত হইতেন। বাস্তবিক একলোক হইতে অপরলোকে যাইতে হইলে পথ হাঁটিয়া বা রেল কি জাহাজ ভাঁড়া করিয়া যাইতে হয় না। বিভিন্ন লোকের প্রত্যক্ষত আমাদের বিভিন্ন অনুভূতির উপর নির্ভর করে। স্থূল ভৌতিক দেহ হইতে অনুভূতি গুটাইয়া লিঙ্গদেহের যে স্তরে যিনি ফেলিতে পারিবেন, তিনি লিঙ্গ-দেহের সেই স্তরের উপযোগী লোকে উপস্থিত হইতে পারিবেন। অবশ্য পুরাণ শাস্ত্রে অনেকস্থলে রাস্তা হাঁটিয়া এক লোক হইতে অপরলোকে যাওয়ার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাহা রূপক-কল্পনা মাত্র। বিশেষ অবস্থাধীন বিশেষ কারণে এক-লোকবাসীর সত্তা অপর-লোকবাসী উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। ভারতযুদ্ধের অবসানে ভগবান্ বেদ-ব্যাস যোগবলে শোক-বিধুরা কামিনী-গণকে ভুবর্লোকে লইয়া তাঁহাদের আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছিলেন।

সূক্ষ্মদেহ।

আমাদের জীবদেহ তিনপ্রকার যথা—স্থূল, লিঙ্গ ও কারণশরীর।

স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতং।

পঞ্চদশী ৭। ২২

হস্তপদাদিসমন্বিত অন্নপানাদি দ্বারা সংগঠিত পরিদৃশ্যমান শরীরই আমা-দের স্থূল-দেহ। জীবাত্মা মৃত্যুসময় এই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেও লিঙ্গদেহ ও কারণশরীর পরিত্যাগ করিতে পারেনা। জীবাত্মা এই দুই দেহ লইয়াই ভুবর্লোকে গমন করে। লিঙ্গদেহ আমাদের স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্ম; আমাদের স্থূলদৃষ্টির গোচরীভূত নহে, কিন্তু উহা কারণ-দেহ অপেক্ষা স্থূল। এই লিঙ্গশরীর অবস্থাভেদে আতিবাহিক, প্রেতদেহ, ভোগদেহ, কামদেহ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। আজকাল পাশ্চাত্যদর্শনে এই দেহ-ত্রিতয়ের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

Man lives in three environments, the physical, the ethereal and the matethereal that which is called the heaven world. (myer's Human Personality)

বুদ্ধি-কর্ম্মেন্দ্রিয়-প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥
পঞ্চদশী ১। ২৩

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বে সূক্ষ্মশরীর গঠিত; ইহাই লিঙ্গশরীর নামে কথিত হয়। বেদান্ত-সারকারও লিঙ্গশরীরকে এই সপ্তদশ-অবয়ব-বিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা :—

সূক্ষ্মশরীরাণি সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরীরাণি। অবয়বাস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী, কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং, বায়ুপঞ্চকঞ্চেতি।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ-অবয়ব-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম-শরীরই লিঙ্গশরীর।

সাংখ্যকারিকা লিঙ্গদেহের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যথা :—

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্ম-পর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং॥

(সাংখ্যকারিকা ৪০)

কল্পারম্ভে সৃষ্টিকালে এক একটী পুরুষের নিমিত্ত এক একটী সূক্ষ্ম-শরীর উৎপাদিত হয়। সূক্ষ্ম-শরীর অব্যাহত, কুত্রাপি তাহার রোধ হয় না; এমন কি, তাহা শিলা-মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে। তাহা নিয়ত বা সুচিরকাল-স্থায়ী—অর্থাৎ সৃষ্টির আদি হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে। মহৎ হইতে সূক্ষ্মতন্মাত্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ মহৎ (বুদ্ধি) অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ-তন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত) ইহাদের সমষ্টিকে "সূক্ষ্ম-শরীর" বলে। স্থূল-শরীরের সংযোগ ব্যতিরেকে সূক্ষ্মশরীর ভোগ জন্মাইতে পারেনা, এইজন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম-সহকারে একটী স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর একটী স্থূলদেহ গ্রহণ করে। মহাপ্রলয়ে লিঙ্গশরীরের লয় অর্থাৎ তিরোভাব হয় বলিয়া ইহার নাম "লিঙ্গ-শরীর।" ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, লিঙ্গদেহও একটী সূক্ষ্ম ভৌতিকশরীর। সুখ-দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই লিঙ্গ-শরীরে থাকে। যখন মহাপ্রলয়ে এই লিঙ্গশরীরের তিরোধান হয়, তখন কেবল কারণ-শরীর বিদ্যমান থাকে। পুনরায় সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবের কর্ম্মানুযায়ী নূতন লিঙ্গশরীরের আবির্ভাব হয়। লিঙ্গশরীরের গতি কিছুতেই আটকায় না, এমন কি উহা শিলান্তর ভেদ করিয়াও যাইতে পারে। উহাকে অস্ত্রাঘাতে ছেদন, কি অগ্নিতে ভস্ম করা যায় না। স্থূলদেহের মর্দ্দনে ইহা আহত হয় না।

নোপমর্দ্দেনাতঃ। (সাঃ সূ)

লিঙ্গশরীর স্থূলশরীরের আশ্রয়গ্রহণ না করিলে ভোগ জন্মাইতে

পারে না, এইজন্য লিঙ্গশরীরকে স্থূলশরীর গ্রহণ করিতে হয়। লিঙ্গশরীর স্থূলদর্শীর অদৃশ্য এবং সূক্ষ্মদর্শী মহাপুরুষগণের দৃশ্য।

চ্যবন্তং জায়মানং বা প্রবিশন্তঞ্চ যোনিষু।
প্রপশ্যন্তি চ তং সিদ্ধা দেবা বিব্যেন চক্ষুষা ॥

অগ্নি-পুঃ ৩৭২

দেহ হইতে প্রচ্যুত, অথবা যোনি-প্রবেশনশীল, বা জায়মান জীবাত্মাকে সিদ্ধগণ দিব্যচক্ষে দেখিয়া থাকেন। নট যেমন নানা সাজ গ্রহণ করে, তদ্রূপ সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির প্রেরণায় দেব-মনুষ্যাদি শরীর ধারণ করে। এই সূক্ষ্মশরীরই স্বর্গ-নরকগামী "ব্যবহারিক জীব"। লিঙ্গদেহ প্রতিমানবদেহে বিদ্যমান আছে। নিজের মধ্যে একটু মগ্ন হইতে পারিলেই লিঙ্গশরীরের সত্তা অনুভূত হয়। মনকে বাহিরের বিষয়-রাজ্য হইতে গুটাইয়া আন্তর-রাজ্যে সংস্থাপিত করিলে, যখন কোন চিন্তা, ভাবনা, ধ্যানাদি থাকিবে না, তখন লিঙ্গশরীর উপলব্ধ হইবে। লিঙ্গশরীর না থাকিলে নিদ্রাবস্থায় আমাদের মৃত্যুসংঘটন হইত। নিদ্রাবস্থায় স্থূলশরীর হইতে পৃথগ্‌রূপে যাহা অবস্থিতি করে, তাহাই আমাদের লিঙ্গশরীর। সূক্ষ্মদেহী আত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেই মৃত্যু হয়, কিন্তু যোগিগণ নিজের স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া অপরের পরিত্যক্ত স্থূলদেহে লিঙ্গদেহসহ প্রবেশ করিতে পারেন,—ইহার নাম পর-পুর-প্রবেশ। আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য আনন্দগিরির লিখিত আচার্য্যের জীবনচরিতে এরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার স্থূলদেহের রক্ষার ভার শিষ্যগণের উপর ন্যস্ত করিয়া লিঙ্গদেহসহ এক রাজার মৃতদেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

আর্য্য ঋষিগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, আমাদের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহ পাঁচটী বিভিন্ন কোষের দ্বারা গঠিত।

দেহত্রয়ে পঞ্চকোষা অন্তস্থাঃ সন্তি সর্ব্বদা।
পঞ্চকোষ-পরিত্যাগে ব্রহ্ম পুচ্ছং হি লভ্যতে ॥

দেবী ভাঃ ৭। ৩০

এই দেহত্রয়ের মধ্যে পঞ্চকোষ সর্ব্বদাই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই পঞ্চ-কোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলে ব্রহ্মপদ-লাভ হয়।

এই পঞ্চকোষের ধ্বংস হইলে তবে জীবের ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। এই পঞ্চকোষের নাম—অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞান-ময়কোষ, ও আনন্দময়কোষ। আহার দ্বারা যে কোষ পুষ্ট হইয়া থাকে

তাহার নাম অন্নময়কোষ। রক্ত-মাংসাদি দ্বারা গঠিত আমাদের স্থূলদেহই অন্নময়কোষ। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা লিঙ্গশরীর সংগঠিত। প্রাণময়কোষ আমাদের লিঙ্গদেহের অতিস্থূলদেহমাত্র। ইহা ভূর্লোকের সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত হইলেও পরবর্ত্তী ভুবর্লোকের উপাদানের তুলনায় এত স্থূল যে, ইহা লইয়া ঐ লোকে যাওয়া অসম্ভব, সুতরাং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিঙ্গশরীর হইতে উহার বহিস্তর এই প্রাণময়-কোষ বিচ্যুত হয়। অনেকসময় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনেরা মৃত্যুর অল্পপরেই এই দেহটীকে শবের নিকট দেখিতে পান এবং কবর-ভূমিতেও ইহার আবির্ভাব দেখা যায়। আমাদের অন্নময়কোষ ও প্রাণময়কোষের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় মৃত্যুর পরেও প্রাণময়-কোষ অন্নময়কোষের নিকটই অবস্থান করে। শবদেহ দাহ করিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণময়কোষও নষ্ট হয়, কিন্তু স্থূলদেহ মৃত্তিকা-প্রোথিত করিলে, স্থূলদেহের ন্যায় প্রাণময়কোষও অল্পে অল্পে নষ্ট হইতে থাকে। অন্নময় কোষের যে অংশ নষ্ট হয়, প্রাণময়কোষেরও সেই অংশ নষ্ট হয়। এই প্রাণময়-দেহটী স্থূলদেহের অনুরূপ; থিওসফির ভাষায় ইহার নাম Etheric double; ইহার দ্বারা আমাদের লিঙ্গদেহের সূক্ষ্মাংশ স্থূলদেহের সহিত সংযুক্ত থাকে। প্রাণময়কোষ না থাকিলে লিঙ্গদেহের সহিত আমাদের স্থূলদেহের কোন সম্বন্ধ থাকিত না, সুতরাং স্থূলদেহ জীবিত থাকিত না। আমাদের স্থূলদেহের 'উষ্মা'ও এই লিঙ্গশরীরের উষ্মা।

"অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা।" সূক্ষ্মদেহ হইতে প্রাণ-শক্তি এই প্রাণময়-কোষ-নামক স্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া স্থূলদেহকে সজীব রাখে এবং চেষ্টাবিশিষ্ট করে, এজন্য ইহার নাম প্রাণময়-কোষ। মৃত্যুসময় লিঙ্গ-শরীর ইহার প্রথম আবরণ প্রাণময়-কোষকে যদিও টানিয়া স্থূলশরীর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়, তথাপি অল্প সময় মধ্যে এই কোষ পরিত্যাগ করিয়া, ভুবর্লোকের উপযোগী আতিবাহিক-দেহ ধারণ করে। শাস্ত্রে এই দেহকে প্রেতদেহ বলিয়াছেন। ইহা লিঙ্গদেহের মনোময়-কোষের অন্তর্গত। আর্য্যশাস্ত্র অবস্থা-ভেদে মনোময়-কোষের স্তর-বিভাগ করিয়াছেন। লিঙ্গদেহ এই মনোময়কোষ অবলম্বনে ভুবর্লোক ও স্বর্লোকে গমন করে। মনোময়-কোষের সূক্ষ্মতর সত্ত্বপ্রধান অংশই স্বর্গলোকে বিচরণ করিবার যান এবং রাজসিক ও তামসিক কামনাময় স্থূলতর অংশ ভুবর্লোকের দেহের উপাদান। মনের সূক্ষ্মতম উপাদানে গঠিত লিঙ্গদেহকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে; লিঙ্গদেহ

এই সূক্ষ্মশরীর অবলম্বনে মহর্লোকে গমন করে। কারণশরীর আনন্দময়-কোষের দ্বারা গঠিত। জীব এই কারণশরীর অবলম্বনে জন, তপঃ ও সত্যলোকে যাইতে সক্ষম হয়। কারণশরীরেরও স্তর-বিভাগ আছে। যিনি যেরূপ সূক্ষ্ম কারণশরীর ধারণ করিতে পারেন, তিনি তদনুরূপ সূক্ষ্মলোকে গমন করেন। জনলোক অপেক্ষা তপোলোক সূক্ষ্ম এবং তপোলোক অপেক্ষা সত্যলোক সূক্ষ্ম। যে জীব স্থূলকামনা যত পরিহার করিতে পারিবে, পরলোকে সে ততই সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়া সূক্ষ্মলোকে গমন করিতে পারিবে।

রায় শ্রীকালীচরণ সেন বাহাদুর বি এল্।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯

সান্বয়ব্যাখ্যা। ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ। হে রাজন্ মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমং ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস।৯

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন—মহারাজ! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুনকে অপূর্ব্ব ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করাইলেন।৯

আলোচনা। সঞ্জয় ব্যাস-প্রসাদে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া কুরুক্ষেত্রের যাবতীয় ঘটনা দর্শন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছিলেন। যুদ্ধস্থলে ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি দর্শন করান, ব্যাস-কৃপায় সঞ্জয়ও তাহা দর্শন করেন। সেই-কথা তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন যে, "হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে এই প্রকারে তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন।" ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দয়া জানাইলেন এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কুরুকুলের যে পরাজয়ই সম্ভাবিত পরিণাম, তাহাও সঞ্জয় ইঙ্গিতে জানাইলেন।৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।১০

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১

সান্বয়ব্যাখ্যা। কথংভূতং তদিতি। অনেক-বক্ত্র-নয়নং (অনেকানি বক্ত্রানি নয়নানি চ যস্মিংস্তং) অনেকাদ্ভুতদর্শনং (অনেকানামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তং) অনেকদিব্যাভরণং (অনেকানি দিব্যানি আভরণানি যস্মিংস্তং) দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং (দিব্যানি অনেকানি উদ্যতানি আয়ুধানি যস্মিংস্তং) দিব্যমাল্যাম্বরধরং (দিব্যানি মাল্যানি অম্বরাণি বস্ত্রাণি চ ধ্রিয়ন্তে যেন তং দিব্যমাল্যাম্বরধরং) দিব্যগন্ধানুলেপনং (দিব্যঃ গন্ধ অনুলেপনং যস্য তং দিব্যগন্ধানুলেপনং) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং (সর্ব্বাশ্চর্য্যপ্রায়ং) দেবং (দ্যোতনাত্মকং) অনন্তং (ন অস্য অন্তঃ অস্তি ইতি অনন্তঃ তং) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বতোমুখং, সর্ব্বতঃ মুখানি যস্মিংস্তং) দর্শয়ামাস ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ১০।১১

বঙ্গানুবাদ। অসংখ্যমুখ, অসংখ্যনেত্রবিশিষ্ট, অসংখ্য অদ্ভুতদর্শনীয় বস্তুবিশিষ্ট, অসংখ্য দিব্য আভরণযুক্ত এবং অনেক উদ্যতদিব্যাস্ত্রবিশিষ্ট, দিব্যমাল্য দিব্য-গন্ধে অনুলিপ্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময় প্রকাশমান অনন্ত এবং সর্ব্বদিকে মুখবিশিষ্ট (বিশ্বরূপ দেখাইলেন।) ১০।১১

আলোচনা। সেই রূপ কীদৃশ, সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে তাহা কহিতেছেন। এই বর্ণনা দ্বারা, সৃষ্টির সমষ্টিভাব এই বিরাট্‌রূপে বিদ্যমান, ইহাই বুঝা যায়।১০।১১

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। বিশ্বরূপীয়-দীপ্তের্নিরূপমত্বমাহ। দিবি (আকাশে) সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ (প্রভা) যদি যুগপত্ (একদৈব) উত্থিতা ভবেৎ, সা (প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ (বিশ্বরূপস্য) ভাসঃ (কথঞ্চিৎ) সদৃশী স্যাৎ।১২

তদা (যস্মিন্ ক্ষণে দিব্যং চক্ষুর্ভগবতা দত্তং তস্মিন্নেব ক্ষণে) পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) অনেকধা প্রবিভক্তং (নানা বিভাগেন অবস্থিতং) কৃৎস্নং (সমগ্রং) জগত্ তত্র দেবদেবস্য শরীরে (বিশ্বাত্মক-দেহে—তদবয়বত্বেন) একস্থং (একত্র অবস্থিতং) অপশ্যত্। ১৩

বঙ্গানুবাদ। যদি আকাশে এককালে সহস্র সূর্য্যের প্রভা উত্থিত হয়, তবে তাহা সেই বিশ্বরূপের প্রভার কথঞ্চিত্ তুল্য হইতে পারে। ১২

তত্কালে পাণ্ডুনন্দন সেই দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাত্মক দেহে নানাভাগে বিভক্ত সমগ্র জগন্মণ্ডল তদীয় অবয়ব-স্বরূপে একত্র অবস্থিত অবলোকন করিলেন। ১৩

আলোচনা। দশ হইতে ত্রয়োদশ শ্লোকে বিরাট্ বিশ্বরূপের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা কেবল এই বাহ্যজগত্ লইয়া নয়। ভগবান্ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—"আমার দেহের একাংশমাত্রে জগৎ ধারণ করিয়া আছি।" তাই অর্জ্জুন দেখিলেন—বিশ্বরূপের একাংশমাত্রে দেবলোক পিতৃলোক মনুষ্য-লোকাদি অনেকপ্রকার বিভিন্ন জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে। নানাভাগে বিভক্ত সমগ্র জগন্মণ্ডল ইহার অন্তর্গত। ইহার ধারণা করা প্রাকৃত চক্ষুর বা সাধরণ মানব-মনের সাধ্য নয়, তাই দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন। ১২। ১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

সান্বয়ব্যাখ্যা। ততঃ স ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়ান্বিতঃ) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিততনুঃ) (সন্) দেবং (স্বয়ংপ্রকাশং বিশ্বরূপধরং) শিরসা প্রণম্য (নত্বা) কৃতাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলিঃ) অভাষত (বক্ষ্যমাণং বাক্যং কথয়ামাস) ১৪

বঙ্গানুবাদ। অনন্তর অর্জ্জুন সেই অদ্ভুত আকৃতি দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত ও রোমাঞ্চিততনু হইয়া ভগবান্‌কে মস্তক দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতে লাগিলেন। ১৪

আলোচনা। সেই আশ্চর্য্য বিরাট্ বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুনের ভয় হয় নাই, তিনি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই, বিস্ময়াবিষ্ট ও হৃষ্টরোমা হইয়া ধীরভাবে প্রণামপূর্ব্বক তত্কালোচিত ব্যবহার করিয়াছেন। ১৪

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তবদেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথাভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্। ১৫

সান্বয়ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ। হে দেব তব দেহে দেবান্ (আদিত্যাদীন্) তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ (ভূত-বিশেষাণাং স্থাবর-জঙ্গমানাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং নানাসংস্থানাং ভূতানাং সঙ্ঘান্ সমূহান্) দিব্যান্ ঋষীন্

(নারদ-সনকাদীন্) সর্ব্বান্ উরগাংশ্চ (অনন্তবাসুক্যাদীন্) (তেষাং দেবাদীনাম্) ঈশং (স্বামিনং) কমলাসনস্থং (পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতম্, অথবা ভগবন্নাভিপদ্মাসনস্থম্) ব্রহ্মাণং চ পশ্যামি। ১৫

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন—হে দেব! আপনার দেহে সমুদায় দেবগণ, পৃথক পৃথক প্রাণিসমূহ, নারদ-সনকাদি দিব্য ঋষিগণ, সর্পগণ এবং আপনার নাভিকমলে ব্রহ্মাকে অবলোকন করিতেছি। ১৫

আলোচনা। বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিতেছেন—হে দেব! আপনি যে বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন, তাহাতে আমি ইন্দ্রাদি দেবতা সকল, স্থিতিশীল বৃক্ষাদি, গমনশীল জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ প্রাণিসকল, কমলাসন ব্রহ্মা, সনক সনন্দনাদি ঋষি, বাসুকি প্রভৃতি সর্প সকল দেখিতেছি। যাহা সর্ব্বলোকের অদৃষ্টপূর্ব্ব, তাহা আপনার কৃপাদত্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছি। ১৫

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং,
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপং অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং (অনেকে বাহব উদরাণি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্য তাদৃশং) অনন্তরূপং (অনন্তানি রূপাণি যস্য তং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) পশ্যামি পুনঃ তব অন্তং ন পশ্যামি মধ্যং ন পশ্যামি, আদিং ন পশ্যামি। ১৬

বঙ্গানুবাদ। হে বিশ্বেশ্বর! অসংখ্য উদরবাহু-মুখ-নেত্র-বিশিষ্ট অনন্তরূপ বিশ্বরূপ আপনাকে আমি সকলদিকেই দর্শন করিতেছি। আপনার আদি মধ্য অন্ত কিছুই দেখিতেছি না। ১৬

আলোচনা। অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপে অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক বদন, অনেক চক্ষু দেখিতেছেন। বিশ্বরূপ অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং ইহার আদি অন্তও দেখিতেছেন না। আদি অন্ত না পাইলে 'মধ্য'-নির্ণয় হয়না। বিশ্বমূর্ত্তির চক্ষু কর্ণ মুখের নির্ণয় কে করিতে পারে? ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ,
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ং॥ ১৭

সান্বয়ব্যাখ্যা। কিরীটিনং (মুকুটবন্তং) গদিনং (গদাহস্তং) চক্রিণং (চক্রবন্তং চ) সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং তেজোরাশিং (সর্ব্বতো দীপ্তির্যস্য অস্তি তাদৃশং তেজঃপুঞ্জং) দীপ্তানলার্কদ্যুতি (প্রদীপ্তবহ্নিসূর্য্যসমপ্রভং) (এবম্ভূতং) দুর্নিরীক্ষ্যং অপ্রমেয়ং (অপরিমেয়ং) ত্বাং সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) পশ্যামি। ১৭

বঙ্গানুবাদ। কিরীটযুক্ত, গদাধারী, চক্রহস্ত, সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী তেজঃপুঞ্জ প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, দুর্নিরীক্ষ্য এবং অপ্রমেয় আপনাকে আমি সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছি। ১৭

আলোচনা। বিশ্বরূপে সকলই আছে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে ব্রহ্মলোকে বৈকুণ্ঠে যেখানে যাহা আছে, বিশ্বরূপে সে সকলই আছে। তাই অর্জ্জুন, কিরীট-গদা-চক্রধারী দীপ্ত-অনলার্ক দ্যুতি তেজঃপুঞ্জ দুর্নিরীক্ষ্য অপ্রমেয়-মূর্ত্তি সর্ব্বদিকে দর্শন করিতেছেন। ১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। (যস্মাত্ এবং তব অতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাত্) ত্বমক্ষরং (ন ক্ষরতি ইতি অক্ষরং নিত্যকূটস্থং) পরমং (পরংব্রহ্ম) বেদিতব্যং (মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যং) ত্বং অস্য বিশ্বস্য (সমস্তস্য) পরং নিধানং (পরমমাশ্রয়ং) ত্বমব্যয়ঃ (নিত্যঃ) শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (নিত্যধর্ম্ম-পালকঃ) ত্বং সনাতনঃ (চিরন্তনঃ) পুরুষঃ (দেহে পুরি শয়ানঃ পুরুষঃ আত্মাপি ত্বমেব) মে (মম) মতঃ (অভিপ্রেতঃ)। ১৮

বঙ্গানুবাদ। তুমি অক্ষরস্বরূপ পরম ব্রহ্ম, তুমি মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য; এই বিশ্বের চরমআশ্রয় তুমি, তুমিই অব্যয় সনাতনপুরুষ ও নিত্য-ধর্ম্মের পালক বলিয়া আমার অভিমত। ১৮

আলোচনা। ভগবৎকৃপায় অর্জ্জুন দিব্যদৃষ্টি পাইয়াছেন এবং জ্ঞানও পাইয়াছেন, তাই বিশ্বরূপের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, "তুমিই অক্ষর নিত্য কূটস্থ পরং ব্রহ্ম; তুমিই মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য, তুমিই ধর্ম্মের রক্ষক, তুমিই দেহস্থ আত্মা, ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।" ১৮

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশগুপ্ত।

কতিপয় প্রশ্ন।

গত আষাঢ়ের হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত "বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমাচার" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া কিছুই যেন বুঝিতে পারিলাম না, প্রত্যুত সন্দেহে পড়িলাম। লেখক-মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সন্দেহ-ভঞ্জন করিলে বিশেষ উপকৃত হইব। নিম্নলিখিত কএকটী প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিলে, আমাদের ন্যায় সন্দেহাকুল লোকের বিশেষ উপকার করা হইবে। প্রশ্ন কএকটী এই :—

১ম প্রশ্ন—বৈষ্ণবধর্ম্ম কত প্রকার? আমরা জানি যে, যিনি বিষ্ণুর উপাসক তিনিই বৈষ্ণব বা তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলে।

২য় প্রশ্ন—"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত যে বৈষ্ণবধর্ম্মে''র কথা লেখক-মহাশয় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ এই যে, মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম শাস্ত্রবর্ণিত বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র কিনা? স্বতন্ত্র হইলে উহা কি প্রকার? মহাপ্রভুর উপাসকের এবং বিষ্ণুর উপাসকের ধর্ম্মগত ও আচারগত প্রভেদ কি?

৩য় প্রশ্ন—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর ভাব কি ছিল? তিনি ব্রজের ভাবের ভাবুক ছিলেন কিনা? ব্রজে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পাঁচটি ভাব আছে তাহাই জানি। ব্রজের ভাবের মধ্যে "ঐশ্বর্য্যের ভাব" আনিলে, ব্রজের ভাব অন্তর্হিত হয় কিনা?

৪র্থ প্রশ্ন—ব্রজের দাস্যভাবের অর্থ সেবা করা—আমাদের এই ধারণা। আমি আমার সংসার অর্থাৎ পুত্র, কন্যা, প্রভৃতির দাস, তাহাদিগের সেবা করি খাওয়াই—পরাই ইত্যাদি। "তুমি প্রভু, আমি দাস"—ব্রজের দাস্য এ ভাবের নহে অর্থাৎ হনুমান্ ও গরুড়ের দাস্য-ভাব নহে। প্রভু-ভৃত্যের ভাব থাকিলে "ব্রজের ভাব" স্থান পায়না। ব্রজের প্রাণ-সখা, প্রাণ-বল্লভ, ভাই কাণাই ইত্যাদি আহ্বান—কেবল তাহাই নহে, ব্রজের রাখালেরা কাণাইকে কান্ধে লইয়াছেন, কান্ধে উঠিয়াছেন এবং উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে লঘুগুরু-ভাব ছিলনা। ভালবাসার জন্য ইঁহারা "তুই, রে" প্রভৃতি মুখে আনিয়াছেন। শুনিতে পাই, যশোদা নাকি কাণাইকে পায়ের ধুলা দিয়াছেন এবং কাণাই নাকি নন্দের বাধা বহন করিয়াছেন এবং রাধিকার পায়ে পড়িয়াছেন ইত্যাদি। এই প্রকারের ব্যবহারে কি প্রভু-ভৃত্যের ভাব তিষ্ঠিতে পারে?

৫ম প্রশ্ন—গৌরাঙ্গমহাপ্রভু প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে ব্রজের ভাবের বিরোধী বলিয়া মনে করিতে পারি কিনা ?

৬ষ্ঠ প্রশ্ন—চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া দেখিতে পাই, তিনি (গৌরাঙ্গমহাপ্রভু) হরি, কৃষ্ণ এবং রাম এই নাম (তারকব্রহ্মনাম) করার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আজ কাল আমরা "গৌরনিতাই, প্রাণগৌর নিত্যানন্দ" ইত্যাদি বলিয়া থাকি। তাঁহার উপদেশের অন্যথায় তাঁহার নিজের নাম করায় তাঁহাকে অগ্রাহ্য করা হইতেছেনাকি ? এরূপ করায় গুরু-বাক্য-লঙ্ঘনের আশঙ্কা হয়নাকি ?

৭ম প্রশ্ন—ব্রজের ভাব এবং নবদ্বীপের ভাবের পার্থক্য কি ?

বিজ্ঞবর লেখক, বিষধর-সর্পদষ্ট মহাত্মা পওহারি বাবার দৃষ্টান্তটিতে বলিয়াছেন যে, পওহারি বাবা উক্ত বিষধর সর্পটীকে "প্রিয়তমের দূত" বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। লোকে গভীর ভালবাসার জন্য প্রিয়-সখা, প্রিয়-সখী ইত্যাদি বলিয়া আহ্বান করে, কিন্তু 'প্রিয়প্রভু' বলিয়া কেহ আহ্বান করেনা। পওহারি বাবা, ভগবানকে প্রাণ হইতে অধিক ভাল বাসিতেন বলিয়াই বিষধর-সর্পকে "প্রিয়তমের দূত" বলিয়াছেন, "প্রভুর দূত" বলিয়া ভাবেন নাই। প্রভুভৃত্যের ভাবের মধ্যে ভয়ের ব্যাপার থাকে।

শ্রীনীলাম্বর ছুই।

ধুতি ও শাড়ী সম্বন্ধে আমরা কি প্রকারে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর হইতে পারি।

(যশোহর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রণীত।)

১। সমগ্র বঙ্গদেশে নগরের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাহাতে অতি অল্প লোক বাস করে। এই সকল নগরের কথা ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গালী সাধারণতঃ নিজের বাস্তুতে বসবাস করে ও প্রত্যেকেরই শাক-সব্জী তৈয়ারের নিমিত্ত কিম্বা বাগানের নিমিত্ত বাস্তুসংলগ্ন কিছু না কিছু জমি আছে। ঐ সকল বাস্তু ও তৎসংলগ্ন জমিতে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থান ব্যতীত অত্যন্ত বন্যার বৎসরেও সাধারণতঃ বন্যার জল উঠে না।

২। তুলা নিম্নভূমিতে জন্মান যায় না, কিন্তু সকল রকম উচ্চভূমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। একপ্রকার তুলা আছে, যাহার চাষ প্রতিবৎসর

করিতে হয়। আর একপ্রকারের তুলা আছে, যাহা একবার রোপণ করিলে ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। প্রথমোক্ত প্রকারের তুলার চাষ করিতে হইলে গভীর করিয়া লাঙ্গল দিতে হয়, সার দিতে হয় এবং শেষোক্ত প্রকারের তুলা অপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে হয়। এইজন্য আমি বাৎসরিক তুলার চাষ করিবার পরামর্শ দেই না। দীর্ঘস্থায়ী তুলার গাছের আবাদ করিতেই পরামর্শ দেই।

৩। বাঙ্গলার কাপাস যথা—দেবকাপাস, রামকাপাস ও রাজকাপাস বাঙ্গলার জমিতে ভাল জন্মে; ধারাওয়ালের কাপাসও লাগান যায়। তুলার বীজ বঙ্গীয়-গভর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগ হইতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ঠিকানা :—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সীড্ ষ্টোর, ২৭নং আপারসার্কুলাররোড কলিকাতা অথবা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গভর্ণমেণ্টকৃষিক্ষেত্র, রামণা, ঢাকা। গভর্ণমেন্ট-কৃষিবিভাগ হইতে বীজ পাওয়া না গেলে, স্থানীয় বাজার কিম্বা লোকের নিকট হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে।

৪। তুলার বীজের মূল্য মণ প্রতি প্রায় ১০৲ টাকা। এক বিঘা জমিতে ১২১টী গাছের জন্য তিন ছটাক বীজ লাগে।

৫। উচ্চভূমিতে ১০ ফুট কিম্বা ১২ ফুট অন্তর বীজ পুতিবে। বাড়ীর সীমানাতে, কিম্বা বাগানে, বা উঠানে পুতিতে পারা যায়; কিন্তু ছায়ায় কোন গাছ জন্মাইবে না।

৬। পুতিবার পূর্ব্বে যে স্থানে বীজ পুতিবে সেই স্থানে গোবর-পচা সার লাগাইবে। একস্থানে ৩। ৪টা করিয়া বীজ পুতিবে, কারণ সকল বীজই অঙ্কুরিত হয় না। গাছের গোঁড়া বৎসরে একবার খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক এবং একবার সার দেওয়ারও আবশ্যক।

৭। গাছগুলি ৮। ১০ ফুট লম্বা হয় এবং ৮। ১০ বৎসর থাকে।

৮। এক বৎসর হইলে গাছগুলিতে ফল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং সারা বৎসরই ফল ধরে। যখনই ফলগুলি ফাটিবে, তখনই তাহাদের তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা মাটিতে পড়িয়া কিম্বা বৃষ্টি ও হিমে ভিজিয়া তুলা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

৯। প্রতি বৎসর গাছে এক সের হইতে দুই সের পর্য্যন্ত বীচিসমেত তুলা উৎপন্ন হয়। এই তুলাতে বীচি ও আঁশের পরিমাণ ২.১ অনুপাতে না থাকিলেও অন্ততঃ ৩.১ অনুপাতে থাকে। যদি ধরা যায় যে প্রতি

গাছে বীজ সমেত একসের করিয়া তুলা উৎপন্ন হয় এবং বীচি ও আঁশের পরিমাণ যথাক্রমে তিনভাগ ও একভাগ হয়, তাহা হইলে এইরূপ সর্ব্বনিম্ন-হার হিসাব করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, একটা গাছ হইতে অন্ততঃ একপোয়া তুলার আঁশ পাওয়া যায়। উপরোক্ত হিসাব অতিক্রম এবং উহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারা যায়। ভাল গাছ হইলে প্রতি গাছে আধসের পর্য্যন্ত তুলার আঁশ পাওয়া যাইতে পারে।

১০। মোটামুটি দেখা যায় যে, একজন বাঙ্গালী পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোকের বৎসরে ১০ হাত করিয়া ৬ খানির অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয় না। বরং বালকদের তদপেক্ষা ছোট কাপড় লাগে। যদি সকলকেই পরিণতবয়স্ক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে যে পরিবারে দশটী লোক আছে, এমন পরিবারে বৎসরে ৪০ হইতে ৪৪ ইঞ্চি বহরের ৬০ খানি ১০ হাত কাপড়ের আবশ্যক হয়।

১১। ৪০ নম্বরের ঐরূপ একখানা ধুতির জন্য $\frac{১}{২}$ আধসের সূতার প্রয়োজন। চল্লিশের অপেক্ষা অধিক নম্বরের ধুতির জন্য আধসেরের চেয়ে কম সূতা লাগে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, আশী নম্বরের ১ খানা ধুতির জন্য একপোয়া সূতা লাগে।

১২। ৮০৪০ গজে এক ফেটি হয়। যদি ১০ ফেটি সূতা ওজনে আধসের (১ পাউণ্ড) হয়, তাহা হইলে ঐ সূতাকে ১০ নম্বরের সূতা বলে। যদি ৪০ ফেটি সূতা ওজনে আধসের (১ পাউণ্ড) হয়, তাহাদের নম্বর আশী হইবে।

১৩। আমি ৫০ নম্বরকে সূতাভিত্তি ধরিয়া হিসাব দেখাইব। ৪০ নম্বরের সূতার ধুতি তত মোটা নহে। উহা ভদ্রলোকেরা অনায়াসে পরিতে পারেন। আজকাল ইহা অপেক্ষাও কম নম্বরের সূতার ধুতি ভদ্রলোকেরা পরিতেছেন। সূতার নম্বর যত কম হইবে, ধুতি তত অধিক টিকবে।

১৪। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যে পরিবারে ১০ জন লোক আছে, এমন পরিবারের বাৎসরিক ৬০ ষাটখানি ৪৪ ইঞ্চি বহরের ১০ হাত ধুতির প্রয়োজন; এবং উক্ত পরিমাণ কাপড়ের নিমিত্ত ৩০ ত্রিশ সের তুলার আঁশ আবশ্যক হয়। ১২০টা গাছ বৎসরে অন্ততঃ ৩০ ত্রিশ সের তুলার আঁশ দেয় এবং ইহার দ্বিগুণ পরিমাণও দিতে পারে।

১৫। যদি কেহ একবিঘা জমিতে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শেষে তুলার আবাদ করেন, তাহা হইলে তিনি এখন হইতে দেড় বৎসরের

মধ্যে নিজ পরিবারের কাপড়ের জন্য যতখানি তুলা আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক না হউক্ অন্ততঃ ততখানি তুলা পাইতে পারেন।

১৬। ত্রিশসের তুলার দাম প্রায় ৩০৲ টাকা; এই ত্রিশ টাকা অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। তুলা উত্তমরূপে পিঁজিয়া লইয়া চরকার দ্বারা সূতা প্রস্তুত করিতে হয়।

১৭। ভাল চরকা শ্রীরামপুর-গভর্ণমেণ্ট-বয়ন-বিদ্যালয় হইতে প্রত্যেকটী ৪৲ চারি টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। এই নমুনানুযায়ী চরকা স্থানীয় ছুতারের দ্বারা তৈয়ার করাইলে ২৲ টাকা কিম্বা ২৷৷০ কিম্বা কম ব্যয় পড়ে।

১৮। গাছ-কাপাসের তুলার আঁশ বীচি হইতে সহজে পৃথক্ হয় এবং স্ত্রীলোকেরা কাকুই কিম্বা কোন পিঁজিবার যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া হাত দিয়াই পিঁজিতে পারেন।

১৯। তুলা পিঁজিয়া চরকা দ্বারা সূতা কাটা যায়। অর্দ্ধসের তুলায় ১ থান ও একসের তুলায় এক জোড়া চল্লিশের ধুতি তৈয়ার হয়। দৈনিক ৪।৫ ঘণ্টা খাঁটিলে একজন স্ত্রীলোক একদিনে ১ ছটাক অথবা মাসে প্রায় ২ সের সূতা প্রস্তুত করিতে পারে। এইরূপে একজন স্ত্রীলোক মাসে দুই জোড়া অর্থাৎ বার্ষিক ২৪ জোড়া ধুতির পরিমাণ সূতা প্রস্তুত করিতে পারে। দৈনিক ৬।৭ ঘণ্টা খাঁটিলে ৩০ জোড়া ধুতি অর্থাৎ ১০টী লোকের একটী পরিবারের ব্যবহারোপযোগী সূতা কাটিতে পারে। ১৫ দিন চেষ্টা করিলে সূতাকাটা শিক্ষা করা যায়, এবং একমাস চেষ্টা করিলে একজন স্ত্রীলোক ৪০ নম্বর সূতাকাটা শিখিতে পারে। রাত্রে প্রদীপের আলোকে সূতা-কাটা যায়।

২০। ৩০ সের পরিমাণে সূতা কাটা হইলে, তাহা কোন তাঁতি বা জোলাকে দিলে, সে জোড়া প্রতি ৷৵০ হইতে ১৵০ মুজুরি লইয়া কাপড় বুনিতে পারে। এই মুজুরি অধিক ধরা হইল, কারণ সাধারণ কাপড় গজ-প্রতি এক আনা মুজুরিতেও বুনিয়া থাকে। নিজের জমিতে তুলা হইলে, ঘরে স্ত্রীলোকেরা সূতা কাটিলে ৩০৲ টাকায় ৬০ খানা ধুতি পাওয়া যাইতে পারে। উহা বর্ত্তমানে ১৮০৲ দিয়া খরিদ করিতে হয়। যুদ্ধের সময়ের পূর্ব্বেও ইহা ৬০৲ টাকায় খরিদ করিতে হইত, এবং যুদ্ধের পরে দর কমিয়া গেলেও ইহাতে লোকসানের আশঙ্কা নাই; কারণ জমিতে তুলা প্রস্তুত করিলে, ঘরে সূতাকাটা হইলে, মাত্র বুনিবার খরচ ৩০৲ টাকার ৬০ জোড়া ধুতি হইতে

পারে। নিজের জমিতে তুলা প্রস্তুত ও ঘরে সূতাকাটা হইলে, মানচেষ্টার ও বোম্বাই সহরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন বাধা জন্মাইতে পারিবে না। কারণ, দেশে এখনও বহুসংখ্যক তাঁতি বা জোলা আছে, যাঁহারা কাপড় প্রস্তুত করিতে পারে। হিমালয়প্রদেশে, আসামে, মণিপুরে, বর্ম্মায় এখনও ভদ্রলোকেরা নিজেদের ঘরে সূতা কাটিয়া থাকেন। মেদিনীপুরস্থ চন্দ্রকোণায় এখনও ব্রাহ্মণেরাও কাপড় বুনিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে প্রত্যেক পরিবারে সূতা কাটার প্রথা ছিল এবং এখনও ব্রাহ্মণ-স্ত্রীলোকেরা উপবীতের জন্য সূতা কাটিয়া থাকেন। যখন ইংরাজেরা প্রথম এদেশে আসেন, তখন সূতা ও কাপড় বাঙ্গালাদেশের ধনের আকর ছিল এবং ইউরোপীয় বণিকেরা রেশম ও তুলাজাত দ্রব্যের জন্যই এই দেশে আসিতেন। ১৮১৫ সালে ভারতবর্ষ হইতে যে কাপড় রপ্তানি হয়, তাহার অধিকাংশ বাঙ্গালাদেশ হইতে গিয়াছিল এবং তাহার মূল্য বর্ত্তমান-বিনিময়ের হারানুযায়ী ১৯৫ লক্ষ টাকা। তাহার পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষাও অধিকপরিমাণে রপ্তানি হইত। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালাদেশে চরকার কত আদর ছিল, তাহা নিম্নোক্ত পল্লী-গান হইতে জানা যায়।

"চরকা আমার ভাতার পুত,
চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার
দরজায় বাঁধা হাতী॥"

বাস্তবিক চরকাই বাঙ্গালার ধনের আকর ছিল। আসুন, আমরা আবার তুলার চাষ, চরকা ও তাঁত ব্যবহার করি। ইহাতে চিরকালের জন্য কাপড়ের কষ্ট দূর হইবে এবং আমরা দেশ বা বিদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিব।

এ বিষয়ে আমার জ্ঞান কম, যাঁহারা এ বিষয়ে পারদর্শী সুদক্ষ—বিশেষতঃ সরকারী দক্ষ কর্ম্মচারী তাঁহাদের সমালোচনা আহ্বান করি। আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় ইহা মুদ্রিত করিয়া ইহার সমালোচনা করেন, ইহাই আমার অনুরোধ। দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই এবং সমস্ত জমিদারবর্গ তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে তুলার চাষ এবং সূতা প্রস্তুত বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ভাদ্র মাসে এবং এপ্রেল অর্থাৎ বৈশাখ মাসে তুলার চাষের উপযুক্ত সময় এবং এখন হইতে তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে তুলার বীজেও লাভ করা যায়। ৩০ সের আঁশে দুই মণ বীজ পাওয়া যায়। এইরূপে ৩০৲ টাকা মূল্যের ৩০ সের তুলা ব্যতীত ২০৲ টাকার পরিমাণে বীজ পাওয়া যাইবে। যদি বীজ ভাল না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ১০৲ টাকা পরিমাণে গরুর খাবার হইতে পারে।

ঘাইনে মাড়িলে তুলার বীজে তেল হয় এবং দুই মণ তুলার বীজে অন্ততঃ ১৬ সের তেল পাওয়া যায়। ঐ তেল জ্বালান যাইতে পারে ও অবশিষ্ট খইল দ্বারা সার ও গরুর খাবার হয়।

নূতন সংস্করণ—২৫ ভলিউম্ ২২৪ পৃষ্ঠা-"এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" দ্রষ্টব্য। ইহাতে বীজ, সার, গরুর খাদ্য, পরিষ্কৃত তেল এবং সাবান প্রস্তুতের জন্য তৈল-প্রস্তুত-করণ বর্ণিত আছে।

কাপাসের গাছ অদ্য লাগাইলে অদ্যই তুলা বা কাপড় পাওয়া যায় না, কিন্তু অদ্য লাগাইলে দেড় বৎসর পরে তুলা পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধ কতদিন থাকিবে বলা যায় না। যুদ্ধের প্রথমে এই উদ্যোগ করিলে আরও ভাল হইত। এই সময়ে কার্য্য আরম্ভ করিলে, যুদ্ধ বেশী দিন চলুক বা না চলুক, ইহাতে আমাদের যথেষ্ট উপকারই হইবে। যুদ্ধের শেষেও আমাদের পরমুখাপেক্ষী না হওয়াটা কি ভাল নয়? আপাততঃ যাঁহারা সূতা চান্, তাঁহাদের তুলা কিনিয়া উহা করিতে হইবে। আর কাপড়ের খরচ কমাইতে হইলে, মাদ্রাসীদিগের ন্যায় আমাদের কাছা আর কোচা খাট করিতে হইবে। গরিবদিগের ১০। ১১ হাত কাপড় পরিলে চলিবে না। বড়লোকের স্বতন্ত্র কথা। গরিব স্ত্রীলোকদিগেরও ঘাঘরা করা আবশ্যক হইবে। ১০। ১১ হাত লম্বা কাপড় গরিবের পক্ষে অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য।

মানবের চরম লক্ষ্য ও পরিণাম কি, তাহা জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মানব কি, তাহার বিশ্লেষণ করিতে হয়। মানব বলিতে আমরা নিরপেক্ষভাবে দেহ, মন বা জীবাত্মা কাহাকেও বুঝিনা। সাধারণতঃ আমরা এই তিনের সমষ্টিকে 'মানব' সংজ্ঞা দিয়া থাকি। এই মায়িক দেহের মধ্যে মন এবং মনের পশ্চাতে জীবাত্মা। ইহাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক-ভাবে সম্যক্ উন্নতি-সাধনই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। এই আত্মোন্নতি বা

আত্মজ্ঞানলাভ দ্বারাই মানব ব্রহ্মভাবলাভের অধিকারী হয়। ইহা আমার কথা নহে, বেদ নিজেই কহিতেছেন—"ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" অপরাপর শাস্ত্রেও বলিয়াছেন যে, জীব মুক্ত হইলে শান্তিময় বা আনন্দময় হইয়া যান, তাঁহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকেনা—অর্থাৎ সমুদ্রের লহরীমালা বিশাল সমুদ্রে এবং জলের বুদ্‌বুদ্‌সকল জলরাশিতে মিলাইয়া গেলে তাহাদের যেরূপ পৃথক্ সংজ্ঞা থাকেনা, সেইরূপ মানবের জীবাত্মা সেই অনন্ত ভূমা ব্রহ্মসমুদ্রে লীন হইয়া যান। এখন দেখা যাউক্, এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে, মানবের কিরূপ সাধন-পথ অবলম্বন করা আবশ্যক। শাস্ত্রই বা কি বলেন এবং গুরু বা মহাজনেরাই বা কি নির্দ্দেশ করেন? বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ নামে একটি সুন্দর উপন্যাস আছে; তাহা এস্থলে বলিতে ইচ্ছা হইল। একদা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, সংসার হইতে অবসর লইবার সময় তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, "এস তোমায় আমার বিষয়সম্পত্তি ভাগ করিয়া দি।" তাহাতে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—"দেব! এই ধন-রত্ন ভরা পৃথিবী যদ্যপি আমার হয়, ইহার দ্বারা কি আমার অমৃতত্বলাভ হইতে পারে?" মহর্ষি উত্তর করিলেন,—"না মৈত্রেয়ি, ধন-রত্নবান্ ব্যক্তি সকলের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছ, তোমারও জীবন সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই সকল ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যের দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা নাই।" ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন—"তবে পরমার্থতত্ব আপনি যাহা জানেন তাহা আমায় উপদেশ দিন।" তৎপরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীর নিকট পরমতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া পরিশেষে ব্রহ্মসাধনের একটি প্রকৃষ্ট প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন তাহা এই—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। অর্থ—ওরে মৈত্রেয়ি! এই পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। এই মহোপদেশ অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মসাধকেরা "শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন" এই তিনকেই সাধান-প্রণালীরূপে অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াগিয়াছেন, এই তিনটির কোনটির অভাব হইলে চলিবে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—আগমাদি শাস্ত্র ও গুরুবাক্য, এতদুভয়ের দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপ-জ্ঞানলাভের নাম 'শ্রবণ'।

শাস্ত্র বলিতে জগতের পুরাকালের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি। ভগবানের কেমন এক অপারকরুণা আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি মানবের প্রাণকে সত্য

ধর্ম্মের দিকে এমন স্বাভাবিকভাবে অনুরক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, নানাপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব দ্বারা সম্রাট্‌দিগের কীর্ত্তি লোপ পাইয়াছে, বিশেষ উন্নতিশালী জনপদ-সকলও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং মহাবিক্রমশালী রাজবংশ-সকলের নাম জগতের ইতিহাস হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল অমূল্য সত্যধর্ম্ম যাহা জগতের জ্ঞানাগারে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা মানবের শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা রক্ষিত হইয়া যুগ-যুগান্তর ধরিয়া স্থায়ী আছে। কিন্তু, ধর্ম্ম-পিপাসা এরূপ স্বাভাবিক যে, মানুষ হীরার লোভে যেমন তন্মিশ্রিত মৃত্তিকা ও আবর্জ্জনাদি যত্নসহকারে তুলিয়া রাখে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত সত্য ধর্ম্মের সহিত নানা ভ্রম ও কুসংস্কারও যত্নসহকারে হৃদয়ে রক্ষা করে। বহুদিন পূর্ব্বে জগতের মানবজাতি-সকলের হৃদয় ও মন এত সংকীর্ণ ছিল যে, প্রত্যেকেই মনে করিত যে তাহারাই ঈশ্বরের প্রিয় এবং অন্যজাতি ঈশ্বরবর্জ্জিত। এইপ্রকার হিন্দুরা মনে করিতেন যে, ম্লেচ্ছেরা কস্মিন্‌কালেও মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না, (১) মুসলমানেরা অবলীলাক্রমে অন্যধর্ম্মাবলম্বিদিগের "কাফের" বলিয়া হত্যা করিয়া পুণ্য জ্ঞান করিতেন। গ্রীকেরা বর্ব্বরদিগকে "দাস" বলিয়া ঘৃণা করিতেন। ভগবানের কৃপায় এখন সে সংকীর্ণতার দিনের অবসান হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে এখন প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়কে এক মহান্‌ উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাব অধিকার করিয়াছে। সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্‌

(১) অন্যধর্ম্মাবলম্বিগণের জ্ঞান বা বিশ্বাস যেরূপই হউক্ না কেন, হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বিগণ কখনও সঙ্কীর্ণতা সমর্থন করিতেন না। অন্যধর্ম্মাবলম্বীর মুক্তি হয় না—একথা হিন্দুশাস্ত্রে নাই। হিন্দুরা ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যাহাদের পরিচয় দিতেন, সেই সকল সম্প্রদায়কে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন না। ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু সম্যক্‌ শাস্ত্রং ব্যবস্থিতং ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে—ম্লেচ্ছ ও যবনগণ ঋষিতুল্য পূজনীয়, ইহা ত হিন্দুরই কথা। হিন্দুশাস্ত্র "শ্বপচোঽপি বিমুচ্যতে" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অনার্য্য কবষ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিনকার ব্রহ্মহরিদাস পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে সাদরে পূজিত হইয়াছেন। তবে একথা সত্য যে, হিন্দুরা ভগবদ্বিশ্বাসী জ্ঞানী লোক ভিন্ন অন্যের মুক্তি হয় না একথা বলিয়াছেন। শ্বপচ, হূন, পুক্কশ, যবন, ম্লেচ্ছ, খস, কিরাত প্রভৃতিও যদি ভগবৎপরায়ণ হন, তবে মুক্তি পাইবেন অন্যথা নহে। হিন্দুরাও কি ভগবদ্‌-বিশ্বাসসম্পন্ন না হইলেই মুক্তি পাইবেন? বহিরঙ্গ আচারাদির প্রসঙ্গে কদাচিৎ অন্যবিধ আচারের নিন্দা দেখা যায়, কিন্তু তাহা শাস্ত্রোক্ত আচারের প্রশংসার উদ্দেশ্যে লিখিত। ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য ভিতরের, বাহিরের আচারই উহার প্রাণ নহে—একথা হিন্দুশাস্ত্রে বহুধা কীর্ত্তিত হইয়াছে। হিঃ পঃ সঃ।

সকল যুগে, সকল দেশে, সকল উন্নত অবনত জাতির মধ্যে মুক্তিপ্রদ সত্য সকল সাধুমহাজনদের মুখ দ্বারা সদ্‌গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এই সকল শাস্ত্র পাঠ করিলে, আমরা ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকপরিমাণে জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু এই গ্রন্থই শ্রবণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। শাস্ত্র সকল লিপিবদ্ধ জ্ঞান মাত্র। এই লিপিবদ্ধ শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান-ধর্ম্মও জীবনে সাধন করিতে হইবে। এছাড়া ইহাদের পশ্চাতে একদল জীবন্ত সিদ্ধ মানব রহিয়াছেন, যাঁহারা পুরাকাল হইতে তাঁহাদের হৃদ্‌গতভাব আশা ও আকাঙ্ক্ষার কিয়দংশ শাস্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং অপরাংশ শ্রুতিপরম্পরায় শিষ্যদের উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। এই সিদ্ধ পুরুষেরাই সদ্‌-গুরুপদবাচ্য। তাঁহারা অগ্রে ব্রহ্মজ্ঞান নিজের জীবনে সাধন করিয়া, পরে সাধনের উপায় ও প্রণালী সকল অনুগত শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন। অনেক সময়েই এই ঈশ্বররূপ গুরু-মুখ-নিঃসৃত উপদেশাবলী ব্যতীত শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। বৃক্ষাদির বীজসমূহের অঙ্কুরিত হইবার জন্য যেমন জলবায়ু ও উত্তাপের আবশ্যক, তদ্রূপ শাস্ত্র ও গুরুকৃপা এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী মানবের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মবীজকে অঙ্কুরিত করে—অর্থাৎ আমার অন্তরে যাহা গুপ্তভাবে নিহিত ছিল তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করে। ঐ অন্তর্নিহিত বস্তু প্রকাশিত হইয়া যখন আমারই নিকট আগমন করে, তখন আমি তাহা গ্রহণ করি এবং তাহা আমার আত্মার নিজস্বরূপে পরিণত হয়। এই আত্মসাৎকরণ বা আত্মজ্ঞানলাভের দ্বিতীয়প্রক্রিয়া মনন।

মনন শব্দের অর্থ নিজের অন্তরে জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা তর্ক বা বিচার। এই মনন ক্রিয়ার দুইটি কার্য্য গ্রহণ ও পরিবর্জ্জন। যেমন আমাদের এই বাহিরের দেহের অন্নপান সম্বন্ধে সুখাদ্য গ্রহণ ও অখাদ্য বর্জ্জন ক্রিয়ার দ্বারা তাহা আমাদের দেহের অঙ্গীভূত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রলব্ধ ও গুরুমুখলব্ধ জ্ঞানও বিচার দ্বারা গৃহীত বা পরিত্যক্ত হইয়া আমাদের আত্মার অঙ্গীভূত হয়। বস্তুতঃ যে মনীষীরা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন এবং যে সদ্‌গুরুমণ্ডলী শিষ্যদের ভগবৎপদলাভের পন্থার উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা মানবের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-শক্তির বিকাশ হইবে। আমরা কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়া অলসভাবে পণ্ডিত-মূর্খ হইয়া বসিয়া থাকিব, জানিলে, তাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এত অসংখ্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন না।

যেথায় সাধুসঙ্গ দ্বারা মনন-শক্তি বর্দ্ধিত না হইয়া মানবকে বিচারহীন করে, তথায় মানবের অবনতির দ্বার উন্মুক্ত হয় মাত্র। চিরদিনই দেখা আছে, শাস্ত্রপাঠ এবং গুরুকৃপা দ্বারা শিষ্যদিগকে প্রকৃত মানুষ করিয়া দেয়—স্বাধীনচেতা, বিচারশীল, সাধনপরায়ণ এবং সত্যধর্ম্মানুরাগী করিয়া দেয়। আর যেখানে সাধুসঙ্গের দ্বারা বয়োবৃদ্ধ মানবগণ বালকের ন্যায় নিঃসহায় ও পরমুখাপেক্ষী হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, শ্রবণ আছে, মনন নাই, শোনা আছে, জানা নাই। আত্মজ্ঞানলাভের তৃতীয়প্রণালী নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসন শব্দের অর্থ—নিশ্চিন্তরূপে ধ্যান। যখন শ্রবণ মনন দ্বারা মানবের চিত্ত উদ্বুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব মানব-প্রাণের নিকট পরমতত্ত্ব সকল প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়, তখন তাঁহার একনিষ্ঠ ধ্যান-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক হয়। এই জগতে সকল বস্তুরই দুইদিক্ আছে—এক রূপ, অপর স্বরূপ। যাহা বাহিরে পরিদৃশ্যমান হয় তাহা রূপ, আর যাহা অন্তরে নিহিত থাকে তাহাই স্বরূপ। রূপ চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয়, স্বরূপ জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা অনুভূত হয়। একটি সুন্দর গোলাপফুল বাহিরে কেবল গোলাপি রংএর চিত্র দেখায় মাত্র, কিন্তু ইহার স্বরূপ জানিতে হইলে জ্ঞান ও বিচারকে আশ্রয়করিয়া এই দৃশ্যমান জগতের অন্তস্তলে নিমগ্ন হইতে হয়। স্বরূপ জ্ঞান ও ধ্যানের নির্জ্জন কুটীর। সেখানে জ্ঞানতত্ত্ব ও সাধক বিনা আর কেহ যাইতে পারে না। ধ্যানমগ্ন না হইলে ব্রহ্ম-স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকৃতরূপে প্রকাশিত হইতে পারেনা। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মশক্তির যে বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে তাঁহার কোন স্বরূপবিশেষকে উপলব্ধি করিতে হইলে, এই ব্রহ্মাণ্ডের লীলারাশি ভুলিয়া গিয়া ধ্যানযোগে সেই স্বরূপবিশেষে একাত্মা হইতে হয়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্য শ্রবণ দ্বারা জ্ঞান অঙ্কুরিত, মননের দ্বারা বিকশিত এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। ধ্যানের দ্বারা মানবের সত্যাসত্য-জ্ঞান জন্মে ও ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। নিদিধ্যাসন ভিন্ন নিত্য সত্যের অনুভূতি হইতে পারেনা। অতএব শাস্ত্র ও গুরুবাক্য-শ্রবণ এবং মননের পরেই নিদিধ্যাসন চাই। এই তিনপ্রকার সাধন একত্রীভূত হইলেই মানবের পরমাত্ম-দর্শন হয়। আমাদের দেশে জ্ঞান ও ভক্তিমার্গিদের মধ্যে চিরকালই বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। দ্বৈতবাদিরা চিরদিনই বলিয়া থাকেন "চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনি খাওয়া ভাল।" শ্রীমদ্ভাগবত—

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যত্তথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥”

অর্থাৎ “হে বিভো! মুক্তির পথস্বরূপ ভক্তিকে বর্জ্জন করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান-লাভ জন্য পরিশ্রম করে, তাহাদের শ্রম, শস্য পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তুষপেষণকারী ব্যক্তিদিগের শ্রমের ন্যায় বৃথা হয়।” গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলিয়াছেন—আমার যে যেভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইভাবে দর্শন দিয়া থাকি—অর্থাৎ ভক্তিমার্গীদের জন্য যে পঞ্চপ্রকার সাধনের উল্লেখ আছে, তৎতৎভাবে সাধন-ভজন দ্বারা ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের দর্শন ও তাঁহার সঙ্গ-সুখ ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানমার্গীরা বলেন—ভক্ত ভগবানের দর্শন ও তাঁহার সঙ্গ-সুখ লাভ করিলেও জ্ঞানী যেমন ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিরানন্দময় জন্মবন্ধননির্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন—তাহা কখনও লাভ করিতে পারেন না। ইহার উত্তরে আমার মনে হয়, কেবলমাত্র নিত্যানিত্য-বিচারাদি দ্বারা মানবকে এই সংসার-বন্ধন ও বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত করা যায় না। আসক্তির দ্বারা আসক্তির নাশ করিতে হইবে; অর্থাৎ ঈশ্বরে একান্ত অনুরাগ জন্মিলে স্বতঃই বিষয়-বিরক্তি জন্মিবে। বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে—“পরানুরক্তিরীশ্বরে।” অর্থাৎ ঈশ্বরে ঐকান্তিক অনুরাগই ভক্তি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্যারীলাল দত্ত।

যুগের কথা।

সনাতনশাস্ত্র, অখণ্ডদণ্ডায়মান মহাকালকে লৌকিক-ক্ষেত্রে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ‘যুগ’ নামে পরিচিত করিয়াছেন। বিরাট্‌পুরুষ যেমন অনন্ত, সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বাতিগশক্তিশালী, মহাকালও তদ্রূপ অসীমশক্তিসম্পন্ন এবং পরমপ্রভুর লীলাখেলার সহচর। বিভুর সৃষ্টিলীলা ও লয়লীলা, কালের করাবলম্বনেই সম্পন্ন হয়। জীব-কলেবরে প্রাণবায়ুর অবস্থান যে কালটুকু ধরিয়া হয়, তাহার বলে মানবদেহ, সমুদ্রমন্থন ও বিদ্যুদ্দামধারণাদি অসাধ্যসাধনের স্পর্দ্ধা করে, কিন্তু ঐ কালের গণ্ডীর বিন্দুমাত্র বাহিরে গেলে উক্তশরীর শবাকারে

ঘৃণার উদ্রেক করে। পরিবর্ত্তনের মূলে কাল। যাহা উত্তালতরঙ্গময়, নক্রচক্র-সঙ্কুল ও অগাধ সিন্ধু ছিল, কালের কুটিলকটাক্ষে তাহা নীরস মরুমহীরূপে বা বৃক্ষ, বিহঙ্গ ও শ্বাপদ সমন্বিত অভ্রভেদী অদ্রি হইয়া বিপরীত ভাব প্রদর্শন করিতেছে। যে রাষ্ট্র বা যে বংশ, রাজলক্ষ্মীর নিকেতন ছিল, তাহা ভিক্ষুকের ক্ষুৎক্ষামজ্বালায় আজ হাহাকার করিতেছে; পক্ষান্তরে পঙ্গু পর্ব্বতলঙ্ঘন ও অন্ধ ইন্দুদর্শন করিয়া গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

"যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ॥"

ব্রহ্মাদিরও কালে জয় ও কালে লয় হয়; কালের হস্ত হইতে কেহ মুক্ত নহেন। এইরূপে কালপুরুষের কৌশলী করের দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রকৃতিসুন্দরী নানাবিধ অভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। জগত্ কালের ক্রীড়া-কন্দুক।

সেই অনাদি অনন্ত কালকে আর্য্যাচার্য্যগণ ক্রিয়া দ্বারা খণ্ডাকারে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম হইতে স্থূলাতিস্থূল পর্য্যন্ত পরিচয় দিয়াছেন এবং ক্রিয়ারূপ ('অষ্টাদশ-নিমেষাস্তু কাষ্ঠা ত্রিংশত্তুতাঃ কলাঃ) অষ্টাদশনিমেষ কাল হইতে সূত্রপাত করিয়া মন্বন্তর পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন। তাহাতেও নিষ্কৃতি না পাইয়া প্রলয়-পয়োধি-জলে সুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে সূর্য্যাদি গ্রহের গতিবিধি দ্বারা দিন, মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসরাদিরূপ কালকে যেমন জানা যায়, তদ্রূপ শীতাতপ-বর্ষণাদি ঋতু চিহ্নদ্বারা প্রকৃতিদেবীরও পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং কাল ও প্রকৃতি নিত্য-সম্বন্ধ, তাহার নিয়ামক সূর্য্যাদির ক্রিয়া। সেই ক্রিয়া বশতঃ কখন কখন গ্রীষ্মকালে বর্ষণ ও বর্ষা-ঋতুতে উত্তাপগম হইয়া থাকে। চিন্তা-চতুর সম্প্রদায়-বিশেষ ক্রিয়া ও কালের প্রভেদ না মানিয়া 'ক্রিয়ৈব কালঃ' এই মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন।

যাহা হউক, 'কাল ক্রিয়াঘটিত বা ক্রিয়াই কাল' স্বীকার করিলে, তাহার সহিত যখন প্রকৃতি সতত যুক্তা, তখন প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিদান করিয়া, সেই কালকে যুগ-রূপে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রিকালদর্শী ঋষিরা চিন্তাশক্তির পরমপরিচয়ই দিয়াছেন। সেই যুগচতুষ্টয় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি বা কালের ১ম, ২য়, ৩য় এবং অন্তিমস্তর। মনুষ্যসৃষ্টির পরদিন হইতেই ব্রহ্মার বা বেদের ঘোষণা দ্বারা সত্যযুগ আরব্ধ হইল, সমস্ত মানুষ ও পশু পর্য্যন্ত লোভ-মোহ-কামক্রোধাদি বর্জ্জিত হইল; মূর্ত্তিমতী শান্তি সর্ব্বত্র বিরাজমানা হইলেন,

সুতরাং ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ; অসত্য হিংসাদির নামগন্ধ রহিল না—এই কথা যাঁহারা বলিতে চান ; সেই সকল ন্যায়প্রবীণ মহাশয়দিগের মুখবন্ধ করিতে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমর্থ নহে। বৈদিক ও পৌরাণিক ইতিহাস ও স্মার্ত্তশাসন পাঠ করিলে, তৎকালে শতসহস্র পাপের আচরণ অবগত হওয়া যায়। অনাচারের ত কথাই নাই। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির বহুপরবর্ত্তিকালে যখন মানবসমাজ শিষ্ট-পদবীতে পৌঁছিল ও বেদের বার্ত্তা কৃষকের কর্ণকুহরেও প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ; তখন হইতে সত্যযুগের গণনা আরম্ভ হইল। তাহাই বৈশাখশুক্লতৃতীয়া সত্যযুগাদ্য।

এইক্ষণ আলোচ্য যে, যখন হইতে যে দেশে সত্যযুগের প্রবর্ত্তন হইতে লাগিল ; তাহার পর হইতে সেদেশে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম কি প্রাকৃতিক-নিয়মে না অলৌকিকশক্তিবশে প্রকাশ পাইল ? অলৌকিক ব্যাপার বলা যায় না ; তাহা সর্ব্বত্র সমভাবে ফলিত হয়। সত্যযুগের সম্রাট্ বেণের ন্যায় দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি এখনও বিরল। প্রাকৃতিক নিয়মই বলিতে হইবে। ক্ষিতিজলাদিপঞ্চভূতের নবাবতার, উর্ব্বরা ভূমির ন্যায় উৎকর্ষের আধার। যেমন নবকৃষ্ট ভূমিতে যে সকল বৃক্ষাদি উদ্ভূত হয়, তাহা বহুবল ও ফল-সম্পন্ন এবং দীর্ঘজীবী হয়, তদ্রূপ প্রথম সময়ে উৎপন্ন বস্তুজাত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিল। মনুষ্যবৃত্তিগুলি পূর্ণকারে বিদ্যমান ছিল। মনুষ্য সভ্য-ভাবে সমাজবদ্ধ হইলে, সেইবৃত্তিবর্গের স্ফূর্ত্তি এবং যথাযথ বিনিয়োগ হইতে লাগিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ২১টী কথার অধিক বলিলে প্রবন্ধের বিস্তার ঘটিবে, তাহা পাঠকের বিরক্তিকর। ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, অচৌর্য্য ও সত্য প্রভৃতি দশটী গুণ লইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম দেহ গঠিত হয়। বলিষ্ঠ ও তেজস্বী ব্যক্তি সরল ও মনস্বী হইয়া থাকে। তাহাতে সত্য, দয়া, ধৈর্য্য এবং অচৌ-র্য্যাদি গুণ থাকে ও থাকিবার সম্ভব। শৌর্য্যে চৌর্য্য থাকে না। ক্ষমতা-বানেই ক্ষমা ও দয়া এখনও দেদীপ্যমান দেখা যায়। 'অশক্তস্য কুতঃ ক্ষমা।' কাপুরুষে বা মানবোচিত-বৃত্তি-বিবর্জ্জিত ব্যক্তিতে সত্য-সারল্যাদি নাই। অতীতের সাক্ষী ইতিহাস। বর্ত্তমানে ভীরু কাপুরুষ জাতিতে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃশ্যমান। 'কারণগুণাঃ কার্য্যগুণান্ আরভন্তে' এই দার্শনিক যুক্তিতে দেখা যায় যে, উপাদানের গুণে উৎপন্নের উৎকৃষ্টতা। তদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষও এই পক্ষের সমর্থক। সুতরাং সত্যযুগের জীব বা মানুষ ক্ষিত্যাদি উৎকৃষ্ট উপকরণ-গুণে বাস্তবিক মানুষ। আবার শিক্ষা দ্বারা শিষ্ট সভ্য

বা সমাজবদ্ধ হইলে শারীরিক ও মানসিকশক্তির পূর্ণ প্রবাহ কেন না বহিবে? সেইজন্য আদিযুগের নর দীর্ঘদেহী, দীর্ঘজীবী ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের পূর্ণমাত্রা। প্রকৃতিদেবীর প্রিয়পুত্রত্ব-বশতঃ তৎকালে 'ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্ণাকালমরণং নৃণাম্'; এই উক্তি গাঁজাখোরী নহে। কখন কখনও লোকাপচার বশতঃ প্রকৃতিমাতার বিকৃতি ঘটিলে, যজ্ঞাদির হব্যাহুতি দ্বারা তাহা অপনীত হইত। আদ্যযুগের মনুষ্যভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌ও প্রকাণ্ড-কায় ও পর্য্যাপ্তপরমায়ুঃ ছিল। এই সমস্তই প্রকৃতির বিপুল বিভূতি।

শিষ্টসমাজে অনার্য্যাচরণ বিরল ছিল। অন্যায় কিছু একটু গুরুভাবে ঘটিতে লাগিলে আর্য্যগণ খড়গহস্ত হইয়া উঠিতেন্। যাযাবর ও যাজ্ঞিক ঋষিগণ তখনই তাহার প্রতীকারপরায়ণ হইতেন। বেণ প্রভৃতি ব্যক্তি অবিনয়-দোষে অধঃপাতে গিয়াছিল; কেবল জনবিরাগ তাহার মূল।

সত্যের "বাটী" খাঁটি হইলে, অসুরের অত্যাচার ও বেণাদির বিকার কেন ঘটে? 'জনপদবিধ্বংসিনো রোগাঃ' ইত্যাদি আয়ুর্ব্বেদীয় উক্তির মূলে পুরাতন সময়ে মহামারীকে ভারতের বক্ষভেদ করিয়া উত্থিত হইতে দেখা যায়। তাহার কারণ কি? সরল উত্তর—কর্ম্মদোষ। সেই কর্ম্ম প্রাক্তন ও তদানীন্তন বটে। নচেৎ বলিষ্ঠ এবং নীরোগ মাতাপিতৃজাত সন্তান কখন কখন দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয় কেন? হিন্দুর কর্ম্মের কৈফিয়ৎ অমোঘ অস্ত্র। কর্ম্ম না মানিলে উপ-যুক্ত উপাদানে উৎপন্ন বস্তুর বৈষম্যের সদুত্তর কোন অহিন্দু মনস্বীও দিতে পারিবেন না। শাস্ত্রকারকুল অনাকুলভাবে বেণ প্রভৃতি দুরাচারগণের জন্মান্তরের দোহাই দিয়া যুগগৌরব অক্ষত রাখিয়াছেন; ইহা কণ্টকোদ্ধার নহে। প্রকৃতি কর্ম্মদোষে বিকৃত হয়; ইহা প্রত্যক্ষবাদীর পক্ষেও স্বীকার্য্য।

দেব-দানব বৈদিক-শাসনের কিয়দংশে বাধ্য; কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে নহে; সুতরাং মানবীয় শিষ্টসমাজে তাঁহাদিগকে ধরা যায় না। "ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ" এই প্রকার দস্যু তখন ছিল। তাহারা প্রকৃতিগুণে সরল, সবল ও সত্যপ্রিয় থাকিলেও অশিক্ষিত, অশিষ্ট ও নিয়মভ্রষ্ট থাকায় "দস্যু" নামে পরিচিত। সভ্য-সমাজে সত্যযুগ বা ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ; কিন্তু অসভ্যের দোষ-গুণ কোন যুগে আলোচ্য নহে; তাহা ধর্ত্তব্যই নহে। নচেৎ সাঁওতাল, ভিল এবং সভ্যদেশের হীনকর্ম্মকদের যেটুকু সারল্য ও সত্য পাওয়া যায়, বর্ত্তমানের নব্য সভ্যজনগণে তাহা পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু সভ্যতার "লেফেফা দোরস্ত" বলিয়া তাহাই গণ্য। উক্ত

রূপ অল্পমাত্র শিষ্টাপসদের দোষে সমস্ত শিক্ষিত বা সভ্য-সমাজ কেন রসাতলে যাইবে?

এইরূপ প্রকৃতির ১ম স্তর তদানীন্তন আর্য্যসমাজের সত্যযুগ। ২য় স্তর ত্রেতা। তখন প্রাকৃতিক ও মানসিক-শক্তির তদ্রূপ হ্রাস। সত্যের ন্যায় শান্তি সর্ব্বাবয়বসম্পন্না নহে; পাদ-পরিমিত পাপের অনুপ্রবেশ; সুতরাং রাজসংখ্যার আপেক্ষিক বৃদ্ধি। ভারতের বহির্ভাগে বাস করিয়া রাবণ অনার্য্য আচরণ করিয়াছিল; ধর্ম্মাবতার ভারতরাজ রাম তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। দশানন সবংশে নিহত হইল, কিন্তু আততায়ী রাক্ষসরাজে আর্য্য-বীর্য্যের সম্পর্ক থাকায় অযোধ্যাধিপ ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। যুগ-ধর্ম্ম বলীয়ান্; সেইজন্য তাদৃশ অনার্য্যবধেও প্রবলপরাক্রমশালী রাজার অনুতাপ ও সঙ্কোচ অনুভব হইয়াছিল। আবার তখন—

'রাঘবোঽপি প্রিয়া-প্রাপ্তৌ ব্যগ্রঃ সুগ্রীবসংগ্রহে।
বীরাবিধেয়ং স্বার্থান্ধ্যাদ্ বধং ব্যধিতবালিনঃ'। রাজতরঙ্গিণী।

বালিবধে মনুষ্যরূপী ভগবানে যুগবলে ধর্ম্মের অঙ্গহানি দেখা দিল।

৩য় স্তর দ্বাপর। তখন প্রকৃতি পশ্চিমবয়সের পূর্ব্বসীমায় উপস্থিত। দ্বাপরের গণনা-দিবস ভাদ্রকৃষ্ণা ত্রয়োদশী শুক্রবার। বিজ্ঞ ঋষিগণ প্রকৃতির অর্দ্ধবিকৃতি দেখিয়া উক্তদিন নির্দ্ধারণ করিলেন। ধর্ম্ম ভগ্নদেহে অশক্ত হইয়া পাপকে অর্দ্ধ অংশে ভূমির ভাগী করিলেন। অশান্তি আরও আসিল; স্বার্থ-পিপাসার প্রাচুর্য্য বশতঃ 'দ্বাপরে রাজবিস্তরঃ' হইয়া পড়িল। সংযম, তপস্যা ও স্বাধ্যায়াদি-শক্তিও জীবিতকালের সহিত হ্রাস পাইতে লাগিল।

দ্বাপরের শেষে কুরুপাণ্ডবের কলহ, কলি বা কলহের যুগ আনয়ন করিল। কলির অর্থ কলহ বা অশান্তি। প্রকৃতির ৪র্থ স্তর অন্তিমযুগ। অশান্তিই সর্ব্ববিপ্লবের ও লোকক্ষয়ের নিদান। প্রকৃতির বৃদ্ধবয়সের সন্তান উষর জমীর উদ্ভিদের ন্যায় সর্ব্বাংশে ক্ষীণ হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কলি, কলহ বা সর্ব্বপাপের আবাসভূমিরূপে দুর্য্যোধন দেখা দিলেন। পূর্ণমানুষ-রূপী ভগবান্ কৃষ্ণ ধর্ম্মরূপী যুধিষ্ঠিরকে খাড়া করিয়া গেলেন। কৃষ্ণ লোক-ক্ষয়কে পরমপাপ বুঝিয়া তাহার নিবারণার্থ সন্ধির জন্য অশেষ প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কলি বা দুর্য্যোধনের প্রত্যাখ্যানে যুদ্ধ সংঘটিত হইল। প্রকৃতির বিপরীত গন্তব্যপথ কে রোধ করে? মাঘী পূর্ণিমা শুক্রবার—কলির গণনারম্ভকাল। যখন আচার্য্যগণ দেখিলেন, পূর্ব্বযুগান্তরের

বিপরীতভাবে প্রকৃতি প্রবৃত্তা, তখন তাঁহারা কলির অধিকার কল্পনা করিলেন। উত্থান ও পতন প্রকৃতির ধর্ম্ম, তাহা ক্রমে হয়, যুগকল্পনা তাহারই পরিচয়, এইজন্য প্রাচীনসম্প্রদায় 'ক্রমাপকর্ষ'বাদী। নব্য সভ্যগণ 'ক্রমোৎকর্ষবাদে'র পক্ষপাতী। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও প্রতীচ্যজাতির কর্ম্মনৈপুণ্যের চাকচিক্য তাহার মূল, কিন্তু প্রাচ্য-জ্ঞানগরিমার দিকে দৃষ্টিদান করিলে সেই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

আদিমসময়ে আর্য্যগণের লক্ষ্য কর্ম্ম বা বিজ্ঞান ছিল: কারণ, তাহার ফল প্রত্যক্ষ; স্বারসিকরুচি প্রত্যক্ষেই আপাততঃ পতিত হয়। কিন্তু যখন দেখিলেন, কর্ম্ম বা বিজ্ঞানের গতিও কুণ্ঠিত হইতে লাগিল; তখন তাঁহারা ধর্ম্ম বা জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জ্ঞানের দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তু আয়ত্ত হইতে লাগিল, বিজ্ঞান নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিল। কর্ম্মের উপরে ধর্ম্ম রহিলেন, ধর্ম্মের দ্বারা বাহ্য জগৎকে বদ্ধ করিলেন। জ্ঞানই অন্তর্ভূমির ভূপতি। কলিকালে উভয়ের পতন। তবে একটুমাত্র ধর্ম্ম না থাকিলে সৃষ্টি চলে না, সেইকারণ পাদৈক-ধর্ম্মস্থিতি কলিতে কল্পিত।

কলিযুগে আয়ুঃ, শরীরের পরিমাণ ও বল এবং মানসিক শক্তির হ্রাস হইয়াছে; রোগ, শোক, আকালিক জরা ও মরণ, বিবাদ, এবং সংগ্রাম ও নানাবিধ পাপাচার কৃষকের কুটীর হইতে প্রভুর প্রাসাদ পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছে। ইহা কি ক্রমিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ? তবে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে যাহা বর্ব্বর-ভূখণ্ড বলিয়া হেয় ও অবজ্ঞেয় ছিল; তাহা আজ বিজ্ঞানের চাকচিক্যে উপাদেয় হইয়া বসিয়াছে। ইহাতে নব্য সভ্যের অক্ষিপাত শর্ম্মণের পুণ্যস্থলী ত্যাগ করিয়া জর্ম্মণের দিকেই পড়িতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির পতনোত্থান-নিয়মে বর্ব্বর কোন সময়ে বিজ্ঞ হইবেই। যে দেশ ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাই ক্রমে অধঃপাতে যাইতেছে,—ইহাই প্রাচীন-গণের ক্রমাপকর্ষ। তাহাতে প্রতীচ্যভূমি আপাততঃ বাঁচিয়া যায় বটে; কিন্তু আদিমসময়ে সে সকল দেশের অস্তিত্বেই সন্দেহ। শারীরিক শক্তি ও আয়ুর খর্ব্বতা সে সকল দেশে যখন হইয়াছে এবং অধ্যাত্মবিদ্যার সমাদর সেখানে নাই; তখন সেই ভূমির ক্রমাপকর্ষ বা চিরাপকর্ষ বলিলে ক্ষতি কি? প্রাচ্য আচার্য্য যিশুর মহিমায় প্রতীচ্যদেশ ধর্ম্মের সহিত পরিচিত হইয়া "সভ্য" নামে অভিহিত হইয়াছিল। সে ধর্ম্মে অধ্যাত্মবিদ্যা না থাকিলেও লোকের মনুষ্যত্ব-প্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু জার্ম্মণির অত্যাচারে তাহা টিকিল কৈ?

লোক ক্ষয়ের ন্যায় মহাপাপ জগতে আর নাই। বহুবর্ষ পূর্ব্ব হইতে জার্ম্মাণ-কেশরী জীবমেধ-যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। আদর্শ-সভ্য জার্ম্মাণের বিদ্যা বুঝা গেল। দুর্য্যোধনের ন্যায় জার্ম্মাণরাজের দুরাগ্রহের ফল এই সমরে, জন-যাতনা, উপাসনা-মন্দির-ধ্বংস প্রভৃতি অকার্য্য এবং কূটযুদ্ধ পাপ বটে। "কর্ম্মজগৎই চূড়ান্ত; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই"—এই ধারণাবান্ ভূপতির কৌরব-পতির মত পতন অবশ্যম্ভাবী। ইহাও কলিধর্ম্ম। অতিবুদ্ধি অধোগতির পূর্ব্বলক্ষণ। সমবেত মিত্রশক্তি নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে সমরে অবতীর্ণ; সুতরাং লোকক্ষয়ের প্রত্যবায়ভাগী নহেন। "যতো ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।"

বর্ত্তমান-প্রতীচ্যভূমির লোমহর্ষণ রণ দেখিলে ভগবানের প্রতি ভক্তি বদ্ধমূল হয়। 'ভবিতব্যং ভবত্যেব' এই আর্ষবাণী এইরূপ ক্ষেত্রে ফলবতী দেখা যাইতেছে। বিজ্ঞানের ও রাজনীতির বল অদৃষ্টের দ্বার রোধ করিতে পারেনা। অদৃষ্ট জ্ঞানগম্য, ঋষিরা তাহার উপাসক ছিলেন; একন্য তাঁহারা ত্রিকালদর্শী।

প্রতীচ্য শক্তিসমূহ বর্ত্তমানসময়ে জগতের মধ্যে বিজ্ঞান-রসায়ন-শাস্ত্রে ও রাজনীতিশাস্ত্রে পরমপণ্ডিত। বিগ্রহের সম্ভাবনা দেখিলে তাঁহারা পূর্ব্বেই সন্ধি করিয়া বসেন। বিশেষতঃ জার্ম্মাণজাতি বিজ্ঞানে ও নীতিশাস্ত্রে বিষম অভিমানী। উপস্থিত ব্যাপারে তাঁহার স্খলন কেন হয়? 'ভাবিচেন্ন তদন্যথা' ইহাই বক্তব্য। কলির কালিমা বা অশান্তি প্রকৃতির দুষ্পরিণতি; তাহার আকার ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ অধ্যাত্মবিদ্যাবলে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ্য।

যথা :—

ভাগবতে ১২শ স্কন্ধে

ততশ্চানুদিনং ধর্ম্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া।
কালেন বলিনা রাজন্ নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্ব্বলং স্মৃতিঃ॥ ১।
বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ।
ধর্ম্ম-ন্যায়-ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেবহি॥ ২।
দাম্পত্যেঽভিরুচি র্হেতু র্মায়ৈব ব্যবহারিকে।
স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বেচহি রতি র্বিপ্রত্বে সূত্রমেবহি॥ ৩।
লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতা- বন্যোন্যাপত্তিকারণম্।
অবৃত্ত্যান্যায়দৌর্ব্বল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ॥ ৪।

অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভ এবতু।
স্বীকার এবচোদ্বাহে স্নানমেব প্রসাধনম্ ॥ ৫ ।
শাক-মূলামিষ-ক্ষৌদ্র- ফলপুষ্পাষ্টিভোজনাঃ।
অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্‌ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষ-কর পীড়িতাঃ ॥ ৬।
শীতবাতাতপপ্রাবৃড়্ হিমৈরন্যোন্যতঃ প্রজাঃ।
ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং ব্যাধিভিশ্চৈব সন্তপ্যন্তেচ চিন্তয়া ॥ ৭।
ত্রিংশদ্ বিংশতিবর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাম্ ॥ ৮।
ক্ষীয়মাণেষু দেহেষু দেহিনাং কলিদোষতঃ।
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্মে নষ্টে বেদপথে নৃণাম্ ॥ ৯।
পাষণ্ডপ্রচুরে ধর্ম্মে দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
চৌর্য্যানৃতবৃথাহিংসা- নানাবৃত্তিষু বৈ নৃষু ॥ ১০।
ইথং কলৌ গতপ্রায়ে জনেষু খরধর্ম্মিষু।
ধর্ম্মত্রাণায় সত্বেন ভগবানবতরিষ্যতি ॥ ১১।
যদাবতীর্ণো ভগবান্ কল্কির্ধর্ম্ম-পতির্হরিঃ।
কৃতং ভবিষ্যতি তদা প্রজাসৃষ্টিশ্চ সাত্বিকী ॥ ১২।
যস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ।
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ ॥ ১৩।
কলৌ কাকিনিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
ত্যক্ষ্যন্তিচ প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি ॥ ১৪।

সারার্থ ঃ—

কলির প্রবলাবস্থায় ধর্ম্ম, সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা, আয়ুঃ, বল, এবং স্মরণশক্তির নাশ হইবে। অর্থই বংশ, কর্ম্ম ও গুণ-গৌরবের মূল হইবে; বলই ধর্ম্ম ও ন্যায়-নিরূপণের হেতু হইবে। দাম্পত্যে কুলগোত্র-বিচার থাকিবে না; তাহাতে মনোরথই নিশ্চায়ক হইবে। ক্রয়-বিক্রয়ে কাপট্য, স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বে রতি এবং ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে যজ্ঞসূত্রই প্রতিপাদক হইবে। দণ্ড ও অজিনাদি-ধারণই আশ্রমবোধক এবং আশ্রমান্তর-গ্রহণের পরিচায়ক হইবে। নিঃস্ব দারিদ্র্য-দোষে ন্যায়বিচার পাইবে না। গলাবাজী থাকিলে 'পণ্ডিত' নামের ভাগী হইবে। ধনহীন হইলে অভদ্রের মধ্যে গণ্য হইবে, এবং জুয়াচোর ভদ্র হইয়া বসিবে। স্ত্রী-পুরুষ সম্মত হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইবে, মন্ত্রাদি লাগিবে না। স্নানমাত্রই শৌচের কারণ হইবে, ভাবশুদ্ধির প্রয়োজন হইবে না। অনাবৃষ্টি

বশতঃ দুর্ভিক্ষ হইবে এবং শস্যাদির উৎপত্তি না হওয়ায় প্রজাগণ করকষ্টে নিপীড়িত হইয়া শাক, মূল, মাংস, মধু, ফল, পুষ্প ও অস্থি (আঁটি) দ্বারা প্রাণধারণ করিয়া বিনষ্ট হইবে। শীতে, বাতে, আতপে, বর্ষায় ও হিমে, পরস্পর বিবাদে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, বিবিধ ব্যাধিতে ও চিন্তাদহনে লোকসমূহ প্রপীড়িত হইবে। লোকের পরমায়ুঃ পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। দেহীর (সর্ব্বপ্রাণীর) দেহ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইবে; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও বৈদিকবিধি ভ্রষ্ট হইবে, ধর্ম্ম পাষণ্ডবহুল হইবে, প্রায় রাজা দস্যুভাব ধারণ করিবে। মনুষ্যগণ চৌর্য্য, মিথ্যা ও বৃথা-হিংসাদি নানা পাপাচার করিবে। এইরূপে কলি শেষপ্রায় হইলে জনগণ গর্দ্দভের মত হইবে। তখন ভগবান্ সত্ত্বগুণাবলম্বনে অবতীর্ণ হইবেন। ধর্ম্মপতি হরির কল্কিরূপাবতারের পর হইতেই সত্যযুগারম্ভ ও সাত্ত্বিক প্রজা সৃষ্টি হইবে।

এখন কলির শেষ বহুদূরবর্ত্তী, কিন্তু উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কোন্‌টা কাল্পনিক? প্রত্যক্ষদর্শী কি বলেন? ভবিষ্যদপচারেরও পূর্ব্বাভাস দেখা দেয় নাই কি? হতভাগ্য লোক ক্ষুদ্রবিত্ত হইয়াও বহুব্যয়ী হইবে, পুরুষগণ কামুক ও বিত্ত-বিবর্জ্জিত এবং রমণীরা স্বেচ্ছাচারিণী ও অসতী হইবে। কলিতে কপর্দ্দকের জন্যও সৌহার্দ্দ ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ দ্বারা স্বজনদিগকে হত্যা ও নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবে। এই সমস্ত ভারতের বাক্য।

কৃত্রিম সংবিধা দ্বারা স্বভাব সংরুদ্ধ হয় না। শিক্ষিতসমাজ এখন রুগ্ন অল্পায়ুঃ কেন? পূর্ব্বতন শিক্ষিতগণ অরোগ ও দীর্ঘজীবন ছিলেন। প্রকৃতির পরিণাম তাহার নিদান; তাহাই কলির কলঙ্ক। এই প্রকৃতিতত্ত্ব ও অন্ত্য-যুগের দুর্গতি ঋষিরা প্রণিধান দ্বারা জানিয়া ভাবী কালের অপকর্ষ উদ্‌ঘোষণ করিয়াছেন। জ্ঞানের জয়।

শ্রীভাগবত কলির ভবিষ্যৎ রাজগণের নির্দ্দেশ করিয়া ইহাই বলিলেন—

"যে যে ভূপতয়ো রাজন্ ভুঞ্জতে ভুবমোজসা।
কালেন তে কৃতাঃ সর্ব্বে কথামাত্রাঃ কথাসুচ॥

যুগধর্ম্ম সত্য, যুগধর্ম্মের জয়।

শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ।

মৈথিল-ব্রাহ্মণ।

মৈথিল-ব্রাহ্মণ দশবিধ ব্রাহ্মণের অন্যতম। (১) মুঙ্গের, ভাগলপুর, পুর্ণিয়া ও মালদহ জেলায় মৈথিল-ব্রাহ্মণের বাস থাকিলেও তাঁহাদের সংখ্যা সমগ্র মৈথিল-ব্রাহ্মণ-সংখ্যার অনুপাতে যৎসামান্য। দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুর জেলাতেই তাঁহাদের সংখ্যা সমধিক। অপিচ, দ্বারভাঙ্গা-জেলাতেই তাঁহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দ্বারভাঙ্গাজেলায় ইহাদের সংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ। এই জেলায় অন্যান্য জাতির লোক থাকিলেও ইঁহারাই এই জেলার সকল জাতি অপেক্ষা সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাসম্পন্ন। ইহারা "পূর্ব্বপার" ও "পশ্চিমপার" ভেদে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। "পূর্ব্বপার"-সংজ্ঞক ব্রাহ্মণ "শ্রোত্রিয়" এবং "পশ্চিমপার" ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ মৈথিল বা "তীরহুতিয়া ব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত হন। এই তীরহুতিয়া বা মৈথিল ব্রাহ্মণ "যোগ", "পঞ্জীবদ্ধ" ও "জয়বার" ভেদে পুনরায় তিনভাগে বিভক্ত।

শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ ধনে, মানে, কুলে ও শীলে মিথিলার অন্যান্য শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মিথিলার শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ সচরাচর "শোত" ও "শতি" নামে বিশেষিত হইয়া থাকেন। শ্রোত্রিয়ব্রাহ্মণ "পশ্চিমপার"-সংজ্ঞক কোন ব্রাহ্মণেরই স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন না, এমন কি, তাঁহাদের রন্ধন-শালাতেও উহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেননা। বিবাহাদি ইঁহাদের স্বশ্রেণীতেই

---

(১) সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়াঃ মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ।

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল ও মৈথিল এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ গৌড়-ব্রাহ্মণ-নামে অভিহিত। ইহারা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরভাগে অধিবাস করিয়াছিলেন।

যাঁহারা বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগে বসতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ কহে। তাঁহারাও পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত।

কর্ণাটকাশ্চ তৈলিঙ্গাঃ মহারাষ্ট্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ।
গুর্জ্জরাশ্চৈব পঞ্চৈতে দ্রাবিড়া বিন্ধ্যদক্ষিণে॥

কর্ণাটক, তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় ও গুর্জ্জর, এই পঞ্চদ্রাবিড় বিন্ধ্যাচলের দাক্ষিণবাসী।

(২) একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ।

প্রায় হইয়া থাকে। বিশেষ প্রয়োজন হইলে "যোগ" শ্রেণী হইতে কন্যা গৃহীত হইয়া থাকে. কিন্তু কদাচ কন্যা প্রদত্ত হয়না।

শ্রোত্রিয়ব্রাহ্মণের বসতি দ্বারভাঙ্গাজেলা ভিন্ন অন্য কোন জেলায় সম্প্রতি দেখিতে পাওয়া যায়না। দ্বারভাঙ্গাজেলার সরোষা, রাজে, গাঙ্গুলী, নবটোল, পাহিটোল, লালগঞ্জ, উজান, কছুয়া, সরুসিমা, নরুহার, পচিহী, মধেষুর, লখনৌর, মধুবনী ইত্যাদি গ্রামে তাঁহাদের সংখ্যা সমধিক। ইহাদের ঘরের সংখ্যা ৩৫০ এবং লোকসংখ্যা প্রায় এক সহস্র।

বেদজ্ঞ ও ষটকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় বলে। কিন্তু, মহারাজ বল্লাল সেন, কুলীন-নাম-ধেয় ব্রাহ্মণশ্রেণীর বিভাগ করায় বঙ্গদেশে শ্রোত্রিয়-গৌরব বিলুপ্তপ্রায়। তিনি শ্রোত্রিয়কে "অষ্টধা" এবং কুলীনকে "নবধা" গুণসম্পন্ন নির্দ্দেশ করিয়া কুলীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। মিথিলার শ্রোত্রিয়-গৌরব এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং বর্ত্তমানকালে বেদজ্ঞ ও ষট্-কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ "শ্রোত্রিয়"শ্রেণীর মধ্যেই সমধিক।

শ্রোত্রিয় ও অন্যান্য শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণাদির মূলবন্ধন মহারাজ হরসিংহ দেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। "মিথিলা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, খৃষ্টীয় ১৩২৩ সালে সম্রাট্ তোগলকসাহ তাঁহার দুর্গাধিকার করেন এবং তিনি উত্তরাভিমুখে নেপালে প্রস্থান করেন। "মৈথিলব্রাহ্মণস্য মূলগোত্রাদি-বংশাবলী" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি ১২৪৫ শকাব্দে, পাটনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গিরি-প্রবেশ করেন।

"বাণাগ্নিযুগ্মশশিসম্মিত-শাকবর্ষে
পৌষস্য শুক্লনবমী রবিসূনু-বারে
ত্যক্ত্বা স পট্টনপুরীং হরসিংহদেবো
দুর্দ্দৈবদৈববিপরীতে গিরিং প্রবিশ্য ॥"

খৃষ্টাব্দ ও শকবর্ষে ৭৮ বৎসর পার্থক্য, তদনুসারে ১২৪৫ সাল ১৩২৩ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং "মৈথিলব্রাহ্মণস্য মূলগোত্রাদিবংশাবলী।" গ্রন্থ লিখিত হরসিংহদেব ও ইতিহাসবর্ণিত হরসিংহ দেব যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহাতে কোন সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মৈথিলব্রাহ্মণের মূল-প্রবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে তাহা এই—

মহারাজ হরসিংহ দেবের রাজত্বকালে জনৈক ব্রাহ্মণ-রমণী চণ্ডালগমন অপরাধে অভিযুক্ত হয়েন। ব্রাহ্মণ একদা কার্য্যোপলক্ষে প্রয়াগে গমন করেন;

এবং একজন দোসাদকে (চণ্ডাল) বাটীতে ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া যান। চণ্ডাল ব্রাহ্মণপত্নীর রূপলাবণ্যে মোহিত হয়, কিন্তু পাপীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। একদিন নিশাকালে পাপিষ্ঠ, সতী রমণীর প্রতি আক্রমণ করে! সতী সাধ্বী কামিনী অনন্যোপায় ইহার সন্নিহিত এক শিব-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন এবং চণ্ডালও তাঁহার অনুগামী হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে প্রধাবিত হয়। দুর্ব্বলা কামিনী প্রদক্ষিণে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, পরমপিতা পরমেশ্বরের অপার করুণায় তখন এক বিশাল ভুজঙ্গ অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া দুরাত্মা চণ্ডালকে আক্রমণ ও দংশন করে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয় এবং সাধ্বী পতিব্রতা ব্রাহ্মণ-পত্নীর সতীত্ব রক্ষা হয়। কিন্তু এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণীর কলঙ্ক রটনা হয়। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ বাটীতে প্রত্যাগত হইয়াই স্ত্রীর কলঙ্ক শুনিতে পান এবং তাঁহাকে যথোচিত ভৎসনা করিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে উদ্যত হন। ব্রাহ্মণী এই অযথা মিথ্যাপবাদের কারণ আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বিজ্ঞাপন করিলে ব্রাহ্মণ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজসকাশে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করেন। মহারাজ হরসিংহ দেব সভাপণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক "লৌহ-পরীক্ষা"র ব্যবস্থা করেন। ব্যবস্থা এই হইল যে, অশ্বত্থপত্রে "নাহং চণ্ডালগামিনী" লিখিয়া ব্রাহ্মণপত্নীর করপুটে দেওয়া হইবে, তাহার পর হলের লৌহ-ফলক রক্তপ্রভ উত্তপ্ত করিয়া তাহার উপর ধরা হইবে, যদি তিনি ধারণ করিতে পারেন এবং হস্ত কোনরূপ দগ্ধ না হয়, তবে তাঁহার কলঙ্ক বিমোচিত হইবে, অন্যথা তিনি সমাজচ্যুতা হইবেন। হতভাগিনী সভামধ্যে আনীতা হইলেন। নিরপরাধিনীর হৃদয়ে ভয় বা কোনরূপ সঙ্কোচ ছিলনা, তিনি প্রফুল্লবদনে মন্ত্রপূত অশ্বত্থপত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু যখন উত্তপ্ত লৌহ-ফলক তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইল হতভাগিনীর হস্ত ঝল্‌সিয়া উঠিল—চারিদিকে হাসিবিদ্রূপের ভেরী বাজিয়া উঠিল—ভয়চকিতা কামিনী তথা হইতে বিদ্যুদ্বৎ অন্তর্হিতা হইলেন।

লখ্‌মা ঠাকরুণ (লক্ষ্মী ঠাকুরাণী) নাম্নী এক বিদুষী অন্যত্র বাস করিতেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হতভাগিনী সমুদায় বিষয় আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহারাজ হরসিংহ দেবকে লখ্‌মা ঠাকরুণ পত্র লিখিলেন যে, তাঁহার সভাপণ্ডিতের নির্ব্বুদ্ধিতায় নিরপরাধিনী কামিনী অযথা অপমানিতা হইয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষাগ্রহণ যথোপযুক্ত ও শাস্ত্রানুকূল না

হওয়ায় সতী রমণীর কলঙ্ক অপনোদিত হয় নাই বরং মিথ্যা কলঙ্ক সত্যরূপে লোকসমাজে বিঘোষিত হওয়ায় সাধ্বী ও পতিব্রতা রমণী বিনাপরাধে সমাজচ্যুতা হইতেছেন; সুতরাং তিনি স্বয়ং মন্ত্র রচনা করিতে প্রস্তুত আছেন। মহারাজ হরসিংহ দেব প্রথমে তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়া নিজের জনৈক সভাপণ্ডিতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। রাজসভাপণ্ডিতের সহিত কুলকামিনীর শাস্ত্রালাপ অবৈধ চিন্তা করিয়া বিদুষী লক্ষ্মী সেই বাড়ীর জনৈক ভৃত্যাস্বরূপে জল-আনয়ন ছলে কলসীকক্ষে বহির্ব্বাটীতে আগমন করেন। লখ্‌মাঠাকুরাণী সম্বন্ধে রাজপণ্ডিত অনুসন্ধান করিতে গিয়া, উক্ত দাসীর মুখে যে সকল সংস্কৃত জ্ঞানগর্ব্ববাক্য শ্রবণ করেন, তাহাতেই তিনি স্তম্ভিত ও বিমোহিত হন। পরিশেষে মহারাজ হরসিংহ দেব লখ্‌মাঠাকুরাণীকে মন্ত্র রচনা করিতে অনুরোধ করেন। পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণপত্নী লখ্‌মাঠাকুরাণীর রচিত সংকল্পমন্ত্র বলিতে লাগিলেন "যদি আমি স্বকীয় পতি ভিন্ন কোন চণ্ডালের নিকট অভিগমন করিয়া থাকি, আমার হস্ত এই উত্তপ্ত লৌহ কর্ত্তৃক দগ্ধীভূত হইবে, ক্ষণকালও ইহা ধারণ করিতে পারিবনা।" রক্তপ্রভ উত্তপ্ত লৌহ-ফলক তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইল, তিনি অম্লানবদনে তাহা ধারণ করিয়া রহিলেন। নিন্দুকের মুখ ম্লান হইল—চারিদিখে জয় জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

পরীক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণীর সতীত্ব প্রমাণিত হইল বটে, কিন্তু সংকল্পমন্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণেরই চণ্ডালতা স্থিরীকৃত হইল। ব্রাহ্মণ পরম ধার্ম্মিক ও সদাচারী ছিলেন, তাঁহার চণ্ডালত্ব বা বৃষলতা-প্রাপ্তির কোনই কারণ কেহ প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। সভামধ্যে নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল। যে যে কারণে চণ্ডালত্বপ্রাপ্তি হয়, তাহার বিচার জন্য শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ হইল। "চণ্ডালঃ স্বজনগামী" স্বজনগামী চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। পিতৃকুলের সপ্তপুরুষ এবং মাতৃকুলের পঞ্চপুরুষ স্বজনমধ্যে গণনীয়। সুতরাং এই স্বজনমধ্যে বিবাহ সংঘটন হইলে পুরুষের চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয়। মহারাজ হরসিংহ দেব উক্ত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর বংশাবলী রচনা জন্য কতিপয় ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করেন এবং পরিশেষে বংশ-পরিচয়ে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ স্বজনগামিতা অপরাধে চণ্ডাল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়েন। এইরূপ অপর কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডালত্ব-দোষ-দুষ্ট হইয়াছেন কিনা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য হরসিংহ দেব বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ নিয়োজিত করেন। ইঁহারাই উত্তরকালে "পাঁজিয়ার" আখ্যায় অভিহিত হন।

এই জনশ্রুতি বর্ণিত লখ্‌মা ঠাকরুণ (লক্ষ্মীঠাকুরাণী) এবং ইতিহাস-বর্ণিত মহারাজ শিবসিংহের মহিষী পরম বিদুষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী অভিন্ন বলিয়া অনুমান করা যায় না। বর্ত্তমান রাজনগর ষ্টেশনের (মধুবনী সবডিভিজান হইতে ৬।৭ মাইল দূরবর্ত্তী উত্তরদিকে) প্রায় চারি মাইল পূর্ব্বে সুগৌণা গ্রামে মহারাজ শিবসিংহের রাজধানী ছিল। তাঁহারই অন্যতম সভাপণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ছিলেন এবং ইঁহারই নিকট হইতে বিদ্যাপতি ঠাকুর বেণীপসা থানার অন্তর্গত বিশ্‌পি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হয়েন। (১) মহারাজ শিবসিংহ ঠাকুরবংশীয় ব্রাহ্মণ-নরপতি ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তিনিচয় মধ্যে বিদ্যোৎসাহিতা প্রধান ও অন্যতম। বাঙ্গালার সেনবংশীয় রাজন্যগণের ন্যায় এই ঠাকুরবংশের নৃপতি নিয়ত শাস্ত্রানুশীলন, সুকবি ও বিদ্বজ্জনকে প্রতিপালন, শিক্ষাবিস্তার ও কবিতা-রচনাদিতে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর মনোনিবেশ করিতেন, যুদ্ধ-বিগ্রহজন্য সৈন্যসংগ্রহাদি কার্য্যে তাদৃশ আগ্রহাতিশয় দেখাইতেন না। মহারাজ শিবসিংহ ১৩০১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার পূর্ব্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তিন বৎসর পর ইনি পরাজিত, ধৃত ও দিল্লীনগরে নীত হন। মহারাণী লক্ষ্মীঠাকুরাণী সুকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের সমভিব্যাহারে সুগৌনা রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক জনকপুর (সম্প্রতি নেপালরাজ্যান্তর্গত। রাজনগর ষ্টেশন হইতে দ্বিতীয় ষ্টেশন জয়নগরের সমীপবর্ত্তী) গ্রাম সন্নিহিত বণৌলী গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি দ্বাদশবৎসর কাল পর্য্যন্ত মহারাজ শিবসিংহের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করেন এবং অবশেষে হতাশ হইয়া জ্বলন্ত আগুণে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

মহারাজ হরসিংহ দেবের রাজধানী ছিল সিমরাগ্রামে—বারণ্‌নিয়া এবং রাক্‌শৌল ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী ঘোড়মহল ষ্টেশন হইতে তিন মাইল উত্তর দিকে। মহারাজ হরসিংহ দেব ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে নেপাল প্রস্থান করেন। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ হরসিংহ দেব নেপালে প্রস্থান করিলে পর সম্রাট্‌ তোগলক সাহ উল্লিখিত ঠাকুর-বংশের আদিপুরুষ কামেশ্বর ঠাকুরকে ত্রিহুতের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাল

(১) বিশপি গ্রাম এক্ষণে পচাড়ীর মহান্তের জমীদারি ভুক্ত। বিদ্যাপতি ঠাকুরের বংশধর বদরী ঠাকুর সম্প্রতি মধুবনীর নিকট সৌরাট গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহারা মৈথিল ব্রাহ্মণ, পঞ্জীবদ্ধ মূল বিশৈবার।

নির্দ্ধারণের সত্যতা স্বীকার করিলে, লখমাঠাকুরুণকে মহারাজ শিবসিংহের মহিষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বলিয়া অনুমান করা যায় না। যাহাহউক, মহারাজ হরসিংহ দেব মৈথিল-ব্রাহ্মণের যে "মূল" প্রবর্ত্তন করেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ তত্ত্বনিধি।

বর্ষাচর্য্যা।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে দেখা যায়—

আদান-গ্লানবপুষামগ্নিঃ সন্নোঽপিসীদতি, বর্ষাসু দোষৈর্দুষ্যন্তিতেঽম্বুলম্বাম্বুদেঽম্বরে।
সতুষারেণ মরুতা সহসা শীতলেনচ, ভূবাষ্পেনাম্লপাকেন মলিনেনচ বারিণা।
বহ্নিনৈবচ মন্দেন দোষেষ্বন্যোন্যদূষিষু, ভজেৎ সাধারণং সর্ব্বমুষ্মণস্তেজনঞ্চ যৎ।

অর্থাৎ আদানকালে (১) মানবগণের শরীর গ্লানিযুক্ত হওয়ায় উদরাগ্নি অবসাদগ্রস্ত হয়। ঐ দুর্ব্বল অগ্নি, বর্ষাকালে জলভারাবনত মেঘ দ্বারা গগন-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন বায়ু জলকণা-বাহী গুরু, আর্দ্র ও সহসা শীতল হওয়ায় এবং ভূবাষ্প প্রকাশ পাওয়ায় ও অম্লবিপাকসম্পন্ন মলিনজল-সেবনের ফলে অগ্নির অধিক মন্দভাব উপস্থিত হয়, ফলে মানবদেহস্থ বাতাদি দোষ সকল প্রকুপিত হয় ও পরস্পরকে দূষিত করে। তৎকালে সাধারণ ত্রিদোষপ্রশমন অগ্নিদীপক খাদ্যপেয়াদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

এখানে দেখা গেল, বর্ষাকালে স্বভাববশে বাতপ্রকোপ উপস্থিত হয়। বাতাস শীতল আর্দ্র ও গুরু হয়, ভূবাষ্প উত্থিত হয়, জল উদ্ভিজ্জাণুবহুল মলিন ও অম্লবিপাক হয়, অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়—ফলে বাতাদি দোষের প্রকোপ ঘটে। ত্রিদোষের প্রকোপ উপস্থিত হওয়াতেই জ্বরাদিরোগের আক্র-মণ-সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। আয়ুর্ব্বেদমতে জ্বরাদিরোগের কারণ বাতাদিদোষের প্রকোপ, এইজন্য আয়ুর্ব্বেদে রোগসমূহকে বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক সান্নি-পাতিক ইত্যাদিরূপে বিভক্ত করা হয়। এখানে বাতাদি ত্রিদোষের প্রকোপ

(১) যে সময় সূর্য্যদেব রস আদান বা আকর্ষণ করেন, সেই কালকে আদানকাল বলে। বর্ষাকাল বিসর্গকাল।

হয়—বলায় বুঝা যায়, বর্ষা-প্রকৃতি রোগের অনুকূল। পক্ষান্তরে অগ্নিই দেহের রক্ষক। অগ্নি দুর্ব্বল হইলে দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। তখন নানাজাতীয় মল সঞ্চিত হইয়া দেহকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। সেই সকল মলের শোধন ও অগ্নির বৃদ্ধিসম্পাদন না করিলে স্বাস্থ্য লাভ করা যায় না। দোষনাশক ও অগ্নিদীপক দ্রব্য ব্যবহার করিলেই বর্ষাসুলভ অস্বাস্থ্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইহাই সংক্ষেপে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ।

বর্ত্তমানকালে বর্ষায় যে জ্বরাদিরোগের প্রাচুর্ভাব দেখা যায়, তাহার কারণ আয়ুর্ব্বেদমতে দোষের প্রকোপ, আর তাহার মূল শীতলবাতাসসেবা, ভূবাষ্প-সংস্রব, ও উদ্ভিদণুবহুল মলিন জলপান—এবং তজ্জনিত অগ্নিমান্দ্য। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, এই কারণগুলি এড়াইতে পারিলে বর্ষাসুলভ জ্বরাদির আক্রমণশঙ্কা কমই হয়। ঠাণ্ডা বাতাস লাগায়, দূষিত জল পান করায়, ভূমি হইতে উত্থিত বাষ্প বা গ্যাস্ গায়ে লাগায়, অগ্নি-মান্দ্য হওয়ায় যে বর্ষাকালে জ্বর হইয়া থাকে, তাহা অনেক সময় অনুভব করা যায়। ইহার অতিরিক্ত কারণও থাকিতে পারে বা থাকে, কিন্তু এ কারণগুলি থাকিলেই প্রায়শঃ জ্বর হইতে দেখা যায়। ইহার অতিরিক্ত এনোফিলিশ্ নামক মশক দ্বারা বাহিত একরূপ 'বীজাণু' বর্ষাসুলভ ম্যালে-রিয়া-জ্বরের কারণ বলিয়া বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকগণ নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দ্বারা যে উক্ত বীজাণুর কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি না থাকিলে যে উক্ত বীজাণু সহজে মানবশরীরে প্রভাব বিস্তার করিয়া জ্বর আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না, তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কোনও ২ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ বলেন—"ভূবাষ্প" অর্থ ম্যালেরিয়াগ্যাস্। ম্যালেরিয়াজ্বর যে ভূমি হইতে উত্থিত দূষিতবাষ্প কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়—এরূপ ধারণা পূর্ব্বে ছিল। কিন্তু সংপ্রতি স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, "ম্যালেরিয়া বীজ" আমরা ভূমি হইতে গ্রহণ করিনা, বীজাণুবিশেষেই ম্যালে-রিয়াজ্বরের কারণ, দূষিত বাষ্প উহার কারণ নহে।" প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, আয়ুর্ব্বেদের মতে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেরূপভাবে থাকা, দূষিত জল পান না করা—সুসিদ্ধ জল পান করা, লঘু ও অগ্নিদীপক দ্রব্য আহার করা, শুষ্ক ও উন্নত স্থানে বাস করা যে এ সময় হিতকর, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আয়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থা—"অপাদচারী সুরভিঃ সততং ধূপিতাম্বরঃ। হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে বসেদ্বাষ্পশীতশীকরবর্জ্জিতে। নদীজলোদমন্থাহঃস্বপ্নায়াসাতপাংস্ত্যজেৎ।

অর্থাৎ বর্ষাকালে পাদচারে ভ্রমণ করিবে না, সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিবে, ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিবে, অট্টালিকায় বাস করিবে, নদীর জল ব্যবহার করিবে না, উদমন্থ (জল দ্বারা আলোড়িত ঘৃতমিশ্রিত শক্তু, উদমন্থ, উহা নিতান্ত গুরুপাক) ভক্ষণ করিবে না, দিনে নিদ্রা যাইবে না, বহু ব্যায়াম করিবে না, অধিকপরিমাণে রৌদ্র ভোগ (বা অগ্নিসেবা) করিবেনা। আয়ুর্ব্বেদে অন্যত্র আছে—"ভূবাষ্পপরিহারার্থং শয়ীতচ বিহায়সি" ভূবাষ্প এড়াইবার জন্য শূন্যে শয়ন করিবে। সাধারণগৃহে মাটীতে শয়ন না করিয়া খট্টায় শয়ন করা উচিত, দ্বিতল হর্ম্ম্যের উচ্চতলে শয়ন করিলে আরও ভাল। যে কোনও মতে আর্দ্রভূমিতে শয়ন-বিচরণাদি না করিলেই হইল। বর্ষায় নদীর জল মলিন ও দূষিত হয়। চতুর্দ্দিকের আবর্জ্জনা মলাদি ধৌত হইয়া এই সময় নদীতে পড়ে, এবং নদীর জল বৰ্দ্ধিত হওয়ায় তীরস্থ নানাজাতীয় উদ্ভিজ্জ জলমগ্ন হওয়ায় পচিয়া জলের বিষাক্ততা বহুগুণ বৃদ্ধি করে। সুতরাং ঐ জল ভালরূপ ফুটাইয়া ছাঁকিয়া তবে পান করা কর্ত্তব্য। বর্ষায় নানা আবর্জ্জনা পচিতে থাকে, সুতরাং যে সময় সুগন্ধ-ব্যবহার স্বাস্থ্যের অনুকূল। বস্ত্র ধূপধূমপূত করিয়া লইলে বস্ত্রলগ্ন বীজাণুসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। বস্ত্রাদি-শোধন করিতে হইলে তাহাতে ধূপ ধূম দেওয়া নূতন নয়। বর্ষায় গুরুপাক দ্রব্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য—একথা বুঝাইবার জন্যই 'উদমন্থের' কথা বলা হইয়াছে। ছাতু না খাইয়া অন্য কোষ্ঠবদ্ধতাকারক বা উদরাময়কারক দুষ্পাচ্য গুরুদ্রব্য খাওয়া যাইবে—এরূপ বুঝিলে ভ্রম হইবে। অধিক ব্যায়ামে বায়ুবৃদ্ধির আশঙ্কা, ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ও আছে। রৌদ্র লাগান ভাল নয়। পিত্তপ্রকোপও দোষাবহ। মোটের উপর লঘুভোজন ও ঠাণ্ডা এড়ান বিশেষ দরকারী। আয়ুর্ব্বেদ আরও বলেন—

আস্থাপনং শুদ্ধতনুর্জীর্ণং ধান্যং রসান্ কৃতান্। জাঙ্গলং পিশিতং যূষান্ মধ্বরিষ্টং চিরন্তনম্। মস্তু সৌবর্চ্চলাঢ্যং বা পঞ্চকোলাবচূর্ণিতম্। দিব্যং কৌপং শৃতঞ্চাম্ভো ভোজনন্ত্বতিদুর্দ্দিনে, ব্যক্তাম্ললবণস্নেহং সং শুষ্কং ক্ষৌদ্রবল্লঘু।

অর্থাৎ বমন বিরেচন প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধশরীর হইয়া বস্তিপ্রয়োগ করিবে। পুরাতন যব-গোধূম-ধান্যাদি-জাত খাদ্য, ঘৃত, মরীচ শুণ্ঠী প্রভৃতিযুক্ত মাংসরস, হরিণাদির মাংস, মুদ্গাদিকৃত যূষ, পুরাতন মধু ও মাধ্বীক অরিষ্ট, সৌবর্চ্চল লবণ ও পঞ্চকোলচূর্ণযুক্ত দধির মাত, দিব্যজল, কূপজল, ও সুসিদ্ধজল সেবন করিবে। অত্যন্ত দুর্দ্দিনে (অধিক বৃষ্টির দিনে) অম্ললবণ ও ঘৃতাদি-স্নেহযুক্ত মধুমিশ্রিত লঘুপাক শুষ্কদ্রব্য ভোজন করিবে।

অবস্থা-বিশেষে বমন, বিরেচন (দাস্ত) বস্তিপ্রয়োগ (পিচকারী দেওয়া) করিয়া শরীরের মল বা দোষের শোধন করিয়া লওয়া সঙ্গত। ম্যালেরিয়া-বহুলস্থানে বিরেচন-প্রয়োগ একান্ত দরকার। ক্ষুধামান্দ্য ও উদরে ভারবোধ এবং কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন লঘুপাক ও উপকারী। পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ একতোলা বা এক 'কোল' করিয়া লইয়া চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিলে পঞ্চকোলচূর্ণ প্রস্তুত হয়। সলবণ দধির মাতের সহিত পঞ্চকোলচূর্ণ মিশাইয়া খাইলে পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পায় ও বাতশ্লেষ্মপ্রকোপ নিবারিত হয়। বৃষ্টিসময়ে অন্তরীক্ষ হইতে পতিত জল ভূমিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে তাহাকে দিব্যজল বলে। বালুকাময় প্রদেশের কূপের জল এই সময় সুপথ্য। সুসিদ্ধ জল সর্ব্বত্র সুপেয় ও উপকারক। অত্যন্তবর্ষার দিনে ঘৃতাদিযুক্ত শুষ্ক সুমিষ্ট লঘুখাদ্য-ব্যবহার অগ্নিরক্ষার বিশেষ উপযোগী। মোটের উপর উদর পরিষ্কার রাখা, বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখা, পরিষ্কৃত শুষ্ক উচ্চস্থানে থাকা, ঠাণ্ডা হইতে সাবধান থাকা, সিদ্ধজল পান করা, লঘু সুপাচ্য ও অগ্নিকর দ্রব্য আহার করা প্রভৃতি বর্ষাকালে বিশেষ হিতকর।

শ্রী——

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুত্রের মহত্ত্বে পিতামাতার বৎসল্যের পুষ্টি, স্বামীর মাহাত্ম্যে পত্নীর প্রণয়ের পুষ্টি, তদ্রূপ ভক্তের হৃদয়ে ভগবন্মাহাত্ম্যের উদয়ে ভাবের পুষ্টিই হয়। ঐ মাহাত্ম্যবুদ্ধির উদয় না হইলে প্রেম স্থায়ী হইতে পারেনা। ব্যভিচারিণীর প্রেমই উহার দৃষ্টান্ত। ব্যভিচারিণী বহু ব্যক্তির সহিতই সঙ্গ করে, কিন্তু ব্যক্তিগত মহত্ত্বজ্ঞান না থাকায় একব্যক্তিতে প্রেম স্থায়ী হয়না। ভগবৎসম্বন্ধে ভক্তের সেরূপ ঘটেনা। কারণ, ভক্ত জানে, ভগবান্ অপেক্ষা মহান্ আর কেহই নাই, সুতরাং ভক্তের ভগবৎপ্রেম স্থায়ী। কোন কালেই উহার নাশ নাই, অবিশ্বর গাঢ় প্রেম। অধিকন্তু দেখা যায়, জার-গত প্রেম

স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে বিনিময় ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ভগবৎপ্রেম সেরূপ নহে। আপ্তকাম ভগবানেরও স্বার্থ নাই, ভগবৎপ্রীতিকাম ভক্তেরও স্বার্থ নাই। ভগবৎপ্রেমেই ভক্ত সুখী এবং ভক্তপ্রেমেই ভগবান্ সুখী। অতএব ঐ ভগবদ্ভক্তি কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহার মূলে স্বার্থ আছে, যাহার অনুষ্ঠানের মূলে উদ্দেশ্য আছে, তাহা সকাম। সকাম, নিষ্কাম হইতে স্বভাবতই নিকৃষ্ট। অষ্টাঙ্গযোগসাধক অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-লাভের জন্য যম-নিয়মাদি অনুষ্ঠান করেন। কর্ম্মযোগী স্বর্গাদিলাভের জন্য বহ্বায়াসসাধ্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

জ্ঞানযোগীকে আপাততঃ অকাম বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিও নিষ্কাম নহেন, কামনার নিবৃত্তিই তাঁহার একান্ত কামনা। নিষ্কাম শব্দের অর্থ কামনার অভাব, কামনার একান্তনিবৃত্তি নহে। কারণ, কামনার একান্তঅভাবে সাধন-চেষ্টাই বৃথা হইয়া যায়। যাঁহার কোন কামনাই নাই, তাঁহার সাধনচেষ্টাও হয় না। সর্ব্ববিধ কামনার অভাবে সাধন-প্রয়াস আকাশকুসুম-চয়নের প্রয়াস-তুল্য মিথ্যা হয়। প্রাকৃত কামই সকাম এবং অপ্রাকৃত কামই নিষ্কাম। কামাবস্থার বিশুদ্ধিতেই নির্ব্বাসনাবস্থা পর্য্যবসিত হয়। সর্ব্ববিধ প্রাকৃত-কামনা যখন অপ্রাকৃতে আত্মসমর্পণ করে, তখনই জীব নিষ্কাম হন। কামনার একান্তবিনাশচেষ্টায় জড়ত্ব অপরিহার্য্য। কামনার বিশুদ্ধিতে চিত্তের সারল্য বটে। যেখানে সাধ্য, সাধন ও ফলদাতা পৃথক্, সেই স্থানই কর্ম্ম সকাম হয়। যেখানে চারিটিই এক, সেখানে কর্ম্ম নিষ্কাম হয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর সাধ্য স্বর্গাদি সুখ, সাধন যজ্ঞাদিকর্ম্ম, ফল, স্বর্গাদি সুখ, এবং তৎফলদাতা ঈশ্বর স্বতন্ত্র। ভক্তের সাধ্য, ভগবৎ-শক্তিভূতা ভগবদ্ভক্তি, সাধন তাহাই, আবার তাহার প্রেমরূপ ফল ভক্তিরই অবস্থাবিশেষ এবং ফলদাতাও শক্তিমান্ শ্রীভগবান্, চারিটি একই পদার্থ। এজন্যই দেবর্ষি বলিয়াছেন,—

"ফলরূপত্বাৎ"

ফলরূপত্ব-প্রযুক্তই ভক্তির উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। ভক্তি স্বয়ং জ্ঞান, জ্ঞানের সাধন স্বয়ং ভক্তি, অতএব ভক্তির পৃথক্ সাধন নাই। ভক্তিই কর্ম্ম এবং ভক্তিই তাহার ফল। নৈরপেক্ষ্য ও দৈন্য ভক্তির অঙ্গবিশেষ। ঐ সকল অঙ্গ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া, একত্র সম্মিলিত হইয়া ভাবরূপে এবং ভাব গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইলে প্রেমরূপে—প্রেম ভক্তিরূপে প্রকাশিত

হয়। অতএব ভক্তিই সাধ্য, ভক্তিই উহার সাধন। হৃদয়স্থ অনুভূত ভাবই সাধ্যরূপে প্রকাশ পায়। তাহার উন্মেষের জন্য যে অনুশীলন, তাহাই সাধনভক্তি বা বৈধীভক্তিনামে কথিত হয়। অনুশীলন ব্যতীত বিবিধ সংসারভারে উহা তিরোহিত হইয়া থাকে। যাহা আছে, তাহারই বিকাশ হয়, অভাব কখনও ভাবরূপে প্রকাশ পায় না। ভাবের কোষাগার চিত্ত, উহার দ্বার খুলিয়া যেটিকে পছন্দ করিয়া লইবে, তাহাই পাইবে, অপরগুলিকে না লও, তাহারা চিরদিন আঁধার কুটীরে পড়িয়া রহিবে, স্বর্ণ তাঁবা হইয়া যাইবে। জ্ঞানী বলিতে পারেন যে, তিনি জ্ঞান-বলে নিজ গৃহে যথেচ্ছ আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ, তাঁহার তুলনায় ভক্ত নিকৃষ্ট। কারণ, ভক্ত, ঈশ্বরের ভবনে আমন্ত্রিত ব্যক্তি। আমন্ত্রিত ব্যক্তির পরিতোষ আমন্ত্রণকর্ত্তার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। যদিও আমন্ত্রণকর্ত্তার যত্নে তাঁহার তুষ্টি সাধিত হইবে ইহা স্থির, কিন্তু ঐ তুষ্টি কখনই পরিতুষ্টি বলিয়া গণ্য করা যায় না; যেহেতু ঐ তুষ্টি ভক্তের স্বাধীন নহে, উহাতে ভক্তের কর্তৃত্ব নাই। এই যুক্তি আপাতত মনোরম হইলেও উহার প্রাধান্য দেখা যায় না। কারণ, অদ্বৈতজ্ঞানীর কর্তৃত্বই স্বীকৃত হয় না। কেননা, তাঁহার অকর্তৃত্বজ্ঞানের অভ্যন্তরে কর্তৃত্বাভাস উঠিতেই পারে না পক্ষান্তরে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণকারী ভক্তের কর্তৃত্ব আপাতত সুদৃষ্ট না হইলেও মহান্ কর্ত্তার ইচ্ছার সহযোগী ভক্তের ইচ্ছা তৎকালে ঈশ্বরেচ্ছার সহিত সম্মিলিত হইয়া, উহা হইতে উত্থিত এক প্রবল কর্তৃত্বরূপে অপ্রতিরোধ্য প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অদ্বৈতজ্ঞানী আপনাকেই স্বতন্ত্র কর্ত্তা স্বরূপ ভাবেন বলিয়া তাঁহার কর্তৃত্ব বিশাল কর্তৃত্বসাগরে মিশিয়া লয় পায়, সুতরাং তজ্জন্য স্বতন্ত্র তৃপ্তি-সুখ আর উঠিতে পারে না, কিন্তু ভক্ত আপনাকে অস্বতন্ত্র কর্ত্তা ভাবেন বলিয়া তাঁহার কর্তৃত্ব বিশাল কর্তৃত্বসাগরে তরঙ্গায়িত হইয়া নূতন আকারে বিপুল পরিতোষ প্রদান করে। অতএব দৈন্য-নৈরপেক্ষমূলক ভক্তিই মুক্তিকাম ব্যক্তির একান্ত আশ্রয়ণীয়। আচার্য্যগণ ঐ ভক্তির বক্ষ্যমাণ কয়েকটি সাধন কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যদিও ভক্তিই ভক্তির সাধন, উহার পৃথক্ সাধন কিছুই নাই; তথাপি ভক্তিলাভের উপায়স্বরূপে অনুষ্ঠেয় কয়েকটি ভক্ত্যঙ্গই আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক "ভক্তির সাধন" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিষয়-বাসনাত্যাগ ও অসৎসঙ্গত্যাগ প্রথম ও প্রধান উপায়। বিষয়ের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল; সঙ্কল্পপূর্ব্বক বিষয়ত্যাগ অতীব দুরূহ। বিশেষতঃ তাহাতে ত্যাগের কামনাতে কামনা

জন্মে বলিয়া উহা পরিশেষে অমঙ্গলজনকই হইয়া পড়ে। অতএব সকল শ্রীভগবানে অর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। পশ্চাৎ চিত্তশুদ্ধি হইলে অসৎ-সঙ্গ-পরিত্যাগে সৎসঙ্গে অভিলাষ হয়। পরে সৌভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ-লাভ হইলে শ্রীভগবানের কথাদিতে রতি জন্মে। সুতরাং সৎসঙ্গ ও বিষয়ত্যাগ এই দুইটি ভক্তিলাভের উপায়। সৎসঙ্গ-গুণে ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধার অনন্তর ভজনে রতি জন্মে। রতিগাঢ় হইলে অবিশ্রান্ত-ভজনে পরম শ্রেয়োলাভ হয়। সাধুসঙ্গে ভগবদ্‌গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীভগবানে প্রেম ও অবিশ্রান্তভজনে প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত ইহলোকে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধুসঙ্গ ব্যতিরেকে যখন ভক্তির উদয় হয় না, এবং ঐ সাধুসঙ্গ-লাভ যখন ভগবদেকহৃদয় সাধুর কৃপাকেই অপেক্ষা করিতেছে, তখন ঐ সাধুকৃপা অথবা তদ্রূপে প্রকাশিত ভগবৎকৃপা ভিন্ন ভক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। সাধুসঙ্গ অতিদুর্লভ, উহা আমাদের চেষ্টায়ত্ত নহে। সাধুসকল নিষ্কাম ও স্বার্থশূন্য, তাঁহাদিগের কৃপা ভিন্ন তাঁহাদিগের সঙ্গলাভের উপায় দেখা যায় না। ঐ কৃপার কারণও অতিদুর্জ্ঞেয়। যদি সৌভাগ্যক্রমে কখনও সাধুসঙ্গ হয়, তবে তাহার ফলও অমোঘ। সাধুর সঙ্গ, সাধুর কৃপাতেই হইয়া থাকে। ভক্ত ও ভগবানে কোনই প্রভেদ নাই। শ্রীভগবান্ যাঁহার প্রতি কৃপা-প্রকাশ করেন, তিনি সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি সাধুরও কৃপা হইয়া থাকে। ভগবানের ইচ্ছা ও ভক্তের ইচ্ছা একই হইয়া যায়। ভগবানের কৃপার একটি উপযুক্ত কাল আছে। জীব যখন ভগবান্‌কে পাইবার নিমিত্ত একান্ত ব্যাকুল হয়, তখন তাহার হৃদয় দৈন্য ও নৈরপেক্ষ্যে বিভূষিত হয়। সেই সময়ই জীব সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকে। ভুক্তিকাম ও ভক্তিকাম ব্যক্তিরা একান্তচিত্তে সাধুসঙ্গই কামনা করিবেন। এ জগতে সজ্জনসঙ্গই মুহুর্ত্তের জন্য হইলেও ভবসাগর পার হইবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ হয়। অসদ্বৃত্তি-নিচয় জীবের অন্তরে তরঙ্গায়িত হইয়া দুঃসঙ্গবায়ুর আঘাতে সত্বরই উদ্বেল সমুদ্রতুল্য হয়। যে ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ আশ্রয় করে, সে মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পায়। যিনি নির্জ্জনে সাধুসঙ্গ করেন, এবং সদুপদিষ্ট ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করেন, যিনি প্রবৃত্তিমার্গের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন, স্বর্গাদি ফলে কামনাশূন্য হন, দেহ-দৈহিক-বিষয়ে বাসনারহিত হন, তিনিই সুদৃঢ় মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। যিনি দুঃখে অবসন্ন হন না, সুখে বিগতস্পৃহ, তিনিই মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

যিনি শাস্ত্রশাসনের অতীত হয়েন, তিনিই মায়াপাশ হইতে মুক্ত হন। গাঢ়ানুরাগ ভিন্ন পরম-পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না, সুতরাং রাগাত্মিকা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ঐ ভক্তিলাভে যিনি সমর্থ হইয়া থাকেন, তিনি—"সতরতি সতরতি লোকান্ তারয়তি" কেবল স্বয়ং যে ভবপারাবার উত্তীর্ণ হন, তাহা নহে, অপরকেও তিনি ভবসাগর পার করেন। বাষ্পীয় লৌহশকটবৎ স্বয়ং যান অপরকেও সঙ্গে টানিয়া লইয়া যান। প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়, উহার সাদৃশ্য না থাকায় দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝান যায় না, স্বয়ংবেদ্য বিধায় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সুতরাং উহা অনির্ব্বাচ্য, কেবল স্বসংবেদ্য। প্রেম শব্দের অর্থ ভালবাসা, কিন্তু লৌকিক ভালবাসা ও ভগবানের প্রতি ভালবাসা একরূপ নহে। লৌকিক ভালবাসা অশুদ্ধ, ভগবানের প্রতি ভালবাসা নিঃস্বার্থ-বিধায় বিশুদ্ধ। ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদন মূকব্যক্তির আস্বাদন-তুল্য।

বোবা ব্যক্তি রসনার তৃপ্তিকর বহুবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য আস্বাদন করিলেও বাক্‌শক্তির অভাবে যেমন প্রকাশ করিতে পারেনা, কিন্তু স্বয়ং আস্বাদ-জনিত প্রীতিসুখ অন্তরে অনুভব করে, তদ্রূপ ভগবৎপ্রেম যাঁহার হৃদয়ে প্রকট হয়, তিনি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ প্রেম অনির্ব্বচনীয় হইলেও প্রেমিকের সংসর্গে আপনা হইতেই হৃদয়ে প্রকাশ পায়। সংক্রামক-রোগ-বীজ সকল যেমন রোগীর অলক্ষিতভাবে শরীরে সংক্রামিত হয়, প্রেমও সেইরূপ প্রেমিকের সংস্পর্শে অলক্ষ্যভাবে ধীরে ধীরে হৃদয়-প্রদেশ অধিকার করে। ঐ প্রেম প্রাকৃতগুণ ও প্রাকৃতকামনার সম্পর্ক-শূন্য। উহা নিত্য নূতনভাবে—পরিবর্দ্ধিতভাবে আস্বাদিত হইতে থাকে। উক্ত প্রেমধারার বিচ্ছেদ নাই। উহা অতিসূক্ষ্ম অনুভব-স্বরূপ আত্মধর্ম্ম; উহা কেবল আত্মাতেই অনুভূত হইয়া থাকে। প্রেমিক যাহা দেখেন বা শুনেন, সমস্তই প্রেমময়। তাঁহার চক্ষে সংসার প্রেমের প্রতিচ্ছবি।

ভক্তি প্রাধানতঃ দ্বিবিধা, মুখ্যা ও গৌণী। তন্মধ্যে গৌণী ভক্তি সত্ত্বাদি-গুণভেদে অথবা আর্ত্তাদিভেদে ত্রিবিধা হয়। অধিকারিভেদে ভক্তও ত্রিবিধ। যিনি সাত্ত্বিক অধিকারী, তিনিই জিজ্ঞাসুভক্ত, যিনি রাজসিকভক্ত তিনি আর্ত্ত, যিনি তামসিক ভক্ত তিনি অর্থার্থী। পরবর্ত্তী অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। অর্থার্থী ভক্ত তামসভক্ত। অর্থ-কামনাবশেই তিনি ভগবানের ভজনা করেন। প্রার্থিত অর্থের অভাব না হইলে তিনি ভগবানের ভজনা করেন কিনা সে পক্ষে সন্দেহ। অধিকন্তু অর্থলাভে অহঙ্কার জন্মিলে, তাঁহার ভগবানের

স্মরণ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর্ত্তও আর্ত্তি অর্থাৎ দুঃখ ব্যতীত ভগবদ্ভজনা করেন না। কিন্তু তিনি বিপৎ হইতে নিস্তার পাইলে আর অহঙ্কার প্রকাশ করেন না। অধিকন্তু তদবস্থায় স্বীয় হীনতা অনুভব করতঃ শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। তুলসীদাসও বলিয়াছেন—

সুখ মে লোক্ হরি ভজেঁ,
দুখ্ মে ভজে কোই ?
যো দুখ্ মে হরিকোঁ ভজন কিয়ে,
উস্‌কো দুখ কাঁহাসে হোই ?

খাঁটি কথা, সুখে দুখে প্রাণের প্রাণ জীবনসর্ব্বস্ব হরিকে ভজনা না করিলে সেই অন্তর্যামী দেখা দিবেন কেন ?

জিজ্ঞাসু নিষ্কামভক্ত, তাঁহার ভক্তি ভগবান্‌কে পাইবার জন্য, যথার্থ আত্মজ্ঞানের জন্য। জিজ্ঞাসুর শ্রীভগবান্ হইতে তৎপ্রসাদ-সুখ-ভোগ-কামনা আদৌ থাকেনা, সুতরাং জিজ্ঞাসুভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সাধন, জ্ঞান, কর্ম্ম, তপস্যা, ধ্যান, দান প্রভৃতি সমস্তই দোষদুষ্ট ও দুঃখপ্রদ, একমাত্র ভক্তিই সুখকর ও উহা ভগবানের স্বরূপ-শক্তি এবং ভগবদ্বশীকারিণী শক্তি। আবার অন্যান্য সাধনমার্গে বিঘ্নাশঙ্কা আছে, ভক্তিমার্গে তাহা নাই। ভক্তি একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হইলে সত্বরই হউক্, বা বিলম্বেই হউক্, উহা ভগবৎপ্রাপ্তি-ফল উৎপাদন করিবেই। অন্যমার্গে পতনাশঙ্কা আছে, ভক্তিমার্গে কোনও আশঙ্কা নাই। ইহা বিশেষ সুলভ। একমাত্র ভগবানের "নাম" আশ্রয় করিলেই যথেষ্ট। শ্রীহরির নাম অসীমশক্তিময়। নাম ও নামীর অভেদ। কেবল নামাশ্রয়ের ফলে কতশত মহাত্মা জীবন্মুক্ত হইয়া গিয়াছেন। যবন হরিদাস প্রভৃতি নাম-মাহাত্ম্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। আর বেশী কিছু না, "আমি তোমার, তুমিই আমার প্রাণসর্ব্বস্ব" এইটুকু মনে ভাবা, আর আকুলপ্রাণে ডাকা। ইহাপেক্ষা সহজ সাধন আর কি হইতে পারে ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বাঙ্গালীর বীরত্ব।

কুট্‌এল্‌আমরা হইতে ওয়াই এম্ সি র শ্রীজগদীশচন্দ্র দে সংবাদপত্রে যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাতে দেখা যায়—যে সমস্ত বাঙ্গালীসৈন্য জুলাইমাসে যুদ্ধ করিবার জন্য কূট্‌এল্‌আমরা হইতে বাকোবা গিয়াছিল, তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ৫০০ তুর্কসৈন্য বন্দী করিয়াছিল এবং কতক্‌-গুলি কামানও দখল করিয়াছিল। তিনকড়ি এবং ধীরেন্দ্র ঘোষ নামক দুইজন সৈনিক, আহত বৃটিশ অফিশারকে রক্ষা করায় প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়াছিল। বঙ্গবাহিনী জয়যুক্ত হউক।

প্লাবন।

অতিবৃষ্টির ফলে রাজসাহীজেলার নওগা মহকুমার প্রায় সমস্তস্থানে প্লাবিত হইয়াগিয়াছে। নাটোর অঞ্চলেও প্লাবনকষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছে। রাজসাহীর মান্দা, নওগা, নন্দলালী, পাঘুনুর ও বাগমারা থানার অধানস্থ গ্রাম-সমূহের প্রায় দশসহস্র লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। ঐ সকল স্থানের লোকের যে সব পাকা বাড়ী ছিল, তাহার শতকরা ৭৫টী পড়িয়াগিয়াছে। শস্যাদি এবং গৃহদ্রব্য ভাসিয়া গিয়াছে। গৃহপালিত পশ্বাদিও অনেক জলে ভাসিয়া গিয়াছে। এ কি দুর্দ্দৈব! ভগবান্ রক্ষা করুন।

বস্ত্রসমস্যায় জটিলতা।

সমাচারপত্রে প্রকাশ—সম্প্রতি বরিশালের বস্ত্রব্যবসায়ীরা ধুতির মূল্য এক-টাকা চড়াইয়া দিয়াছে। এ অনিষ্টপাতের কি প্রতিকার নাই? এখনও স্বাবলম্বী হইবার জন্য চেষ্টা করা সঙ্গত।

রুসিয়ায় ঘনঘটা।

রুসিয়ার গগনমণ্ডলে বিপ্লবের ঘনঘটাচ্ছটা প্রকাশ পাইয়াছে। সংপ্রতি বিপ্লবকারিদলের এক রমণী রুষপ্রজাতন্ত্রের অন্যতম নেতা মিঃ লেনিন্‌কে গুলি করিয়াছে। মিঃ লেনিনের প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। অপরদিকে পঞ্চসহস্র বিপ্লবকারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। রুসিয়ায় দুর্দ্দিনের অন্ধকার ক্রমে অধিকতর বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। কে জানে ইহার পরিণতি কোথায়?

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

---

২৫ বর্ষ, ২৫শ খণ্ড ৭ম সংখ্যা।	কার্ত্তিক।	১৩২৫ সাল। ১৮৪০ শকাব্দ।

পর্য্যটনে প্রাণের উচ্ছ্বাস।

(১)

কনৌজনগর হায়! ছিল কিবা শ্রী-সুন্দর,
সুরম্য উদ্যান কত, কত রমণীয় সর!
গঙ্গাতীরে অবস্থিত,
বহুদূর সুবিস্তৃত,
কান্যকুব্জ * কি সুন্দর ছিল আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে;
অধিবাসিবৃন্দ যথা যথা-সাজিত কৌশেয়-সাজে,

---

* 'Hiuen Tsang found the kingdom of Kanyakubja 800 miles in circuit, and the wealthy capital four miles in length and one in breadth. 'The city had a moat around it, and strong and lofty towers facing each other. The flowers and woods, the lakes—and ponds, bright, pure and shining like a mirror, were seen on every side. Valuable merchendise was collected here in great quantities. The people were well-off and contented, the houses were rich and well found. Flowers and fruits abounded in every place, and the land was—sown and reaped in due seasons. The climate was agreeable and soft, the manners of the people honest and sincere,

(২)

বিদ্যা আর শিল্প চর্চ্চা করি কাটাইত কাল,
তাহাদের বিভবাদি ছিল কিবা সুবিশাল ;
শতাধিক বৌদ্ধ মঠ,
যেন সুচিত্রিত পট—
বিরাজিত সে নগরে ধরি শোভা অনুপম,
অযুত শ্রমণ যথা পালিত বুদ্ধ-নিয়ম।

(৩)

সহস্রে সহস্র ভক্ত রত থাকি বেদগানে,
ঢালিত অমৃতধারা যেখানে হিন্দুর প্রাণে ;
শত শত দেবালয়,
কত রম্য হর্ম্ম্যচয়,—
শোভিত তথায় যেন স্বরঞ্জিত চিত্রখানি,—
হিন্দুর গৌরবস্থল—শ্রীহর্ষের রাজধানী।

They were noble and gracious in appearance. For clothing they used ornamented and bright shining fabrics. They applied themselves much to learning, and very much given to discussion on religious subjects. The fame of their pure language was far spread. The believers in Buddha and the Hindus were equal in number. There were some hundred Sangharams with 10,000 priests. There were 200 Deva-temples with several thousand followers." Vide-Later Hindu Civilisation Pages 140, 141-by R. C. Dutt.

Again :— "The great development of the city (of Kanouj) clearly was due to its selection by Harsha for his capital. When Hiuen Tsang stayed there in 638 and 643 a great change has occurred since Fa-hien's time. The later pilgrim, instead of three monasteries, found upwords of a hundred such institutions, crowded by more than 10,000 brethern of both the great schools. Hinduism flourished as well as Buddhism, and could show more than 200 temples, with thousands of worshippers. The city which was strongly fortified with seven forts, extended along the east bank of the ganges for about four miles, and was adorned with lovely gardens and clear tanks. The inhabitants were well-to do ; they dressed in silk and were skilled in learning and the arts." Vide-Vincent Smith's Early History of India-Pages 347, 348, Second Edition.

(৪)

শতদলে পূর্ণ কত শত সুমনোজ্ঞ সর
শোভিত সতত তথা—দর্পণ-সম ভাস্বর ;
মঞ্জু কুঞ্জবন কত
হ'ত নেত্রপথ-গত
পুষ্প-সুষমায় মুগ্ধ করি' সদা প্রাণ-মন ;
সন্তোষে কাটা'ত কাল যত নাগরিকগণ ;

(৫)

সদ্ভাব-মণ্ডিত সবে, রূপে গুণে দেবোপম,
সমুজ্জ্বল বাসে সদা সাজিত কি মনোরম !
ছিল শাস্ত্রচর্চ্চা-রত,
অবিরত ধর্ম্মব্রত,
দেবভাষা-ভাষী সবে, ঋষিকল্প মহিমায় ;
সমাবৃত সে নগর পূর্ণ-জ্ঞান-গরিমায়।

(৬)

সপ্ত সুগঠিত দুর্গে ছিল যাহা সুরক্ষিত,
নিষ্ঠুর 'মামুদ' তাহা আক্রমিল আচম্বিত ;
বিধির অপূর্ব্ব বিধি,—
পাইতে মন্দির-নিধি
পাপাচার রাজ্যপাল মিলিল 'মামুদ' সনে,
স্বয়ং খুলি দুর্গদ্বার আনে শত্রু স্বভবনে। *

* "The pusillanimous submission of Rajyapala, incensed his Hindu allies, who felt that he had betrayed their cause. His fault was sternly punished by an army, under the command of Vidyadhara, heir apparent of the Chandel king Ganda, supported by the forces of his feudatory, which attacked Kanouj in the spring or summer of 1019 A. D. soon after the departure of Sultan Mahmud, and slew Rajyapala, whose diminished dominions passed under the rule of his son Trilochanpala. Mahmud, laden with booty quickly returned to Ghazni." Vide Vincent Smith's History, Page, 354.

(৭)

হিন্দুর মস্তকে করি কিবা ঘোর বজ্রাঘাত,
মন্দিরের নিধি যত, করে দোঁহে আত্মসাৎ।
মন্দির লুণ্ঠন করি,
হিন্দু-দেশ পরিহরি,
অতি শীঘ্র পলাইল গজনীর সুলতান,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি সমাপিল অভিযান।

(৮)

কিন্তু ক্ষমা না করিল হিন্দু-নরপতিগণ,
'রাজ্যপালে' আক্রমিল হ'য়ে সবে একমন;
'গণ্ডের' সুপুত্র ধীর
'বিদ্যাধর' মহাবীর,
বিনাশিয়া 'রাজ্যপালে' করিয়া সম্মুখ-রণ,
ধর্ম্মের সুদৃঢ়ভিত্তি করে পুনঃ সংস্থাপন।

(৯)

ছয়বর্ষ পরে পুনঃ করি গুপ্ত অভিযান,
সোমনাথ আক্রমণ * করে তুর্ক সুলতান্;
ধন-রত্নে পরিপূর্ণ,
মন্দির করিয়া শূন্য,
বিগ্রহটী করি চূর্ণ, পলাইল নিজদেশে;
কিন্তু হিন্দু তা'র সৈন্য বিনষ্ট করে নিঃশেষে।

* সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক সোমনাথ-মন্দিরের লুণ্ঠন-সংবাদ দেশে ব্যাপ্ত হওয়া মাত্র, হিন্দুগণ এতদূর ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, নিরস্ত্র ও নিরীহ গ্রামবাসিগণ, রাজা সেনাপতি সৈন্য কাহারো অপেক্ষা না করিয়া, পঙ্গপালের ন্যায় মামুদের সৈন্যের উপর পড়িতে আরম্ভ করেন। লুণ্ঠিত রত্নরাজী ও কতিপয় সেনানিকসহ মামুদ অতিকষ্টে দ্রুতগামী সিন্ধুদেশীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন করেন; কিন্তু পঙ্গপালের ন্যায় গ্রামবাসিগণের আক্রমণে মামুদের সৈন্যদলের একটী লোকও গজনীতে ফিরিতে পারে নাই। বিগ্রহ চূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া, মামুদের সৈন্যদলের প্রত্যেক লোককে ধর্ম্মপ্রাণ-হিন্দুগণ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া লগুড়াঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে কয়েকখানি "গাথা" গুজরাটের সম্ভ্রান্ত-ঘরে আজিও বিদ্যমান আছে, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, কবিতা হইলেই তাহা যে অবিশ্বাস্য!!!

(১০)

চিরতরে হতবল হ'য়ে তুর্ক-সুলতান্,
আর কভু এ ভারতে করে নাই অভিযান ;
দেড়শত বর্ষকাল
ঘটে নাই এ জঞ্জাল,
ভারত হইল পুণ্য জ্ঞান ও গৌরবাধার,
ভারতের যশঃপ্রভা ব্যক্ত হ'ল পুনর্ব্বার।

আমরা আরো দেখিতে পাই যে, সুলতান মামুদ যদিও সপ্তদশবার ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন, তথাপি মন্দিরাদি লুণ্ঠন করিয়া অতি শীঘ্র স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া ভিন্ন, ভারতের কোনো প্রদেশে তিনি নিজ অধিকার বিস্তৃত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তাঁহার শেষবার ভারত আক্রমণ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে। সেই সময়ের সোমনাথের মন্দির-লুণ্ঠন যদিও মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বীর-কীর্ত্তি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তথাপি পরবর্ত্তী অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায় যে, মামুদের সপ্তদশবার ভারত-আক্রমণের ফলে, ভারতের আর্থিক ক্ষতি ভিন্ন, বলহানি ঘটে নাই ; পক্ষান্তরে গজনীর গুরুতর বলহানি সংঘটিত হইয়াছিল ; কেননা ঐ ১০২৪ খৃষ্টাব্দের পরে ১৬৭ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১১৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর কোনো মুসলমান্‌সৈনা ভারতে আসিতে সাহসী হয় নাই। গজনীর সুলতান্ ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া একেবারে পর্য্যুদস্ত না হইলে এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায় ? সবক্তিগীন এবং তৎপুত্র মামুদ তুর্কীবংশীয় নরপতি ছিলেন ; ভারতের হিন্দুর সহিত যুদ্ধে তাঁহাদের এতদূর বলক্ষয় হইয়াছিল যে, বহুকাল চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের বংশাবলী পূর্ব্ববল সঞ্চয় করিতে পারেন নাই ; অধিকন্তু আফ্‌গানবংশীয় নরপতির প্রথম আক্রমণেই তুর্কীবংশীয় রাজা স্বীয় রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন, এবং তদবধি ঐ বংশের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে লুপ্ত হইয়াছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, ১০২৪ খৃষ্টাব্দের পরে এই ১৬৭ বৎসরের মধ্যে, হিন্দুনরপতিগণ স্বাধীন থাকিয়া, বহু মন্দির, দুর্গ, নগর ও অন্যান্য কীর্ত্তি-স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই ১৬৭ বৎসরের মধ্যেই অনঙ্গপাল দিল্লীতে সুবিখ্যাত লালকোট-দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ; এই ১৬৭ বৎসরের মধ্যেই ধারানগরীর অধিপতি সুপ্রথিত বিদ্যা-বীরত্ব-যশো-বিমণ্ডিত ভোজরাজ মালব প্রদেশে ভোজপুর-সরোবর নির্ম্মাণ করেন ; ভোজপুর-হ্রদ বাস্তবিক জগতে অদ্ভুত কীর্ত্তি ; উহার গৌরব আগরার তাজমহল অপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈদেশিক রাজা ভোজের সেই অপূর্ব্বকীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক কীর্ত্তির বিষয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, সবক্তিগীন

(১১)

পূর্ব্বপুরুষের পাপে হ'য়ে অতি বিমলিন,
রাজ্যপাল-বংশধর সবে ক্রমে হ'ল দীন।
তা'দের উচ্ছেদ করি,
তীব্রতেজে অসি ধরি
সংস্থাপিল নবরাজ্য—পরাক্রান্ত সুবিশাল—
ঘাড়োয়াল-বংশোদ্ভূত * 'চন্দ্রদেব' মহীপাল।

(১২)

কান্যকুব্জ, বারাণসী, দিল্লী ও অযোধ্যা আর,
একছত্রে সুশাসিত হ'ল সুখে পুনর্ব্বার।
আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যধামে,
'গোবিন্দচন্দ্রের' নামে
জয় জয় মহারবে হ'ল ঘোষণা বিপুল;
'গোবিন্দের' ভূমি-দান সত্যই ভবে অতুল।

ও মামুদ কর্তৃক ভারতবিজয়ের কথা, "উপকথা" ভিন্ন প্রকৃত ইতিবৃত্ত হইতে পারেনা; তাঁহাদের ঘোরতর পরাজয়ই কর্ম্মফলানুসারে প্রকৃত ইতিবৃত্ত বলিয়া অনুমিত হয়। হিন্দুগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা প্রকৃত ইতিবৃত্তই কাব্যাকারে লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপ কাব্যাকারে লিখিত ইতিহাসের প্রতি, বর্ত্তমান ঐতিহাসিক লেখকগণের আদৌ আস্থা নাই, ইহাই পরিতাপের বিষয়। লেখক।

* "The next recorded event is the seizure of the latter city (Kanouj about 1090 A. D. by a Raja of the Gharwar clan, named Chandradeva, who established his authority certainly over Beneras and Ajodhya, and perhaps over the Delhi territory. × × × Govinda Chandra, grandson of Chandradeva, enjoyed a long reign, which included the years 1114 and 1154 A. D. His numerons landgrants and widely distributed coins prove that he succeeded to a large extent in restoring the glories of Kanouj, and in making himself a power of cousiderable importance.. × × × The grandson of Govindachandra was Joy Chandra, whose daughter was carried off by the gallant Rai Pithora of Ajmere: After the conquest of Kanouj in 1193. Joy Chand retired towords Beneras, but was overtaken and slain. Thus ends the story of kanonj." See Vincent Smith—Pages ২৫৫ and ২৫৬.

(১৩)

কনৌজের যশঃপ্রভা উজলিল পুনর্ব্বার;
কিন্তু চক্রনেমী-তুল্য ঘুরিতেছে এ সংসার—
কনৌজের যশোগর্ব্ব
তাই ক্রমে হ'ল খর্ব্ব;
রাজা 'জয়চাঁদ' যবে বসেছিল সিংহাসনে.
কনৌজের দুর্দ্দশায় কত দুঃখ আসে মনে।

(১৪)

'বিগ্রহরাজের' বংশে শাকম্ভরি-অধিপতি,
জন্মিল অতুল বীর 'পৃথ্বীরাজ' * নরপতি;
বীরের সমাজে ধীর,
রণে—যিনি চিরস্থির,
তলাবাড়ী রণক্ষেত্রে কর্ণালের পূর্ব্বপাশে,
বিপুল মস্‌লেমসৈন্য যে বীর অনা'সে নাশে;

* পৃথ্বীরাজ বিগ্রহরাজের সহোদর সোমেশ্বরদেবের পুত্র। "The nephew of this literary warrior (Vigraharaja) was Prithviraja, Prithviraj or Rai Pithora—lord of Sakambhari, Delhi and Ajmere, famous in song and story, as a chivalrous lover and doughty champion. His fame as a bold lover rests upon his during abduction of the not unwilling daughter of Jai Chand. His reputation as a general is securely founded upon the defeat of the Chandel Raja Parmal by him and the capture of Mahoba in 1182, as well as upon gallant resistance to the flood of Muhammadan invasion. Indeed Rai Pithora may be described with justice as the popular hero of Northern India, and his exploits in love and war are the subject of rude epics and bardic lays to this day. In 1191 A. D, Prithiraj succeeded in inflicting a Severe defeat upon the Musalman invaders, at Tarain or Talawari between Thaneswar and Karnal, which forced them to retire beyond the Indus. × × × Prithiraj having been finally taken prisoner (*in battle*) was executed in cold blood. × × × A Hindu tale, that Prithiraj was taken to Ghazni where he shot the Sultan dead and was then cut to pieces, is false; *but one should like to know why*"— See Vincent Smith—Pages 357, 358. The italics are ours.

(১৫)

কাব্য, ইতিহাসে গাঁথা বীরত্ব-কাহিনী যার,
সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হ'ল যার যশোভার,
প্রেমের দেবতা বলি'
লভিত যে গীতাঞ্জলি,
সেই 'পৃথ্বীরাজ'সহ করি ঘোর বিসম্বাদ
অপদার্থ 'জয়চাঁদ' ঘটাইল কি প্রমাদ।

(১৬)

কত শত দুঃখ-গাথা জাগে মনে আসি,
কত হিন্দুকীর্ত্তি নষ্ট করেছে বিদেশী!
মালবেতে মহাতেজা
ধরাধিপ ভোজরাজা *
প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ করিল রাজত্ব
দেখাইল নানাগুণে অশেষ মহত্ত্ব।

* "The nephew of Munja the famous Bhoja, ascended the throne of Dhara, which was in those days the capital of Malwa, about 1018 A. D. and reigned gloriously for more than 40 years. Like his uncle, he cultivated with equal assiduity, the arts of peace and war. × × × Although his fights with the neighbouring powers, including one of the Muhammadan armies of Sultan Mahmud of Gazni, are now forgotten, his fame as an enlightened patron of learning and a skillful author remains undimmed. and his name has become proverbial as that of a model king according to the Hindu Standard. Works on astronomy, architecture, the art of poetry and other subjects are attributed to him. and there is no doubt, that he was a prince, like the famous Samudra Gupta, of very uncommon ability. × + × A mosque at Dhara now occupies the site of Bhoj's Sanskrit College, which seems to have been held in a temple dedicated appropriately to Sarasvati, the goddess of learning." See Vincent Smith's History—Page 365.

Again ;— "The mosque known as Raja Bhoj's School was built out of Hindu remains in the 14th or 15th century : its name is derived from the slabs, covered with inscriptions giving rules of Sanskrit grammar, with which it is paved."—See The Encyclopedia Britannica—11th Edition—Vol VIII, Page 142.

(১৭)

রণস্থলে ভোজরাজা হ'লে আগুসার,
শত্রুসৈন্য কখনই পেত না নিস্তার।
গজনীর সুলতান্
ক'রে ছিল অভিযান
ভোজের রাজ্যেতে যবে বিমুদ্ধের মত,
ভোজের বিক্রমে তা'র সৈন্য হ'ল হত।

(১৮)

যুদ্ধকালে পরাক্রম আছিল বিশাল,
কিন্তু রণরঙ্গে ত'ার কাটে নাই কাল ;
নানা-বিদ্যা-বিমণ্ডিত
ভোজ ছিল সুপণ্ডিত ;
যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, কাব্য, ইতিহাস,—
স্বরচিত নানাগ্রন্থ করেছে প্রকাশ ; *

(১৯)

বীণাপাণি সরস্বতী পূজি ভক্তিভরে,
সারস্বত-বিদ্যালয় স্থাপে সমাদরে
ধারা-নগরীর মাঝে,
সাজিত তা' কিবা সাজে,
হায় কি দুঃখের কথা, বুক ফেটে যায়,
সে মন্দির ভগ্ন, এবে মসজিদ্ তথায় !!

* "A treatise based on the Brahma-Siddhanta of Brahmagupta and which recognizes the standard sidereal solar year to be of 365 days, 6 hours, 12 min. 30. 915 Seconds in attributed to king Bhoja, of which the epoch, the point of time used for calculations, falls in A D. 1042." See—The Encyclopedia Britannica—11th Edition—Vol XIII, Page 492.

"The সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ (the neck-arnament of Sarasvati—the goddess of eloquence), a treatise in five chapters on poetics generally, remarkable for its wealth of quotations, is ascribed to king Bhoja himself."—The Encyclopedia Britannica 11th Ed. Vol, XXIV, Page 182,

(২০)

কত রাশি রাশি গ্রন্থ জ্ঞানের অর্ণব,
করিল সংগ্রহ তাহে ভোজ বিদ্যার্ণব ;
অবিদ্যা-মল-বিনাশী
সেই সব গ্রন্থরাশি
ভস্মসাৎ করেছে গো বৈদেশিকগণ,
সে মন্দির ভগ্ন করি মসজিদ্-গঠন।

(২১)

স্থাপত্য-বিদ্যার গ্রন্থ করি বিরচন,—
গ্রন্থেতে নিবদ্ধ বিদ্যা জানি অকারণ
প্রয়োগি তা' কর্ম্মক্ষেত্রে,
রচিয়া ভূপাল-ক্ষেত্রে
মনোরম সরোবর আনন্দ-আধার,
সেধেছিল সে দেশের কত উপকার!

(২২)

ভোজপুর-হ্রদ * ছিল যে কীর্ত্তি অতুল,
হইতে কি পারে কিছু তা'র সমতুল ?
সুবিস্তীর্ণ সমতলে,—
পর্ব্বত-বেষ্টিত স্থলে,
পর্ব্বতে পর্ব্বতে করি দৃঢ় সংযোজন,
রচিল অপূর্ব্ব সর সুন্দর-গঠন।

* "The great Bhojpur Lake, a beautiful Sheet of water to the southeast of Bhopal, covering an area of two hundred and fifty Square miles, formed by massive embankments, closing the outlets in a circle of hills was his noblest monument. and continued to testify to the skill of his engineers. until the fifteenth century, when the dam was cut by order of a Muhammadan king. and the water drained off. The bed of the lake is now a plain intersected by the Indian midland Railway."—See Vincent Smith's History Page 366.

(২৩)

কত শত শত শিল্পী করিয়া নিয়োগ,
ভূধরে ভূধরে করে কি সুন্দর যোগ;
করি রব কল্ কল্
ঢালে জল অবিরল
সেই সমতলে যত গিরি-নদীচয়;
বিমল সলিলে হ্রদ ক্রমে পূর্ণ হয়।

(২৪)

এ হেন সুন্দর হ্রদ রচেছে কে কবে?
এ হেন সুন্দর সর আর কি গো হ'বে?
কত শত প্রাণী মিলি
সে সরে করিত কেলি,
কত জীব তাহে তৃষ্ণা করেছে গো দূর;
ভোজরাজা লভিয়াছে কি পুণ্য প্রচুর!

(২৫)

কিন্তু হায়! পাষণ্ডের দেখ পাপাচার;
এই যে সুন্দর কীর্ত্তি আনন্দ-আধার,
প্রাণ-মনোমুগ্ধকর
এই যে বিমল সর
বিনষ্ট করিল ইহা যেই মূঢ়জন,
নিশ্চয় মানব নয় দানব সে জন!

শ্রীপ্রিয়লাল ঘোষ।

---

* ইতিহাসপাঠে পূর্ব্বতন বিদেশী আক্রমণকারিগণকে অতিশয় ক্রূর, অবিমৃশ্যকারী ও অবিবেক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায়। যে সমস্ত কীর্ত্তি নষ্ট হইলে আর তাহার পুনরুদ্ধারের আশা থাকেনা, ভারতের সেই সমস্ত প্রাচীন-কীর্ত্তি-লোপ করা এবং ভারতের অতীত ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন করার অপরাধে, তাঁহারা যে কত অপরাধী, তাহা ভাবিতে গেলেও মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়। যে সমস্ত অর্ব্বাচীন বালক "বিদেশীর শাসন" বলিয়া ব্রিটিশ-শাসনকে ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল-শাসনের সহিত তুলনা করিতে অগ্রসর হয়, তাহারা যদি নিতান্ত হিতাহিতজ্ঞানশূন্য না হয়, তবে তাহারা

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

স্বপ্ন ব্যাপারটা কি, তাহার প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ হইয়া থাকে। সকলেই অনুভব করেন,—স্বপ্নে কোনও ভীষণকাণ্ড দেখিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়; "উচ্চ হইতে নীচদেশে পতিত হইতেছি" এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে, প্রকৃত অবস্থায় হঠাৎ নিম্নপতনে শরীরে যেরূপ ধাক্কা লাগে, স্বপ্নেও সেইরূপ হইয়া থাকে। কোনও স্বপ্ন প্রত্যক্ষের ন্যায় অচিরে ফল প্রদান করিয়া থাকে, কোনওটী বা নিষ্ফল হয়। চক্ষু মুদ্রিত, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও প্রসুপ্ত; অন্ধকারগৃহে কবাট্ জানালা রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছ; দেখিবে, দেশ-দেশান্তরে গমন করিতেছ, সমুদ্র পার হইতেছ, সুমেরু-শিখরে আরোহণ করিতেছ,—এই সকল ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের হেতু কি?

আপনা হইতেই ঐ সমস্ত স্বার্থপর রাজগণের সহিত বর্ত্তমান ইংরাজরাজার বিস্তর প্রভেদ দেখিতে পাইবে। ঐ সমস্ত রাজা ভারতের কীর্ত্তি-নাশকারী; আর ইংরাজ শিক্ষা-দীক্ষা-রক্ষা নানা উপায়ে ভারতের কীর্ত্তি-বর্দ্ধনকারী। হায়! কত যত্নে ব্রিটিশরাজ প্রাচীন ভগ্নকীর্ত্তিগুলির রক্ষাকল্পে তৎপর হইয়াছেন! প্রাচীন অতুল কীর্ত্তিগুলি দেখিতে পাইলে ইহারা যে কি যত্ন করিতেন, তাহা কল্পনায়ও আনা যায় না। যে সমস্ত অবিমৃশ্যকারীর হাতে পড়িয়া, বিদ্বজ্জন-পরিসেবিত বহুমূল্য পুস্তকাগার-সমন্বিত টলেমিগণের অতি আদরের নগর আলেকজেণ্ড্রিয়া (Alexandria) ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, পুস্তকালয় ভস্মসাৎ হইয়াছিল, মনস্বিনা বিদুষী হাইপেশিয়া (Hypatia) নিহত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার মৃতদেহটা পর্য্যন্ত বীভৎসরূপে অপমানিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত অবিবেচককে বর্ত্তমান বিদ্বৎকুল কি মধুরবাক্যে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন? ম্লেচ্ছ হিন্দু ও যবন একজাতি। এস্থলে জাতিগত বিদ্বেষ কিরূপে আসিতে পারে? মনুসংহিতায় পাই যে, যবনেরা ক্ষত্রিয়। ইতিহাস আলোচনা করিয়াও বুঝিতে পারা যায় যে, যবনেরা ক্ষত্রিয়, মূলতঃ হিন্দু, এবং ভারতের ক্ষত্রিয়গণের জ্ঞাতি ভিন্ন অন্য-জাতীয় লোক নহেন। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, তাঁহারা "ব্রাত্য" রহিয়া গিয়াছেন, বেদবিহিত সংস্কারের অভাবে হিন্দুনামে পরিচিত হইতে পারেন নাই। ধাতুপাঠে দেখিতে পাই,—"ম্লেচ্ছ অব্যক্তায়াং বাচি" যে সমস্ত ক্ষত্রিয় সংস্কারাভাবে দেবভাষা বা সংস্কৃতভাষা গ্রহণ করেন নাই, স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষা-ভাষী রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই ম্লেচ্ছ। দেবভাষাভাষী ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিতেন। এইরূপ ক্রম-পরিণতির ফলে, গান্ধার তাতার প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ পূর্ব্বে ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা

জীবনে যাহার সহিত দেখা নাই, যে কথার আলোচনা নাই, কখনও যাহা ভাব নাই, এমন বিষয় হঠাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করিতেছ; "আমি শুইয়াছি, স্বপ্ন দেখিতেছি" এইরূপ প্রকৃতজ্ঞান উদিত হইলেও সেই অচিন্তনীয় অভাবনীয় বিষয় সকল আসিতেছে ও যাইতেছে। কোনও স্বপ্ন আদ্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ, কোনওটী বা একান্ত সামঞ্জস্যবিহীন; এই অদ্ভুত প্রহেলিকার উত্তর কি?

কালক্রমে ম্লেচ্ছদেশ বা যবনদেশে পরিগণিত হইয়াছে। এইরূপে যে জাতি এক দেশবাসী ও একধর্ম্মাবলম্বী ছিল, ধর্ম্মবিপ্লবের ফলে, দেশের অংশ-বিশেষ দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সেই একজাতি হইতেই পৃথক্ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। মূলতঃ ভাই ভাই, কালক্রমে ঠাঁই ঠাঁই হইয়াগিয়াছেন। বর্ত্তমানে অবাধশিক্ষার ফলে আবার আমরা ভাই ভাই মিলি-বার সুযোগ পাইয়াছি; তাই বলিতেছি,—এস ভাই অহিন্দু! এস ভাই হিন্দু! এক সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া আবার আমরা আমাদের একজাতীয়তা উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করি। এই ভারতে বর্ত্তমানে বহুধর্ম্ম বিদ্যমান আছে; তবে "আমি হিন্দু, তুমি অহিন্দু" বলিয়া কেন আমরা একজাতীয়তা ভুলিয়া পৃথক্ রহিব—কেন আমাদের একজাতীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিব না? ইতিহাস খুলিয়া দেখিলে আমরা যে একজাতি, তাহা সহজেই হৃদয়ে পরিস্ফুট হইবে। ধর্ম্মবেত্তা, ইতিবৃত্তবেত্তা, মনস্বী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াগিয়াছেন যে, তুর্ক-যোদ্ধ্গণ যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহাদের শাসনাধীনে থাকিয়া বৌদ্ধ বা বৈদিকধর্ম্মাচারী অনেক হিন্দুও মুসলমান্ হইলেন, এবং ঐ সমস্ত হিন্দুগণের সহিত, পৈতৃকধর্ম্মে স্থিত অপর অংশের মর্ম্মান্তিক বিরোধের নামই ভারতবর্ষে মুসলমান্ আক্রমণ বিজয় ও সাম্রাজ্য-সংস্থাপন। জিজ্ঞাসা করি, সহস্রবর্ষ বিরোধ ও ধর্ম্মবৈষম্যের ফলে কি বহুসহস্রবর্ষের একজাতীয়তা কখনো লুপ্ত হইতে পারে? এই গভীর সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি একবার আমরা অন্তরের পূতিগন্ধ দূর করিতে চেষ্টা করি, তবে তন্মুহূর্ত্তেই এই একজাতীয়তার সুফল সমগ্র ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইবে। ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ভারতের জনপ্রিয় রাজপ্রতিনিধি Lord Hardinge বিদায়কালীন অভিভাষণে বলিয়া গিয়াছেন;—

I have trusted India, I have believed in India. I have hoped with India, I have feared with India. I have rejoiced with India; and in a ward I have identified myself with India. India's response has been a wanderful revelation to me; and sometimes I feel as if she had in return confided her very heart to my keeping.—

এই মহাবাক্যগুলি সকলে স্মৃতিপটে সুচিত্রিত রাখিও। অশোক, বিক্রমাদিত্য, ভোজ, আকবরসাহ, সাজেহান, Ripon, Hardinge প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় শাসকমণ্ডলীর নীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও, সত্যের সম্মুখীন হও অচিরে দেখিতে পাইবে যে আবার ভারতের হিন্দু-অহিন্দু জগদ্গুরু-পদে অভিষিক্ত হইবে।　　　　লেখক।

দার্শনিকগণ. জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থা বর্ণনা করেন; স্বপ্ন তাহার দ্বিতীয় অবস্থা। পাতঞ্জলসূত্রের বৃত্তিকার ভোজরাজ বলেন,—

"প্রত্যস্তমিত-বাহ্যেন্দ্রিয়স্য যত্র মনোমাত্রেণৈব ভোক্তৃত্বমাত্মনঃ স স্বপ্নঃ।"

যে অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় থাকায় কেবল মনের দ্বারাই আত্মার সুখ-দুঃখাদি-ভোগ সম্পাদিত হয়, সেই অবস্থার নাম স্বপ্ন।

বৈশেষিক-দর্শনের নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্নিকে "তথাস্বপ্নঃ" ॥ ৭ ॥

এই সূত্রের উপস্কারে স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপস্কার বলেন,—

যেমন আত্মা ও মনের সংযোগ-বিশেষ ও পূর্ব্বানুভূত সংস্কার হইতে স্মৃতি হয়, স্বপ্নজ্ঞানও সেইরূপই হইয়া থাকে। বৈশেষিকের মতেও স্বপ্নের লক্ষণ প্রায় একই রূপ;—

উপরতেন্দ্রিয়গ্রামস্য প্রলীনমনস্কস্য ইন্দ্রিয়দ্বারেণ যদনুভবনং মানসং তৎস্বপ্নজ্ঞানম্।

ইন্দ্রিয়সমূহ নিবৃত্ত, মন প্রলীন, এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া যে মানস অনুভব হয়, তাহাই স্বপ্নজ্ঞান।

এই স্বপ্নজ্ঞান তিনপ্রকার (ক) পূর্ব্বানুভূত সংস্কারের প্রবণতায়, (খ) বাতপিত্তাদি-দোষহেতুক (গ) ও অদৃষ্ট অর্থাৎ শুভাশুভ-কর্ম্মবশে ঘটিয়া থাকে।

(ক) সংস্কারপ্রবণতায়—যেমন কামী বা ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অতি দৃঢ়ভাবে যে বস্তু চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা যায়, স্বপ্নে তাহাই প্রত্যক্ষের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অথবা, যেমন পুরাণপাঠে রাম-রাবণের যুদ্ধ, কর্ণ অর্জ্জুনের যুদ্ধ, অতি অবহিতভাবে শ্রবণ করিলাম; পরে নিদ্রাকালে অবিকল দেখিতেছি, এই কুরুক্ষেত্রপ্রান্তরে কর্ণার্জ্জুনে মহাসমর সংঘটিত হইতেছে; লঙ্কায় রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে। চতুর্দ্দিকে বানরসৈন্য বৃক্ষ-প্রস্তরাদি লইয়া রাবণের প্রতি প্রধাবিত; রাক্ষসগণ বিকট চীৎকার করিতে করিতে রামের অভিমুখে আসিতেছে ইত্যাদি। পূর্ব্বরাত্রিতে থিয়েটারে "আলিবাবা"র অভিনয় দেখিলাম। বায়োস্কোপে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট অভিনীত হইল। বাসায় গিয়া নিদ্রা গেলাম, সেই দস্যুদের তাণ্ডব নৃত্য, গুহাভ্যন্তরে স্তূপীকৃত ধনরত্ন, পরিশেষে কাশিমের প্রাণসংহারের ভীষণ চিত্র অবিকল দেখা গেল, শরীর শিহরিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বর্শাহস্তে অগ্রসর হইতেছে, পদাতিগণ বন্দুক কাঁধে ফেলিয়া সদর্পে [illegible] রণক্ষেত্রে দৌড়িতেছে। স্বপ্নেও সেই জীবন্ত চিত্র প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই সকলই পূর্ব্বানুভূত সংস্কারের প্রবণতাজনিত স্বপ্ন।

(খ) দোষজনিত স্বপ্ন। শরীরে বায়ুর প্রাবল্য হইলে আকাশগমন, পৃথিবী-পর্য্যটন, ব্যাঘ্রাদির ভয় ও পলায়ন প্রভৃতি স্বপ্নে দেখা যায়। পিত্তাধিক্য ঘটিলে, অগ্নিপ্রবেশ, অগ্নিশিখা-আলিঙ্গন, স্বর্ণপর্ব্বত, বিদ্যুদ্‌বিস্ফুরণ, দিগ্‌দাহ প্রভৃতি স্বপ্নে দৃষ্টিগোচর হয়। শ্লেষ্মার প্রবলতায় সমুদ্র-সন্তরণ, নদী-মজ্জন, মেঘবর্ষণ, জলপ্লাবন, রজত-পর্ব্বত প্রভৃতি স্বপ্নে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

(গ) অদৃষ্টজনিত স্বপ্ন—ইহজন্মে বা জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়ে নিদ্রাবিষ্ট চিত্তের যে জ্ঞান হয় তাহাই স্বপ্ন। তন্মধ্যেও শুভকর্ম্মবশে শুভসূচক যেমন গজারোহণ, পর্ব্বতারোহণ, ছত্রলাভ, পায়সভক্ষণ, রাজসন্দর্শন প্রভৃতি, আর অশুভকর্ম্মবশে অশুভসূচক যেমন তৈলাভ্যঙ্গ, অন্ধকূপ-পতন, খরারোহণ, পঙ্কমজ্জন, স্ববিবাহ-দর্শন প্রভৃতি।

বৈশেষিক বলেন,—সংস্কার-প্রাবল্য, পিত্তাদিদোষ ও অদৃষ্ট এই তিনটীই মিলিতভাবে স্বপ্নের কারণ হয়। গৌণ-মুখ্যভাবে তিন কারণই প্রত্যেক স্বপ্নে থাকে, তবে যাহার প্রাবল্যে স্বপ্ন হয়, তদনুসারেই "এইটী সংস্কার-প্রাবল্যে, এইটী দোষবশে ও এইটী অদৃষ্ট-ফলে সংঘটিত" এইরূপ বিভাগ হয়।

কোনও কোনও দার্শনিক বলেন যে,—পূর্ব্বে অনুভব না থাকিলে কখনই সেই বিষয়ে স্বপ্ন হইতে পারেনা। হয়ত তুমি জন্ম-জন্মান্তরে বহু সহস্র জন্মের পূর্ব্বে কোনও কালে কোনও বিষয় অনুভব করিয়াছ, প্রত্যক্ষ না দেখিলেও অন্ততঃ কাহারও নিকট গল্প শুনিয়াছ বা গ্রন্থে পড়িয়াছ, সেই বিষয়েই তোমার স্বপ্ন হইতে পারে, অন্যবিষয়ে স্বপ্ন হইবে না। তাঁহারা উদাহরণ-স্থলে বলেন যে—"নিজ মস্তক নিজে চর্ব্বণ করিতেছি" এইরূপ স্বপ্ন কেহ দেখিবনা, কেননা তেমন অনুভব কাহারও নাই। নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের এই মত।

পাতঞ্জলাদিদর্শনের মতে পূর্ব্বানুভব ব্যতীতও কেবল কর্ম্মবশে বা অদৃষ্টবশে স্বপ্নে অনেক অদৃষ্ট ও অননুভূত বস্তুর সাক্ষাৎকারলাভ হইতে পারে। অর্জ্জুন যেমন বিশ্বরূপধারী ভগবানের দেহে কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধে সমাগত বীরসমূহের ভবিষ্যচিত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন; শুভাদৃষ্টফলে মনুষ্যও তেমনি চিত্তের সত্ত্বালোকের উজ্জ্বলতায় বাসনারূপে সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত কর্ম্ম-সমূহের ফলোন্মুখ সূক্ষ্ম অঙ্কুরসমূহ বিশদভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। সেই কর্ম্মবাসনার ফলোন্মুখ অবস্থাই জীবের ভবিষ্যদবস্থা।

বায়স্কোপের স্বচ্ছ ও ক্ষুদ্র কাচখণ্ডের উপর আলোকপাত করিয়া যেমন কাচমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ২ চিত্রগুলিকে অতিস্থূল জীবন্তভাবে অবিকল দেখান হইয়া

থাকে, কেবল অদৃষ্ট-জনিত স্বপ্ন বিশেষ সমূহেও তদ্রূপ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষরূপ উজ্জ্বল আলোক নির্ম্মল চিত্ত-দর্পণে পতিত হওয়ায় চিত্তে সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত অচির-ভবিষ্যতে ফলদানে উন্মুখ কর্ম্মাঙ্কুরসমূহ অতি স্থূল ও নির্ম্মলভাবে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।

অনেকেই অনুভব করিয়াছেন,—যেন প্রাতঃকালে কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু স্বপ্নে দেখিলেন,—সেই মৃত্যু সংবাদ লইয়া যেন কেহ আসিয়াছে,—অমনি জাগিয়া ব্যগ্রভাবে দরজা খুলিলেন, দেখিলেন, সেই ব্যক্তি পত্রহস্তে দ্বার উদ্‌ঘাটনের অপেক্ষা করিতেছে। স্বপ্নদৃষ্ট সেই মৃত্যু-সংবাদ তখনই জানিতে পারিলেন। এতাদৃশ স্বপ্নই অদৃষ্ট-বিশেষবশে সত্ত্বপ্রাবল্যে সংঘটিত হয়।

অভীষ্ট-দেবতার কৃপাবশেও অনেক অননুভূত স্বপ্ন-সন্দর্শন ঘটে। আমার ভগিনীপতি একদিন রাত্রিতে স্বপ্নে দেখেন, কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছে, "ওহে! তুমি ঘুমাইয়া আছ, শীঘ্র উঠ! তোমার গৃহে আগুন দিয়া চোর চলিয়া যায়"। তিনি জাগিলেন, ঘরের চালে অগ্নি দেখিলেন এবং দামোদরের কৃপায় অল্পপ্রযত্নেই অগ্নি-নির্ব্বাপণে সমর্থ হইলেন। এইশ্রেণীর স্বপ্নও অনেকে দেখিয়া থাকেন।

কেহ কেহ স্বপ্নে রোগবিমুক্তির উপায় জানিতে পারেন, নানাবিধ ঔষধ প্রাপ্ত হন, স্বপ্নযোগে উপাস্যমন্ত্র ও অভিমত গুরুর নির্দ্দেশ পাইয়া থাকেন।

জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থার বিশেষও আছে। জাগ্রদবস্থায় বাহ্য উত্তেজনা দ্বারা আভ্যন্তরিক উত্তেজনা নিষ্প্রভ হইয়া থাকে, তাহাতেই তখন স্বপ্ন অনুভূত হয় না। দিবসে সূর্য্যালোকের উজ্জ্বলতায় গ্রহনক্ষত্রাদি যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, জাগ্রদবস্থায় তেমনি বাহ্য উত্তেজনা দ্বারা আভ্যন্তরিক উত্তেজনা অভিভূত হওয়ায় স্বপ্নানুভূতি হইতে পারেনা। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ প্রসুপ্ত, উহারা জাগ্রতের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া নানা বাহ্য উত্তেজনা আহরণ করিতে পারেনা, তখন আভ্যন্তরিক উত্তেজনা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় এবং অতি নির্ম্মল ও পরিস্ফুটভাবে স্বপ্নজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।

জাগ্রদ্‌জ্ঞানের যেমন দিক্ কাল সসীম, স্বপ্নজ্ঞানের সেরূপ নহে। এক-মুহূর্ত্তে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল, এমন কি, চতুর্দ্দশ ভুবনের নানাস্থানের নানা ঘটনা স্বপ্নে অভিনীত হইতে পারে। স্বপ্নাবস্থায় দিক্‌কাল প্রভৃতির সীমা বহু বিস্তৃত। যে ঘটনা জাগ্রদবস্থায় সম্পাদিত হইতে বহুসহস্র বৎসরের প্রয়োজন, স্বপ্নে তাহা ক্ষণকাল মধ্যে সংঘটিত হইতে পারে। "ডিকুয়িনিস্ ৬০ বৎসরব্যাপি

একটী ঘটনা স্বপ্নে অভিনীত হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় সেই স্বপ্ন মুহূর্ত্তকাল ছিল কিনা সন্দেহ। আক্রহিল উপর্য্যুপরি তিনরাত্রি তাহার সমস্ত জীবন স্বপ্নে শুদ্ধ অভিনীত হইতে দেখিয়াছিলেন। কেবল দেখিয়াছিলেন না, তাঁহার নীতিগত উপদেশ সম্যক্রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। বেরণ কার্ল ডিপ্রেলের "ফিলজফি অব মিষ্টিসিজম্" নামক গ্রন্থে এরূপ নানা উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।"

স্বপ্নের ভিতরে "আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, আমি শুইয়া আছি" ইত্যাকার যে প্রকৃতজ্ঞান কখনও ২ জন্মে, তাহার দার্শনিক নাম স্বপ্নান্তিক। স্বপ্নান্তিকও সংস্কারবশে উৎপন্ন হয়। স্বপ্নান্তিক, তাৎকালিক অনুভব হইতে যে সংস্কার জন্মে সেই সংস্কারজন্য। স্বপ্নে ও স্বপ্নান্তিকে এইমাত্র ভেদ।

সংস্কার-প্রাবল্যে ও বায়ুপিত্তাদি-দোষ-নিমিত্ত যে স্বপ্ন, তাহা শুভাশুভের সূচক হয় না। অদৃষ্টমূলক স্বপ্ন ইষ্টানিষ্টের সূচনা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন,—

চিন্তাদুঃখেন শোকেন ব্যাধিগ্রস্তেন বা পুনঃ।
কামোৎসুকেন চিত্তেন স্বপ্নে ন ফলভাক্ ভবেৎ ॥

চিন্তা, দুঃখ, শোক, ব্যাধি ও কামে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণের স্বপ্ন বিফল হইয়া থাকে।

অদৃষ্টপ্রাবল্যে যে স্বপ্ন হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি সময়বিশেষে শীঘ্র বা গৌণে ফলপ্রসব করিয়া থাকে। মৎস্যপুরাণের ২৪২ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

স্বপ্নাস্তু প্রথমে যামে সংবৎসর-বিপাকিনঃ। ১৭
ষড়্ভির্মাসৈ র্দ্বিতীয়েতু ত্রিভির্মাসৈ স্তৃতীয়কে।
চতুর্থে মাসি মাত্রেণ পশ্যতো নাত্র সংশয়ঃ। ১৮
অরুণোদয়-বেলায়াং দশাহেন ফলং লভেৎ ॥
প্রাতর্দৃষ্টো ভবেৎ সত্যো যদাসৌ প্রতিবুধ্যতে ॥

রাত্রির প্রথমপ্রহরে স্বপ্ন দেখিলে একবৎসরে ফল প্রদান করে। দ্বিতীয়প্রহরে ছয় মাসে, তৃতীয়যামে তিন মাসে এবং চতুর্থ-প্রহরে এক মাসে স্বপ্ন-দর্শনকারী ফল প্রাপ্ত হন। অরুণোদয়কালে স্বপ্ন দেখিলে দশদিনে তাহার ফল ফলিয়া থাকে। প্রাতঃকালে স্বপ্ন সন্দর্শনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিলে তদ্দিনেই স্বপ্নফল ফলিবে।

দিবসীয়-বিষয়-চিন্তনজনিত চিত্তচাঞ্চল্যহেতু অদৃষ্টবশাধীন শুভাশুভ-সংসূচক স্বপ্নও পূর্ব্বরাত্রে তীব্রসম্বেগে আবির্ভূত হয় না, তজ্জন্যই তাহার বিপাকও শীঘ্র ঘটিতে পারেনা। তৎপর গম্ভীর রাত্রিতে চিত্তের চঞ্চলতা ক্রমশঃ দূর হইতে থাকে, এবং সেই সেই কালে দৃষ্ট স্বপ্নও অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ফল প্রসব করে। প্রভাতকালে চিত্ত একেবারে অনাবিল থাকে, তাহাতেই তৎকালে স্বপ্নের প্রকৃতস্বরূপ প্রকাশ পায় এবং সেই স্বপ্ন অতিশীঘ্র ফল জন্মাইয়া থাকে।

শাস্ত্র স্বপ্ন সম্বন্ধে আরও বলেন যে,—

একস্যাং যদিবা রাত্রৌ শুভংবা যদিবাশুভম্।
পশ্চাদ্দৃষ্টস্তু যস্তত্র তস্য পাকং বিনির্দ্দিশেৎ।
তস্মাচ্ছোভনকে স্বপ্নে পশ্চাৎ স্বপ্নো ন শস্যতে ॥২৩

২৪২ অঃ মৎস্যপুরাণ—

এক রাত্রিতে শুভাশুভ যতটী স্বপ্ন দেখা যায়, তাহার শেষটীরই ফল হয়। সেইজন্য শুভস্বপ্ন সন্দর্শন করিলে, আর নিদ্রা যাইবে না। অশুভ স্বপ্ন দেখিলে আবার নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্য-সাংখ্যতীর্থ।

আকাঙ্ক্ষা।

ক যদি পাইগো তোমার
মোক্ষ নাহি চাই;
খ-মাঝে নিঃস্ব হ'লেও
দুঃখ তাতে নাই।
তুমিই যদি মোহন-সাজে—
ব'সবে মম হৃদয়-মাঝে,
ব্যস্ত হ'লেও শতেক কাজে—
তুচ্ছ করি বিশ্ব-ব্যাপার
মুগ্ধ হয়ে যাই।

স্তব্ধ হৃদয় নয়ন দুটী
পলক তা'তে নাই ।
তুমিই যদি প্রাণে-মনে
মিশিয়ে থাক আমারি সনে,
মুগ্ধ কর মধুর-গানে,
সাড়া বীণার-তানে—
প্রাণে স্ফূর্ত্তি পাই—
হেরি বিশ্ব-ব্যাপার
মুগ্ধ হয়ে যাই ।

শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এ ।

পরকাল ।

(৩)

মৃত্যুর পর জীবের প্রথম গন্তব্যস্থান ভুবর্লোক। স্থূলতার তারতম্যানুসারে আমাদের এই স্থূল ভূর্লোকের পদার্থ-সমূহের যেমন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম শ্রেণী-বিভাগ আছে, ভুবর্লোকেও তদ্রূপ শ্রেণী বা স্তর-বিভাগ আছে। ভুবর্লোকের সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলতম উপাদানও আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ব্যোম অপেক্ষা সূক্ষ্ম, এজন্য এখানকার কোনরূপ উপাদানে নির্ম্মিত দেহ লইয়া তথায় যাওয়া যায় না। যেমন ভুবর্লোকে যাওয়ার সময় এই পৃথিবীর উপাদানে গঠিত দেহ লইয়া যাওয়া যায় না, সেইরূপ ভুবর্লোকের ভিন্ন ২ স্তরে যাইতে হইলে তদুপযোগী দেহ না হইলে যাওয়া যায় না। আমাদের শাস্ত্রানুসারে ভুবর্লোকের সূক্ষ্মতম সর্ব্বোচ্চ-স্তরের নাম পিতৃলোক ও সর্ব্বনিম্ন স্থূল-স্তরের নাম প্রেতলোক। মানুষের লিঙ্গদেহের স্তরগুলি স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে "কলার মোচার" ন্যায় পর পর সজ্জিত। সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল স্তরটী বহির্দিকে এবং সকলের সূক্ষ্ম স্তরটী অভ্যন্তরে থাকে। লিঙ্গদেহের বাহিরের দিকের আবরণের স্থূলতা অনুসারে ভুবর্লোকে আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। যতদিন যেরূপ আবরণ থাকিবে, জীব, ততদিন তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর স্তরে যাইতে পারেনা। যে মুহূর্ত্তে সেই আবরণটী ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া

পরবর্ত্তী সূক্ষ্মতর আবরণটী প্রকাশ পায়, জীবও তদনুসারে তন্মুহূর্ত্তে ভুবর্লোকের সূক্ষ্মাংশে উন্নীত হয়; এইরূপে জীব ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর লোকে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। যাহার লিঙ্গদেহের স্থূল (রাজসিক ও তামসিক) উপাদান বেশী, তাহাকে প্রেতলোকে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে হয়। জীব যে দেহ ধারণ করিয়া এই লোকে অবস্থান করে, সেই দেহের নাম প্রেতদেহ। যাঁহারা পৃথিবীতে সংযতচরিত্র হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের এই প্রথম-স্তর প্রেতলোকে বাস অতিঅল্পসময় হয়। যাহারা প্রবল বিষয়-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তির দাস, তাহাদের এই স্তরে অতি দীর্ঘকাল থাকিতে হয়। এই প্রেতদেহ যত শীঘ্র নষ্ট হয়, ততই জীব প্রেতলোক ছাড়িয়া অন্যলোকে গমন করিতে পারে। প্রেতদেহ নষ্ট করিয়া জীবকে অন্য স্তরে প্রেরণ করাই শ্রাদ্ধাদির একটী মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। যোগী ও মুক্ত পুরুষদের প্রেতলোক প্রেতদেহে বাস করিতে হয় না, এজন্য তাঁহাদের শ্রাদ্ধতর্পণাদি নিষ্প্রয়োজন। এই প্রেতদেহের আকার সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

তৎপ্রমাণ-বয়োঽবস্থা-সংস্থানৈরপি তাদৃশঃ।

গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড ৬।৮৩

উহা পূর্ব্বদেহের বয়স ও অবস্থাদির সম্যক অনুরূপ হইয়া থাকে। যে অবস্থায় ও যত বয়সে মৃত্যু ঘটে, প্রেতদেহ সেইরূপ হইয়া থাকে। দেহ-সংস্থানের মধ্যে কোন বিশেষত্ব থাকিলে মৃত্যুর পর ঠিক সেইরূপভাবে প্রেতশরীরের সন্নিবেশ হয়। আমাদের এই প্রেতদেহ সাধারণতঃ এক-বৎসরকাল স্থায়ী হয়। এক বৎসরের পরে জীব প্রেতদেহ ছাড়িয়া ভোগদেহ অবলম্বন করিয়া নিজ কর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরকে যায়।

তৎক্ষণাদেব গৃহ্ণাতি শরীরমাতিবাহিকম্।
কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ॥
প্রেতদেহমতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ।
ততঃ সপিণ্ডীকরণৈঃ বান্ধবৈঃ সংকৃতে নরৈঃ॥
পূর্ণে সম্বৎসরে দেহমতোঽন্যং সংপ্রপদ্যতে।
ততঃ স নরকং যাতি স্বর্গং বা স্বেন কর্ম্মণা॥

(শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর উদ্ধৃত প্রমাণ)

মৃত্যুক্ষণেই জীব আতিবাহিক দেহ অবলম্বন করে। এই আতিবাহিক দেহ কেবল মনুষ্যের হইয়া থাকে, অন্য প্রাণীর এই দেহ হয় না। ক্রমে প্রেত দেহ

ধারণ করে, তৎপর বন্ধুগণ সম্বৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ দ্বারা সংস্কৃত করিলে অন্যদেহ (অর্থাৎ ভোগদেহ) ধারণ করে এবং সেই দেহ-সহায়ে নিজকর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরকে গমন করে।

মানব ভিন্ন অন্য জীবের এই "আতিবাহিক দেহ" হয় না এবং তাহাদের এই সকল লোকে যাইতে হয় না। তাহারা পার্থিব দেহ নষ্ট হইলেই পূর্ব্ব-কর্ম্মবশতঃ অন্য পার্থিব দেহ ধারণ করে। জলৌকা যেমন তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমন করে, তদ্রূপ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহারা দেহান্তর গ্রহণ করে। মানব ভিন্ন অন্য পার্থিব জীবের নূতন কোন কর্ম্মসংস্কার জন্মেনা; তাহারা পূর্ব্ব-মানব-জন্মের প্রারব্ধ-কর্ম্মফলে অন্যান্য যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকে, পরে যখন পূর্ব্বকর্ম্মফলে আবার মানব-জন্ম প্রাপ্ত হয়, তখন পুনরায় আতিবাহিক দেহ প্রভৃতি ধারণ করিয়া স্বর্গ-নরকে যাইতে সমর্থ হয়। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—"কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ" তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল জীব ইহজন্মের কোন প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কার লইয়া যায় না, তাহাদের ভুবর্লোকে ভ্রমণ করিতে হয় না, সুতরাং সেই লোকের উপযোগী আতিবাহিক দেহও হয় না। যে সকল মানব অতি শৈশবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদেরও বর্ত্তমান জীবনে কর্ম্ম-সংস্কার জন্মিবার অব-কাশ পায় না; তাহারা কেবল পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করার জন্য নানা যোনি ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ শিশুর আতিবাহিক দেহ হয় না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ তাহার অগ্নিসংস্কার কি শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করেন নাই।

প্রেতদেহ শ্রাদ্ধ-সপিণ্ডীকরণাদি দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হইলে জীব স্বর্গ-নরকভোগের উপযুক্ত ভোগদেহ ধারণ করে। এই প্রেতদেহ লিঙ্গশরীরের সাধারণ অবস্থা। এই দেহেরই একটী বিশেষ জঘন্য অবস্থা আছে, তাহার নাম ভূতযোনি। মহাপাপী জীবগণ মৃত্যুর পর, কেহবা নরকভোগের পর এই ভূতযোনি লাভ করে। সকলেরই যে এই ভূতযোনি-প্রাপ্তি ঘটে, তাহা নহে। জীব সাধারণ-প্রেতদেহে জীবিতকালের সংস্কারবশে সামান্য কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু কষ্টকর মানস দুঃখ এই প্রেতদেহে হয়না— তজ্জন্য ভোগদেহ লাভ করিতে হয়। এই সাধারণপ্রেতদেহধারী জীবগণ কাহাকেও বিভীষিকা দেখায় না—কিংবা কাহারও দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট-সাধন করেনা। শাস্ত্র কখন সাধারণলিঙ্গদেহস্থ জীবের প্রতি, কখন বা ভূতযোনি-প্রাপ্ত জীবের প্রতি "প্রেত"শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শেষোক্ত

ভূতযোনি-প্রাপ্ত জীবের অবস্থা অতি কষ্টদায়ক; শ্লেষ্ম-মূত্র-পুরীষাদি ইহাদের ভক্ষ্য; ভীষণ শ্মশানাদি কিংবা ভগ্ন পরিত্যক্ত গৃহাদি ইহাদের বাসস্থান; ইহারা দুর্ব্বল প্রকৃতির মানবের উপর অত্যাচার করে, আবার সবল-মনঃশক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে আসিতে ভয় পায়।

গরুড়পুরাণের উত্তরখণ্ডে অষ্টমঅধ্যায়ে প্রেতগণ তাহাদের নিজ বৃ- ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপে বিবৃত করিয়াছিল—

আসীন্নরক-ভোগান্তে নঃ প্রেতত্বমিদং দ্বিজ।

নরকভোগের পর আমাদের এই প্রেতত্ব ঘটিয়াছে। হে দ্বিজ! যেখানে বেদ প্রভৃতি সন্মার্গ-প্রবৃত্তি, লজ্জা, ধর্ম্ম, দয়া, ক্ষমা, ধৃতি, জ্ঞান এ সকল নাই, আমরা তথায় বাস করি। বমন, শ্লেষ্মা, বিষ্ঠা, মূত্র, নেত্র-মলাদি আমাদিগের ভক্ষ্য ও পানীয় জানিবে। আমরা তামস, অজ্ঞান, জড় ও দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানহীন।

যাহাদের অগ্নিসংস্কার, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি কার্য্য হয় নাই, যাহারা বিশ্বাসঘাতক, সুরাপায়ী, স্বর্ণচৌর, যাহাদের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, যাহারা অগম্যাগামী, সেই সকল জীবের সেই সেই স্বকৃত দুষ্কর্ম্মফলে এই সকল ভূতযোনি লাভ হয়। (গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড) আত্মঘাতীরা প্রায়ই ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল এই অবস্থায় থাকে, কর্ম্মানুসারে গতি লাভ করিতেও ইহাদের যোগ্যতা হয় না। ইহারা আত্মহত্যারূপ পাপের ফলে নানারূপ উৎকট যাতনা ভোগ করে।

আত্মহত্যা অতি বিগর্হিত মহাপাপ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। "অগ্নি, বিষ, শস্ত্র, উদ্বন্ধন প্রভৃতি দ্বারা যে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়, সে ব্যক্তি অতি পাপিষ্ঠ।" আত্মঘাতী ব্যক্তির ঔর্দ্ধদৈহিক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নাই, কারণ ঐ সকল সাধারণ ক্রিয়া দ্বারা উহাদের পাপদেহের কোন উপকার হয় না।

এই সকল ভূতযোনিই ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি অপদেবতা।

স্বকর্ম্মণা চ প্রেতত্বং বেতালত্বং স্বকর্ম্মণা।
ভূতত্বঞ্চ পিশাচত্বং ডাকিনীত্বং স্বকর্ম্মণা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ২৪।২৭

প্রেতদেহ নষ্ট হইলে লিঙ্গদেহের যে ভোগদেহ হয়, তাহা বায়ু অপেক্ষাও লঘু ও দ্রুতগামী যথা:—

বায়ুপ্রসারি তদ্রূপং দেহমন্যৎ প্রপদ্যতে।

গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড ৬ষ্ঠ অঃ ৮২।

বায়ু অপেক্ষা লঘু ও দ্রুতগামী দেহ উৎপন্ন হয়।

লিঙ্গদেহের স্বর্গ ও নরকভোগ কল্পিত কল্পনা নহে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে অর্থে অনিত্য, স্বর্গ-নরকও সেই অর্থে অনিত্য। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট জগৎ মায়াময় ও সংস্কারজ ভ্রান্তিপ্রবাহমাত্র. কিন্তু তা বলিয়া আমাদের ন্যায় জীবের নিকট প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ জগৎ মিথ্যা নহে। আমাদের নিকট বাহ্যজগৎ যেভাবে সত্য ও বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হয়, স্বর্গ-নরকও সেইভাবে লিঙ্গদেহীর নিকট সত্য ও বাস্তব। নরক ভুবর্লোকের একটী স্তরবিশেষ। শাস্ত্রে রৌরব, অন্ধতামিস্র প্রভৃতি অনেক প্রকার নরকের বর্ণনা আছে এবং কিরূপ পাপের জন্য কিরূপ নরকভোগ হইবে তাহা লিখিত আছে। শ্রুতিতেও আছে, অনিষ্ট-কর্ম্মকারি লোকসকল যমের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার সংযমন-নামক পুরীতে গমন করে। বেদান্ত-দর্শনকার এই সকল নরকপুরী প্রধানতঃ সপ্তশ্রেণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিকারগণও "সর্ব্বে-চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল" এই প্রকার বলিয়াছেন। ঈশোপনিষদে আছে—যাহারা কেবল বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া বৃথা কামনার দ্বারা পরি-চালিত হইয়া থাকে, সেরূপ মনুষ্য মৃত্যুর পর অসূর্য্যনামক অজ্ঞান-তিমিরা-বৃত-লোক সকলে গমন করিয়া থাকে। বেদ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ সর্ব্বত্রই যমপুরী বা সংযমনপুরীর উল্লেখ আছে। যম ও সংযমন একার্থ-বাচক; যেখানে জীব নিয়মিত বা সংযত হয়, তাহাই যম বা সংযমনপুরী। তবে একথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল নরকাদি ও যম-ভুবন আমাদের পার্থিব রাজ্যের ন্যায় পার্থিব উপাদানে গঠিত নহে, ইহা একটী মানস রাজ্য।

যম সাবিত্রীকে বলিয়াছিলেন—

গন্তুং মর্ত্ত্যো ন শক্নোতি গৃহীত্বা পাঞ্চভৌতিকম্।

ব্রহ্মপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ২৪ অঃ ১৫।

যমলোকে পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া যাইতে পারেনা। আমাদের মনোময়কোষ যে উপাদানে রচিত, ইহাও সেই উপাদানে গঠিত। বিষ্ণুপুরাণে নরকাধ্যায়ে (২।৬।৪১) আছে—

মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গঃ নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরকস্বর্গ-সংজ্ঞে বৈ পাপ-পুণ্যে দ্বিজোত্তম॥

স্বর্গ, মনের প্রীতিকর এবং নরক মনের অপ্রীতিকর হে দ্বিজোত্তম! পাপ ও পুণ্যের নামই নরক ও স্বর্গ—অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য নরক ও স্বর্গের

সাধন বলিয়া "পাপ-পুণ্যই নরক ও স্বর্গ" এইরূপ বলিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী এই বচনের যে টীকা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে স্বর্গ-নরকাদি ও তৎসাধন সমস্তই মিথ্যা বলিয়া অনুভব হয়, কেননা স্বপ্নেতে মনের প্রীতিকর বা দুঃখকর যে সকল বস্তু দর্শন করা যায়, তাহা যেমন মিথ্যা, তদ্বৎ স্বর্গ নরকও মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মা পর্য্যন্ত বাসনা ও অদৃষ্ট-বশে এই মায়াময় জগতের ন্যায় প্রীতিজন্য স্বর্গ ও গ্লানিজন্য নরকলোক সকল জীবের ভোগার্থে সংঘটিত হইয়া থাকে; কিছুতেই তাহা হইতে ত্রাণ পাওয়া যায় না। স্বর্গ নরক ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য ও কার্য্যকারী। এইরূপ জীবের পক্ষে পাপ-পুণ্য-ভোগ ও পরলোক-ভ্রমণ অপরিহার্য্য। স্বপ্ন না ভাঙ্গিলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু অলীক বলিয়া জ্ঞান হয় না। ব্রহ্ম-জ্ঞানীর নিকট আমাদের ভোগসাধক এই দৃশ্যমান্ জগৎ অলীক স্বপ্নবৎ, কিন্তু আমাদের নিকট সম্পূর্ণ সত্য, কারণ আমরা এখনও মায়ার স্বপ্ন-ঘোরে বাস করিতেছি।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্।

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবাত্মা ব্রহ্মই—আমাদের যে কাল পর্য্যন্ত এই জ্ঞান সত্যসত্যই না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত আমাদের নিকট পৃথিবী স্বর্গ, নরক ও তত্তজ্জাত সুখ-দুঃখ সম্পূর্ণ সত্য। আমরা যেমন পৃথিবীর সুখ, দুঃখ, শীত-তাপাদি অনুভব করি, তদ্রূপ নরকের যমযন্ত্রণা ও স্বর্গের অপার্থিব সুখ সত্যসত্যই আমাদের অনুভবে আসিবে। এই ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রকথিত ব্রহ্ম-জ্ঞান। ইহা জন্মিলে অবিদ্যা-বীজ নষ্ট হয় এবং জীবের জন্মমৃত্যু রহিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান আত্মানুভূতি—ইহা মুখের কথা নহে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি বর্ত্তমানে কলৌযুগে।
নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদর-পরায়ণাঃ॥
সংসারিক সুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনম্।
কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

হে মৈত্রেয়! কলিযুগে সকলেই "ব্রহ্ম" বলিবে, কিন্তু উদরসেবা এবং কামোপভোগে সমাসক্ত হইয়া তাহারা "অনুষ্ঠান" করিবে না। যাহারা সাংসারিক সুখে আসক্ত, অথচ "আমি ব্রহ্মজ্ঞ" এইরূপ বলে, তাহারা কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট। অন্ত্যজের ন্যায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে।

যেরূপ অন্নের দ্বারা অন্নময়কোষ গঠিত, তদ্রূপ চিন্তা ও কামনা দ্বারা মনোময় কোষের পরিপুষ্টি। সু ও কু চিন্তা এবং কামনাই মনের খাদ্য; চিন্তা ও কামনা দ্বারা মনোময়কোষ গঠিত। সুচিন্তা মনোময়কোষকে উন্নত করে এবং কুচিন্তায় তাহার অবনতি হয়। তাপ ও তড়িতের ন্যায় চিন্তাও একপ্রকার স্পন্দন। প্রভেদ এই—একটী বাহিরের, অপরটী অন্তর-রাজ্যের। চিন্তা এবং ধ্যানের শক্তি অপরিসীম। এই চরাচর, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার চিন্তা ও ধ্যান-প্রসূত। স্থূল বাহ্যরূপ, চিন্তা ও ধ্যানের অনুগামী হয়।

মনসা চিন্তয়ন্ পাপং কর্ম্মণা নাভিরোচয়েৎ।
স প্রাপ্নোতি ফলং তস্যেত্যেবং ধর্ম্ম-বিদোবিদুঃ ॥

শুক্রনীতি।

যদি মানসকৃত পাপ-চিন্তা কার্য্যে পরিণত নাও হয়, তাহা হইলেও এই পাপের ফল চিন্তাকারীকে আশ্রয় করে।

মনোময়কোষকে আশ্রয় করিয়াই সকল প্রকার ভাবের উৎপত্তি হয়। যাহার যেরূপ ভাব, তাহার দেহ সেইরূপে গঠিত।

শাস্ত্রানুসারে এই সূক্ষ্ম ভোগদেহ অগ্নি দ্বারা ভস্ম হয় না, কোনরূপ অস্ত্র দ্বারা ইহা ভেদ করা যায় না, ঊর্দ্ধ হইতে পতনেও নষ্ট হয় না, কিন্তু সন্তাপ ভোগ করিতে থাকে, কারণ ভয়, মোহ, সুখ, দুঃখ এই দেহের ধর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ সেন বি এল্।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দংষ্ট্রা-করালানিচ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানল-সন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভেচ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে দেবেশ (স্বয়মেব দীব্যন্তে ইতি দেবস্তস্য ঈশঃ দেবেশঃ) দংষ্ট্রাকরালানি (দশনবিকৃতানি) কালানলসন্নিভানি (প্রলয়াগ্নি-তুল্যানি)

তে (তব) মুখানি দৃষ্ট্বা এব (অহং ভয়াবেশেন) দিশঃ (পূর্ব্বোত্তরাদিকাঃ) ন জানে (জানামি) শর্ম্ম (সুখং) নচ লভে। হে জগন্নিবাস প্রসীদ (প্রসন্নোভব) ২৫

বঙ্গানুবাদ। হে দেবেশ। তোমার বিকৃতদর্শন, প্রলয়াগ্নি-সদৃশ মুখ-সকল দর্শন করিয়া ভয়ে আমি দিক্ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়াছি; কোন রকমে সুখ পাইতেছি না, হে জগদাধার, তুমি প্রসন্ন হও। ২৫

আলোচনা। অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শনার্থ কৌতুহলী হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন; যে রূপদর্শন যোগী ঋষি সিদ্ধ ও দেবগণেরও বাঞ্ছনীয়, ভক্তবৎসল ভগবান্ কৃপা করিয়া অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়া সেরূপ দর্শন করিতে দিয়াছেন; অর্জ্জুন সেই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর বিশ্বনাথের বিশ্বমূর্ত্তি দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন; অতঃপর ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া করপুটে কাতরে সেই অনন্তমূর্ত্তি প্রতিসংহার করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রা-করালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

সান্বয়ব্যাখ্যা। অবনিপালসংঘৈঃ (জয়দ্রথাদি-রাজসমূহৈ) সহ অমীচ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্ব এব পুত্রাঃ (দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ) তথা ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অসৌ সূতপুত্রঃ (কর্ণঃ) অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ (শিখণ্ডি-ধৃষ্টদ্যুম্নাদিভিঃ) সহ ত্বরমাণাঃ (ত্বরাযুক্তাঃ ধাবন্তঃ) তে (তব) দংষ্ট্রাকরালানি (দংষ্ট্রাভিঃ বিকৃতানি) ভয়ানকানি বক্ত্রাণি (ভয়প্রদানি মুখানি) বিশন্তি (তেষাং মধ্যে প্রবিশন্তি) কেচিত্ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ (শিরোভিঃ) (উপলক্ষিতাঃ) দশনান্তরেষু (দন্তসন্ধিষু) বিলগ্নাঃ (সংশ্লিষ্টাঃ) সংদৃশ্যন্তে। ২৬। ২৭

বঙ্গানুবাদ। জয়দ্রথাদি রাজগণের সহিত ঐ যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ দুর্যোধনাদি, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্নাদি যোদ্ধ্‌গণসহ দ্রুতবেগে তোমার দংষ্ট্রা-করাল ভীষণ মুখ-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; তন্মধ্যে

কাহার মস্তক বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, কেহবা তোমার দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিতেছে দেখিতেছি! ২৬।২৭

আলোচনা। সপ্তমশ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, আরও যাহা কিছু দেখিতে চাও "যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি"—যুদ্ধের জয় পরাজয় তাহাও দেখিতে পাইবা; তাই যুদ্ধের ভাবিফল অর্থাত্ যোদ্ধৃগণ কিভাবে কালের করাল গ্রাসে প্রবেশ করে, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহাই দেখাইতেছেন। ইহা কেবল উপলক্ষমাত্র, জগতে কালের কি অব্যাহত প্রভাব, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহাই দেখাইলেন।

যুদ্ধের পূর্ব্বেই তাহার ভাবিফল যোদ্ধৃগণের মৃত্যু কিরূপে বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইল, তত্সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার উত্তর আমরা ২১শ শ্লোকে আলোচনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে গীতার অন্যতম ব্যাখ্যাকারক শ্রীযুক্ত রাম-দয়াল মজুমদার এম্-এ মহাশয় তাঁহার আলোচিত গীতায় একটী সুন্দর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহার মর্ম্ম এস্থলে উল্লেখ করিলাম। "একটী মানুষ দেখিতেছে—একটী ক্ষুদ্র পোকা আপন মনে খেলিতেছে, তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য একটী ভেক মুখব্যাদন করিয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে, সেই ভেকের পশ্চাতে এক সর্প ভেককে ভক্ষণ করিবার জন্য ধীরে অগ্রসর হইতেছে; সর্পকে লক্ষ্য করিয়া এক ময়ূর একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, ময়ূরটীকে শিকার করিবার জন্য এক ব্যাধ শরসন্ধান করিতেছে, ব্যাধকে বধ করিবার জন্য এক ব্যাঘ্র তাহার পশ্চাত্ অনুশরণ করিতেছে ইত্যাদি—যিনি দেখিতেছেন, তিনি সমকালে সকলেরই গতি দেখিতেছেন— পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত হইতেছেন, কিন্তু ইহারা কে, কোথায় চলিতেছে, গম্যস্থানের কিছুই অবগত নয়। মানুষেই যখন ভবিষ্যত্ অবস্থা সামান্য জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পায়, তখন শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বজীবের অবস্থা, ভবিষ্যতে জীব-দৃষ্টিতে যাহা হইবে—যাহা পূর্ব্ব হইতেই ঘটিয়া রহিয়াছে, তাহা দেখাইতে পারিবেন না কেন? ২৬।২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভি বিজ্বলন্তি ॥২৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। যথা (অনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং) নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ (বারিপ্রবাহাঃ) সমুদ্রমেবাভিমুখাঃ (সমুদ্রং এব অভিমুখাঃ সন্তঃ সমুদ্রমেব)

প্রবিশন্তি (প্রবিশন্তি) তথা (তদ্বত্) অমী নরলোকবীরাঃ (মনুষ্য-লোক-শূরাঃ ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ) অভিবিজ্বলন্তি (সর্ব্বতঃ দীপ্যমানানি) তব বক্ত্রাণি বিশন্তি। ২৮

বঙ্গানুবাদ। যেমন নদীসকলের অসংখ্য জল সমুদ্রাভিমুখী হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ ঐ ভীষ্ম-দ্রোণাদি বীরগণ জাজ্বল্যমান তোমার মুখেই প্রবেশ করিতেছে। ২৮

আলোচনা। জীবের জন্ম মৃত্যু স্থিতি সকলই ভগবানে নির্দিষ্ট; অর্জ্জুন সেই ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঘটনা অর্জ্জুনের দর্শনগোচর হইতেছে। তাই বলিতেছেন "হে ভগবন্! যেমন বহুপ্রবাহশালী নদীসকল সমুদ্রাভিমুখী হইয়া সমুদ্রেই পতিত হয়, তদ্রূপ এই যে ভীষ্ম-দ্রোণাদি বীরগণ, ইহারাও তোমার বদনে প্রবেশ করিতেছে, দেখিতেছি" ।২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯

সান্বয়ব্যাখ্যা। যথা সমৃদ্ধবেগাঃ (প্রচণ্ডবেগাঃ) পতঙ্গাঃ (ইচ্ছাপূর্ব্বকং) নাশায় (মরণায়) প্রদীপ্তং (জ্বলন্তং) জ্বলনং (অগ্নিং) বিশন্তি (প্রবিশন্তি) তথা সমৃদ্ধবেগাঃ লোকাঃ অপি নাশায় তব বক্ত্রাণি বিশন্তি।২৯

বঙ্গানুবাদ। যেমন পতঙ্গগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সবেগে মরণের জন্যই প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই জনসমূহও মরণের জন্য তোমার মুখে প্রবেশ করিতেছে।২৯

আলোচনা। পূর্ব্ব-শ্লোকে নদীর সমুদ্র-গমনের সহিত লোকের কাল-কবলে পতনের সাদৃশ্য উল্লিখিত হইয়াছে। নদীর প্রবাহ ইচ্ছাপূর্ব্বক নয়, উহা স্বাভাবিক বেগে সমুদ্রে পতিত হয়; কিন্তু পতঙ্গসকল আলোকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবলবেগে প্রজ্বলিত আগুণে পুড়িয়া মরে। লোক-সকলের বুদ্ধি আছে, ভাল-মন্দ-বিচারশক্তি আছে, তাহারাও মরণের হাতে অব্যাহতি পায়না—অর্থাৎ জগতে সকল বস্তুরই নাশ আছে, ভগবান্ বিশ্বরূপে তাহাই অর্জ্জুনকে দেখাইতেছেন। বিশ্বরূপ-মধ্যে অর্জ্জুন জীবের নাশ দর্শন করিয়াছেন।২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগত্ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০

সান্বয়ব্যাখ্যা। জ্বলদ্ভিঃ (দীপ্যমানৈঃ) বদনৈঃ সমগ্রান্ (সমস্তান্) লোকান্ গ্রসমানঃ (অন্তঃ প্রবেশয়ন্, গিলন্) সমন্তাত্ (সমন্ততঃ) লেলিহ্যসে (অতিশয়েন ভক্ষয়সি) হে বিষ্ণো (ব্যাপনশীল) তেজোভিঃ (মহাপ্রকাশৈঃ) সমগ্রং জগত্ আপূর্য্য (ব্যাপ্য) তব উগ্রাঃ (তীব্রাঃ) ভাসঃ (দীপ্তয়ঃ) প্রতপন্তি (সন্তাপয়ন্তি) ।৩০

বঙ্গানুবাদ। জ্বলন্ত মুখসকলের দ্বারা তুমি লোক-সমূহকে গ্রাস করিতে করিতে ভক্ষণ করিতেছ। হে বিষ্ণো, তোমার তীব্র প্রভাসকল সতেজে সমগ্র জগত্ ব্যাপিয়া বিশ্ব সন্তপ্ত করিতেছে। ৩০

আলোচনা। সৃষ্টি স্থিতি সংহার সকলই এক ঈশ্বরের প্রকারভেদ ক্রিয়ামাত্র। অর্জ্জুনের দৃষ্ট বিশ্বরূপে তাহারই বিকাশ, ভগবান্ অর্জ্জুনকে দেখাইতেছেন। সংহারমূর্ত্তিও যে ভগবানের বিভূতি, তাহা ১০ম অঃ ৩৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, এখন নিজ বিশ্বমূর্ত্তিতে তাহা দেখাইলেন। ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্। ৩১

সান্বয়ব্যাখ্যা। উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ (ইতি) মে আখ্যাহি তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু, হে দেববর (দেবানাং প্রধান) প্রসীদ (প্রসন্নোভব) আদ্যং (আদৌভবং) ভবন্তং (ত্বাং) বিজ্ঞাতুং ইচ্ছামি হি (যতঃ) তব প্রবৃত্তিং (চেষ্টাং) ন জানামি। ৩১

বঙ্গানুবাদ। হে উগ্ররূপধারী পুরুষ, তুমি কে, আমাকে বল। তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রসন্ন হও। হে আদিপুরুষ, তোমাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি, কারণ তোমার কার্য্য আমি অবগত নহি। ৩১

আলোচনা। অর্জ্জুন গোড়ায় ইচ্ছা করিয়া ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণ একাধারে বহুরূপ দর্শন করিয়া, যাহা কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই, তাদৃশ বহুমূর্ত্তি দেখিয়া,

আত্মবিস্মৃত ও দিশাহারা হইয়াছেন। ভগবানের মায়া উপলব্ধি করা অর্জ্জুনের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত হইয়াছে দেখিয়া, অর্জ্জুন বলিতেছেন "হে বিশ্বরূপিণ্! তুমি কে? আমাকে পরিচয় দেও, আমি তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি। আমি তোমার কার্য্যকলাপ কিছুমাত্র অবগত নহি।" ৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃত্ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ২২

সান্বয়ব্যাখ্যা। শ্রীভগবান্ উবাচ। লোকক্ষয়কৃত্ (লোকানাং ক্ষয়কর্ত্তা) প্রবৃদ্ধঃ (বৃদ্ধিং গতঃ ব্যাপী) কালঃ অস্মি। লোকান্ (প্রাণিনঃ) সমাহর্ত্তুং (সং আহর্ত্তুম্ সংহর্ত্তুম্) ইহ লোকে প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্তঃ অস্মি) ত্বাং ঋতেঽপি (ত্বাং হন্তারং বিনা অপি) প্রত্যনীকেষু (প্রতিপক্ষসেনাসু) যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ সর্ব্বে (তে) ন ভবিষ্যন্তি (ন জীবিষ্যন্তি) ৩২

বঙ্গানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি লোকক্ষয়কারী ভীষণ কাল, লোকসকলের সংহারার্থ ইহলোকে প্রবৃত্ত আছি। তুমি বধ না করিলেও প্রতিপক্ষ-সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা যুদ্ধার্থ অবস্থান করিতেছে, তাহারা কেহই জীবিত থাকিবে না। ৩২

আলোচনা। ভগবান্ ১০ অঃ ৩০ শ্লোকে বলিয়াছেন—"কালঃ কলয়তামহম্" জগতের ঘটনা-গণনাকারিদিগের মধ্যে আমি কাল। এবং ১০অ ৩৪শ্লোকে বলিয়াছেন "মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহম্" সর্ব্বসংহারকারী মৃত্যু আমি। এখানে অর্জ্জুন বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কিন্তু নিজেই আত্মহারা হইয়া পূর্ব্বশ্লোকে ভগবান্‌কে প্রশ্ন করিয়াছেন "তুমি কে?" ভয়বিহ্বল অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা-মতে ভগবান্ বলিতেছেন—"আমি লোকক্ষয়কারী ভীষণ কাল, লোকসংহারার্থ প্রবৃত্ত আছি। উপস্থিত যুদ্ধে তুমি বিপক্ষপক্ষের সৈন্য সকল বধ না করিলেও তাহারা জীবিত থাকিবে না।" একথা গোঁড়ায়ই ২অ ২৭শ্লোকে বলিয়াছেন "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" জন্মিলেই মরণ নিশ্চয়। বাচনিক ও প্রত্যক্ষ প্রদর্শন দ্বারা দেখাইলেন যে, তুমি স্বজন-বধ আশঙ্কায় বৃথা ভীত হইতেছ। মরণে তোমার কোন হাত নাই, আমি ভিন্ন জগতে কাহার হাত নাই। ৩২

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশগুপ্ত।

শ্যামা-সাধক মুমূর্ষু ব্যক্তির উক্তি।

কে তোরা ঘিরিয়া মোরে করিস রোদন—
সুত পরিবার মোর সুহৃদ্-স্বজন ?
কি ভয় কি ভয়, হেরি বারি ও নয়নে—
যাই আমি ভাবি বুঝি বিকট শ্মশানে ?
কে বলে শ্মশান, সে যে আনন্দ-কানন ;
যে ভাবে কদর্য্য তা'র আছে কি নয়ন ?
অতুল আনন্দ-প্রসূ আনন্দ-প্রসূন—
শ্যামা-প্রেম-গুণে, মত্ত দ্বিরেফ গুণ গুণ ;
সদানন্দ স্থান সেই—যথা সদানন্দ,
পবিত্র পীযূষ-লোভে ষট্‌পদ-আনন্দ।
আনন্দ-তরুতে ধরে আনন্দের ফল ;
রসাল সে ফলে ফলে চতুর্ব্বর্গ ফল।
আনন্দ পাখীতে করে আনন্দের গান,
আনন্দ বাতাস বয় জুড়ায় পরাণ ;
নিত্যানন্দ ধাম সেই নাই আনন্দ বই ;
যথা পিতা সদানন্দ, মা আনন্দময়ী—
থাকিব মায়ের কোলে, নাহি তথা ক্ষুধা,
দিবেন আনন্দময়ী খেতে শান্তি-সুধা।
পরম পবিত্র স্থান, কে বলে কদর্য্য ?
কিম্বদন্তী বলে বুঝি সে ভূতের রাজ্য ;
হাসিতে হাসিতে তথা চলি যাব আমি,
যোগীন্দ্রের যোগারাধ্য মহা-যোগ-ভূমি।
নাহি তথা রাজা প্রজা, প্রবীণ কি দীন,
সবল দুর্ব্বল নাই, রোগ-শোক-হীন।
শত্রু মিত্র নাহি তথা, নাহি হিংসাদ্বেষ,
আমিত্বের প্রসাদেতে পরিপূর্ণ দেশ।
মা হেরি অম্বর-গর্ব্ব দিগম্বরে হাসি,
তাইরে শ্মশান-ভূমে হাসে তীব্র হাসি।

ভুতের বেগার খেটে মরি, ভুতের ভয় পাই,
ভুতের বোঝা ভুতকে দিয়ে শ্মামায় মিশে যাই।
মাটীতে মিশিবে মাটী, জলে মিশ্‌বে জল,
আগুণে আগুণ মিশিবে, টুটে যাবে বল।
মহাকাশে ঘটাকাশ মিশিবে তখন,
দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা শ্মশানে শয়ন।
তোরা কি ভাবিস আমি বিভীষিকা ভয়ে,
এপাশ ওপাশ করি প্রাণে ভীত হয়ে ?
তা নয় তা নয় ওরে সুত পরিবার !
তোরাই আমার বদ্ধ ভব-কারাগার।
মহামায়া-শৃঙ্খলেতে রেখেছিস্ বেঁধে,
মহামায়ার জন্যে প্রাণ তাই উঠে কেঁদে।
বিকট ভঙ্গীতে করি এ পাশ ওপাশ !
যদি রে কাটিতে পারি ঘোর মায়াপাশ।
হঠাৎ যখন তোদের নিকটেতে হেরি,
আবার বাঁধিস পাছে তাই ভয় করি।
মুখের বিকট ভঙ্গী চক্ষু রক্তবর্ণ,
আতঙ্কে কাঁপিছে অঙ্গ হতেছে বিবর্ণ।
শয্যা-কণ্টক ভাবিস তোরা শিরো লুণ্ঠন আর—
আমি ভাবি, কোথায় লুকাল মা আমার !
স্থির চক্ষু দেখে তোরা বলিস "হরি হরি,"
কোথায় লুকাল মা মোর, আমি তাই হেরি।
দশে মিলে তোরা সবে বলিস "হরি বোল,"
পুলকে শীতল অঙ্গ পেতে মায়ের কোল।
ঐ দেখ দাঁড়ায়ে বাহু পশারিয়া মা,
সবে বলে "নামাও নামাও ঠাণ্ডা হলো গা !"
ভবপারের কর্ত্রী মা মোর মুক্তি-প্রদায়িনী,
বৈতরণী-পারে থেকে ডাকিছেন তিনি।
বিষম কলুষ তাপ ভবতাপগেহ,
সে তাপে বিষম তপ্ত বৈতরণী দেহ।

সে তাপ সংহার হয় নদী-সন্তরণে,
আনন্দে বিহ্বল বৈতরণীর জীবনে।
সংসার-কলুষধ্বংস বৈতরণীজলে,
বাহু পশারিয়া মাতা তুলে নিবেন কোলে।
অনায়াসে পাব আমি মহামায়ার কোল,
করবে স্বজনের কাজ, বল "হরি বোল"।
শবরূপী দেহ মোর বাঁধ দৃঢ় ক'রে,
যেন রে ভব-বন্ধন নাহি ঘটে ফিরে।

শ্রীঅঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য।



মায়ের মূর্ত্তি।

মা আমার কোথায় গেলেন? যে মা দশভুজারূপে সিদ্ধিদাতা গণেশ, সুরসেনানী কার্ত্তিকেয়, সর্ব্ব-সম্পদ্‌রূপা লক্ষ্মী এবং সর্ব্ব-বিদ্যাস্বরূপা সরস্বতীকে সঙ্গে করিয়া আমার কুটীরে আসিয়াছিলেন, সে মা আমার কোথায় গেলেন? কোন নির্ম্মম পাষাণ আমার মা'কে লইয়া বিসর্জ্জন দিলে? ঐ দেখ, বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী, চৈতন্যময়ী ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াময়ী মহাশক্তির আগমনে যে ধরণী উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া শুভ্র-কাশ-কুসুম-রূপ কৌষেয়-বসন পরিধান করিয়াছিল, আজ সেই ধরণী ঘনকৃষ্ণসাচ্ছন্ন মসীময় বিষাদবেশ পরিধান করিয়া বিকট ভীতি উৎপাদন করিতেছে! ঐ দেখ, দশদিক্‌-প্রসারিণী, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, বিশ্বময়ী সর্ব্বাণী সর্ব্বজননীর আগমনে যে সুনীলগগন হাস্যময়, যে নীল অরণ্যানী হাস্যময়ী এবং যে প্রসন্নসলিলা তটিনী কুমুদকহ্লার-দলে শোভাময়ী হইয়াছিল—আজ সেই গগন বিষাদময়, সেই অরণ্যানী বিষাদময়ী, সেই তটিনী শোভাহীনা হইয়াছে। মা আমার কোথায় গেলেন? যে মায়ের আগমনে সুগন্ধবহ-সমীরণ শারদ ফুল্ল কুসুমাবলীর সৌরভরাশি দশদিকে বিলাইয়া দিতে দিতে মন্দ মন্দ বহিতেছিল—যে মায়ের আগমনে রাজা প্রজা ধনী নির্ধন ইতর-ভদ্র সকলের অন্তঃকরণে আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছিল, সেই তত্ত্বময়ী, ভাবময়ী, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী পরমানন্দরূপিণী আদ্যাশক্তি মা আমার কোথায় গেলেন!

না, না,—মা ত আমার যান নাই। এই যে আমার মা আমার দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে বিরাজ করিতেছেন—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি"

আমিই আমার ইষ্টদেব-দেবী—আমিই আমার মা। আমা ছাড়া অন্য দেবতা নাই। আমার দেবতা স্বর্গে বসিয়া থাকেন না, তিনি হৃদ্‌বিহারিণী—আমারই মধ্যে আছেন, আমাতেই আছেন। তিনি আমারই হিতের জন্য কখনও স্ত্রী, কখনও বা পুরুষরূপে আবির্ভূত হন।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ম স্ত্রীপুংরূপং ধত্তে"

আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিলে তিনি উমা, শ্যামা, গৌরী; আমি তাঁহাকে পিতা বলিলে তিনি শিব বা বিষ্ণু; আমি তাঁহাকে রাজা বলিলে তিনি শ্রীরামচন্দ্র আর আমি তাঁহার কিঙ্কর; আমি তাঁহাকে সখা বলিলে—তিনি পার্থসারথি, আমি প্রাণনাথ বলিলে তিনি রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ। আমার সাধ মিটাইবার উদ্দেশ্যেই আমি তাঁহাতে রূপের আরোপ করি।

নয়নে লিপ্ত অঞ্জন যেমন ঠিক্ দেখিতে পাওয়া যায়না, নাসিকার মধ্যে ফুল গুঁজিয়া দিলে তাহার গন্ধ যেমন পাওয়া যায় না, সেইরূপ দেহস্থ আত্মরূপ মা'কে ভাল করিয়া দেখা যায় না। আমি মা'কে ভাল করিয়া দেখিব বলিয়া তাঁহাকে পৃথক্ করিয়াছিলাম। আমি মা'কে নয়ন ভরিয়া দেখিব বলিয়াই আমার দেহ হইতে একটু দূরে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। দূরাগত বংশীধ্বনি অতি মধুর। শ্রবণের সাধ মিটাইতে হইলে, দূরের বিহঙ্গ-কলরব, দূরের সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে হয়। পুষ্পপরাগ পবন-সন্তাড়িত হইয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে, তবেই তাহার সৌরভ-বোধ হয়। দেহস্থিত আত্মরূপা জগদম্বাকে অনুভূতি বা আসক্তির সাহায্যে বুঝিতে বা জানিতে হইলে, দেহ হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র করিয়া—দেহ হইতে তাঁহাকে বাহিরে রাখিয়া, তাঁহার আরাধনা করিতে হয় বলিয়াই আমি চিন্ময়ীমায়ের মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি গড়িয়া একবার প্রাণ ভরিয়া বলিয়াছিলাম—

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।

তোমরা আমার মায়ের মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া মনে করিয়াছ, বুঝি আমি মাতৃহারা হইলাম, কিন্তু একবার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ,

মা আমার দেহস্থ হিমালয়-পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছেন। মা আমার হিমালয়-কন্যা। এ হিমালয় পাষাণময় নহে, আমার দেহে বামকোণ-ব্যাপী এক হিমালয় আছে, ইনি তদ্দেশজাতা মনোময়ী কন্যা। দেহের বামকোণে হৃৎপিণ্ড, তাহারই মধ্যে পর্ব্বে পর্ব্বে বিস্তৃত ভাবময় হিমগিরি আছে। আমি মাকে দেহস্থ দক্ষিণকোণের কৈলাসপর্ব্বত হইতে নামাইয়া হৃদয়ে— হিমালয়ে আনিয়া বসাইয়া এবার দুর্গোৎসবের অকালবোধন করিয়াছি। মা আমার কন্যারূপে আসিয়াছিলেন; কন্যাকে ডাকিবার কালাকাল নাই, যখন ইচ্ছা তখন ডাকা যায়, তাই এই অকালে মাকে কন্যা-ভাবে ডাকিয়াছিলাম—মাও পিতার ডাকে নাচিতে নাচিতে সোহাগে আদরে গলিয়া ঢলিয়া বাপের কোলে আসিয়া বসিয়াছিলেন। আবার বসন্তে আমি জগদম্বাকে মাতৃরূপে আহ্বান করিব—আমি সেই মায়ের কাছে আমার ভাল-মন্দ সকল সাধ ব্যক্ত করিব, করযোড়ে মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া আমার ধন, জন, রূপ, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, কন্যা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব।

দুর্গোৎসবে মা আমার বিশ্বময়ী ও আত্মময়ী। মা আমার দেহ-ঘট-মধ্যস্থা কন্যা উমা—দক্ষিণাকালী। মায়ের মণ্ডপভরা ঘর-আলোকরা প্রতিমার দিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়াছিলে কি?

আমি মায়ের মৃণ্ময়মূর্ত্তি পূজা করি বলিয়া তোমরা—ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ আমাকে উপহাস করিয়া থাক! কিন্তু জান কি, কি কারণে পৌরাণিক ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাকার মহর্ষিগণ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন? সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা। "নিরুপাধি আদি-অন্ত-রহিতের" ধ্যান-ধারণা কি সকলেরই সাধ্যায়ত্ত? অসম্ভব! যখন সকলের মনের বল একরূপ নহে, তখন সকলেই যে সচ্চিদানন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারেনা। জোর করিয়া এরূপ লোককে ভগবানের ধারণা করাইতে গেলে হিতে বিপরীত হইতে পারে, তাহাতে নাস্তিক্যবুদ্ধির উদয় হইতে পারে। তাই এই সমস্ত দুর্ব্বলচিত্ত লোকের সাধন-পন্থা সুগম করিবার জন্য, তাহাদের চিত্তের অবস্থানুসারে ব্রহ্মধ্যানের অবলম্বন-স্বরূপ— সেই নিরাকারের আকার কল্পনা করা হইয়াছে।

ভগবান্ আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। আমরা তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য, তাঁহার ভক্তি-বর্দ্ধনের জন্য, আমাদিগের স্থূল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় গ্রহণ করি। যাঁহারা নিরাকারবাদী, তাঁহারাও ভগবানের মূর্ত্তি কল্পনা না

করিয়া তাঁহার ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন না। কেহ মনে মনে মূর্ত্তি গড়ে—কেহ শব্দের দ্বারা মূর্ত্তি গড়ে—আর কেহবা প্রস্তর-মৃত্তিকার মূর্ত্তি গড়ে—প্রভেদ এই পর্য্যন্ত!

ঔপনিষদযুগের হিন্দুধর্ম্মে মূর্ত্তি-কল্পনা করা হয় নাই; কেননা তখন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নাধিকারী লোক ছিল না—অথবা এত অল্প ছিল যে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করার সময় উপস্থিত হয় নাই। তারপর যখন অনুন্নত অনার্য্যসন্তানগণ হিন্দুসমাজে আশ্রয় লাভ করিল, এবং তাহাদের সংসর্গে পতিত হওয়ায় পুরাতন-সমাজের জনসাধারণের চিত্তবৃত্তির অবনতির সূত্রপাত হইল, তখনই ঐ সকলব্যক্তির হিতের জন্য আর্য্য ঋষিগণ পুরাণ-তন্ত্রের সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগের ধ্যান-ধারণার উপযোগী করিয়া ভগবানের মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন। লেখা পড়া শিখিতে হইলে যেমন বর্ণপরিচয় আবশ্যক, সঙ্গীত-বিদ্যা শিখিতে হইলে যেমন স্বর-লিপী শিক্ষার প্রয়োজন, ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য তেমনই প্রথমে যে সকল পদ্ধতির প্রয়োজন হয়, এই মূর্ত্তিপূজা তাহাদের অন্যতম। সেই অনির্ব্বচনীয় অসীমের উপলব্ধির ইহাই সসীম ও সরল সোপান। এই সোপান ধাপে ধাপে আরোহণপূর্ব্বক অতিক্রম করিলে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

তোমরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ একমাত্র ভগবানের একমাত্র নামকরণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছ। আমরা হিন্দু, আমরা তাঁহার নানাভাবের নানাপ্রকার নামকরণ করিয়াছি। যিনি নিজে অনন্ত, তাঁহার গুণও অনন্ত, ভাবও অনন্ত; সুতরাং আমাদের নিকট তাঁহার নামও অনন্ত। হিন্দু যে মূর্ত্তি কল্পনা করে, তাহা ভগবানের স্বরূপের মূর্ত্তি নহে, ভগবানের ভাবের মূর্ত্তি। নিরাকার ভাবকে আকার প্রদান করাই হিন্দুর মূর্ত্তি-কল্পনার সার্থকতা। যে হিন্দু রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছে, মানবের মনোবৃত্তির মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছে, ঋতু-পরিবর্ত্তনাদি নৈসর্গিক শোভার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছে, সেই হিন্দুই উপাসকের হিতার্থে উপাসনার পন্থা সুগমতর করিবার জন্যই নিরাকার ব্রহ্মের ভাব-সমূহের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছে। তাই এই কল্পিত মূর্ত্তি সর্ব্বত্রই এক নহে—সকল মূর্ত্তিই এক নহে। সৃষ্টিতত্ত্বের যে ভাব, তা'র মূর্ত্তি একরূপ; স্থিতি-তত্ত্বের যে ভাব, তা'র মূর্ত্তি অন্যরূপ, আবার লয়তত্ত্বের যে ভাব, তা'র মূর্ত্তি অন্যরূপ। ভগবানের বিদ্যা বা জ্ঞানের মূর্ত্তি একরূপ, ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি

অন্যরূপ! তিনি অনন্ত রূপের অনন্ত সাগর, এই সকল কল্পিত মূর্ত্তি সেই রূপ-সাগরের এক একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বুদ্বুদ্‌মাত্র।

পাঠক, উপরে মূর্ত্তি-উপাসনার অনুকূলে তান্ত্রিক ও পৌরাণিক মত প্রকাশ করিয়া যাহা বলিলাম, তাহা পাঠ করিয়া যদি তোমরা অন্ততঃ একবারও "মায়ের মুরতিকে" শুধু পুত্তলিকা মাত্র মনে না কর, তাহা হইলে এ দীন তাহার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিবে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শ্যামার আগমন।

এই না ঘোর গভীর ঘটায়
গরজিল মেঘ আকাশে—
হের হের আজি কি সুন্দর
তারকার ভাতি প্রকাশে!
বিস্তার সে নীল-সিন্ধু-সম
বিতত মধুর নীলিমা—
কোন' কবি বিবর্ণিতে নারে-
আদিকবির এ মহিমা!
অতলে যেন মণি ঝলে
গগনে উজলে গ্রহ—
তমসা-ময়ী দীপালী-রজনী
সভয়ে বহে গন্ধবহ!
শ্যাম-শস্য-সমাবৃতা ধরা
কুসুম বিলসিত অঙ্গে;
বেদী-মূলে আবাহন ফলে
শ্যামা আসিয়াছেন বঙ্গে!

শ্রী——ভট্টাচার্য্য।

কতিপয় প্রশ্নের উত্তর।

গত আষাঢ় ও শ্রাবণ-মাসের হিন্দুপত্রিকায় আমার লিখিত—"বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমাচার"—শীর্ষক প্রবন্ধের উপর শ্রীযুক্ত নীলাম্বর হুই মহাশয় কতিপয় প্রশ্ন করিয়াছেন, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি।

শ্রীযুক্ত হুই মহাশয়ের—

১ম প্রশ্ন। বৈষ্ণবধর্ম্ম কতপ্রকার? আমরা জানি যে, যিনি বিষ্ণুর উপাসক, তিনিই বৈষ্ণব।

আমার উত্তর,—আমরাও জানি যে যিনি বিষ্ণুর উপাসক, তাঁহাকেই 'বৈষ্ণব' বলে, কিন্তু মূর্ত্তিভেদে, সম্প্রদায়ভেদে, আচারভেদে ইহাদের মধ্যে বহু অবান্তর-ভেদ আছে। যেমন শক্তি-মন্ত্রের উপাসক মাত্রেই শাক্ত, তাহার মধ্যে যেমন পশ্বাচারী, বীরাচারী, দিব্যাচারী প্রভৃতি বহুবিধ শাক্ত আছেন, এবং কালী, তারা ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি মূর্ত্তিভেদেও বহু ভেদ দেখা যায়, তদ্রূপ বৈষ্ণব-গণের মধ্যেও রামোপাসক, কৃষ্ণোপাসক, নারায়ণোপাসক-ভেদে বহুভেদ আছে, এবং সম্প্রদায়ভেদে প্রধানতঃ চারিটি বিভাগ দেখা যায় যথা;—"শ্রীমাধ্বরুদ্রসনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ"—শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, মাধ্ব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, রুদ্রসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, এবং সনকসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব; ইহাদের মধ্যে আচারগত ও উপাসনা-প্রণালীগত ভেদ আছে; ইহা ছাড়া তন্ত্রোক্ত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের দশটি শ্রেণী আছে, বাহুল্যভয়ে তাহাদের উল্লেখ করিলাম না। ঔৎসুক্য থাকিলে শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত হুই মহাশয়ের—

২য় প্রশ্ন। "শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের" কথা লেখক মহাশয় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ এই যে, মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শাস্ত্রবর্ণিত বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র কিনা? স্বতন্ত্র হইলে উহা কি প্রকার?

আমার উত্তর,—মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম, উপরোক্ত পদ্মপুরাণীয় শ্রীমাধ্বরুদ্র-সনক এই সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের অন্তর্গত মাধ্বসম্প্রদায়ানুমোদিত, সুতরাং শাস্ত্রবর্ণিত বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে।

শাস্ত্রোক্ত মূল সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করিলে সাধারণের পক্ষে বুঝিবার অসুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া, সর্ব্বজনবিদিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নামোল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া "মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম" বলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করার আরও একটি বলবৎ কারণ ছিল সেটি এই;—আমাদের দেশে আউল বাউল প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরই প্রাচুর্য্য অধিক; এবং উহাদের মধ্যে শ্রুতি-স্মৃতিবিরুদ্ধ অনেক আচার দেখা যায়, অথচ উহারা "গৌর-নিতাই" বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, কাজেই অনেকে উহাদের আচরিত ধর্ম্মকেই "মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম" মনে করিয়া, "বৈষ্ণবধর্ম্ম সদাচার-বিরুদ্ধ"—বলিয়া মিথ্যা কলঙ্কারোপ করিয়া থাকেন। যাহাতে ঐরূপ ভ্রম সংঘটিত না হয়, তজ্জন্যই পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত দুই মহাশয়ের—

৩য় প্রশ্ন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব কি ছিল? তিনি ব্রজের ভাবের ভাবুক ছিলেন কিনা? ব্রজে শান্ত, দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্য এই পাঁচটি ভাব আছে জানি। "ব্রজের ভাবের" মধ্যে ঐশ্বর্য্যের ভাব আনিলে ব্রজের ভাব অন্তর্হিত হয় কিনা?

আমার উত্তর—এই প্রশ্নের কি সঙ্গতি আছে তাহা আমার স্থূলবুদ্ধির অগোচর। আমি মহাপ্রভুর কোনও ভাবেরই সমালোচনা করি নাই, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের নিকট দিয়াও হাঁটি নাই। আমি মাত্র বলিয়াছিলাম যে, "সাধন-ভজন দ্বারা জীবের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে জীবমাত্রেই ভগবানের নিত্যদাস এবং ইহাই জীবের স্বরূপ, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে জীব ত্রিতাপের হাত হইতে অব্যাহতি পায়।" ইহার মধ্যে প্রশ্নকর্ত্তার তৃতীয় প্রশ্নের অবসর কোথায় বুঝিলাম না। যাহাহউক্—যে ভাবেই প্রশ্ন হউক্, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিয়াছি তাহার উত্তর দিতেছি।

মহাপ্রভু পূর্ণ ভগবান্ নিখিলভাবসাগর; তাঁহাতে সকল ভাবই ছিল, কোনটির বা সময় সময় প্রাবল্য প্রকাশ পাইত, কোনটির বা অল্পতা অনুভব হইত।

ব্রজে শান্ত দাস্য হইতে মধুর পর্য্যন্ত এই পাঁচটি ভাবের অস্তিত্ব প্রশ্নকর্ত্তা অবগত আছেন বলিয়া স্বীকার করেন ঐশ্বর্য্যবর্জ্জিত শান্তভাব কেমন, বুঝিলাম না এবং প্রশ্নকর্ত্তাও তাহার কোনও দৃষ্টান্ত দিলেন না। এই বিষয়টি

বিশদভাবে বুঝাইয়া লিখিলে, যদি শক্তি হয়, বারান্তরে উত্তর দিব। তৃতীয় প্রশ্নের শেষ অংশের উত্তর পঞ্চমপ্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গেই দেওয়া হইবে; একন্য আর স্বতন্ত্র লিখিলাম না।

শ্রীযুক্ত হুই মহাশয়ের—

৪র্থ প্রশ্ন। ব্রজের দাস্যভাবের অর্থ 'সেবা করা' আমাদের এই ধারণা। আমি আমার সংসার অর্থাৎ পুত্র কন্যা প্রভৃতির দাস, তাহাদিগের সেবা করি খাওয়াই পরাই ইত্যাদি। "তুমি প্রভু আমি দাস" ব্রজের দাস্য এভাবের নহে..............প্রাণসখা, প্রাণবল্লভ, ভাইকাণাই ইত্যাদি আহ্বান........।

আমার উত্তর—ব্রজের দাস্যভাবের অর্থ সেবা করা, কিন্তু মথুরার দাস্যভাবের অর্থ কি অন্য কিছু, বুঝিলাম না। আমার কিন্তু ধারণা, সকলস্থানের দাস্য-ভাবের অর্থই সেবা করা। প্রশ্নকর্ত্তা ব্রজের দাস্যভাবের বর্ণনা করিয়া যে কয়টি দৃষ্টান্ত দিলেন, তাহাতে পাঁচটি ভাব পূরণ হয় কৈ? উহাতে ত কেবল সখ্য বাৎসল্য মধুর এই তিনটি ভাবেরই পরিচয় পাওয়া গেল। ব্রজের দাস্যভাবের দৃষ্টান্ত কোন্‌টি বুঝিলাম না। সখ্য বাৎসল্যাদিভাবে যে দাস্যভাবের আভাস পাওয়া যায়, তাহার কারণ পূর্ব্বপূর্ব্বভাব পরপরভাবে অনুপ্রবিষ্ট, তাই বলিয়া "প্রাণসখা—প্রাণবল্লভ—ভাইকাণাই" এগুলি দাস্যভাবের সম্বোধন নহে। শান্ত দাস্য ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান বর্জ্জিত নহে—যথা,—চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য-লীলা ১৯শ পরিচ্ছেদ—

* * * *

কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণা-ত্যাগ শান্তের দুই গুণে ॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে ॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য অধিক হয় দাস্যে ॥
ঈশ্বর-জ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসে হয় দুইগুণ ॥

* * *

• • •

প্রশ্নকর্ত্তা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানবর্জ্জিত শান্ত-দাস্যরসের কথা কোথায় পাইলেন, ও তাহা কিরূপ—জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীযুক্ত দুই মহাশয়ের—

৫ম প্রশ্ন। গৌরাঙ্গমহাপ্রভু প্রসাদ-ভক্ষণ করিতেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে "ব্রজের ভাবের" বিরোধী বলিয়া মনে করিতে পারি কিনা?

আমার উত্তর—প্রসাদ-ভক্ষণ কেবলমাত্র সখ্য ও বাৎসল্যভাবের বিরোধী হইতে পারে, অন্য কোনও ভাবের বিরোধী নহে। শান্ত-দাস্যে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান পূর্ণ থাকে, সুতরাং তাহাতে ত কোনও কথাই নাই, মধুররসেও প্রসাদ-ভক্ষণ বিরোধী বলিয়া আমার অনুভব হয় না, কারণ কোন্ নারী না স্বামীর পাতে প্রসাদ পাইয়া থাকেন? দ্বিতীয় উত্তর,—মহাপ্রভু যেরূপ ব্রজমাধুরী প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ কলির যুগ-ধর্ম্ম হরিনাম-কীর্ত্তন দ্বারা ভগবদ্ভজন প্রকাশ করিতেও আসিয়াছিলেন। প্রসাদ-ভক্ষণ ব্রজভাবের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিলেও ভক্ত-ভাবের বিরোধী নহে, পরন্তু অনুকূলই। মহাপ্রভুতে উভয় ভাবই ছিল।

তৃতীয় প্রশ্নের শেষাংশের উত্তরে আমার বক্তব্য—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মাত্রেই যে ব্রজভাবের বিরোধী, তাহাও বলা যায় না। যে কালাবচ্ছেদে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান থাকে, সেই কালাবচ্ছেদেই মাধুর্য্যানুভূতি না হইতে পারে, কারণ জ্ঞানের যৌগপদ্য নাই, কিন্তু এককালাবচ্ছেদে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান ও ভিন্নকালাবচ্ছেদে মাধুর্য্যজ্ঞান হইতে বাধা কি আছে? সাধকজীবন একেবারে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-বর্জ্জিত হইতে পারে না। ইষ্টে ভগবত্ত্ব-জ্ঞান না থাকিলে উপাসনা হইবে কিরূপে? চির-কালই যদি সে ভগবান্‌কে "প্রাণনাথ,—ভাই-কানাই, দুষ্ট ছেলে" বলিয়া মনে করে, আর অপর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া না মানে, তবে তাহাকে ঈশ্বর-নাস্তিক বলিতে হয়। "ভাই কানাইয়ের" মন্ত্রে কেহ দীক্ষিত হয় না; (ভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য হয়।) কই কোনও সাধকই ত তাহা করেন না। সকলই ত স্ব স্ব পুত্র-কন্যাকে ভাল বাসিয়া থাকেন, তাহাতে কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারেন না কেন? অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতেই ত তিনি আছেন? তাহার হেতু পুত্র-কন্যায় ভগবত্তা-জ্ঞান থাকে না। আর সাধক যে ভগবান্‌কে পুত্র-কন্যার ন্যায় ভাল বাসেন, তাহার মূলে ভগবত্তা-জ্ঞান থাকে।

অপরপক্ষে পঞ্চমপ্রশ্নের সমাধানে বলা যায়; মহাপ্রভুকে যদি কেবল-মাত্র মধুরভাবের প্রচারক বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তাহাতেও প্রসাদ-ভক্ষণ

দোষাবহ নহে। শিক্ষক যিনি তিনি গোঁড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই শিক্ষা দিয়া থাকেন; B. A. পর্য্যন্ত পড়িব আশা করিয়া যে বালক প্রথম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তাহাকে A, B, C. D, হইতেই পড়িতে হয়; প্রথমেই B. A. এর পাঠ্য পড়া যায় না, সেইরূপ ব্রজভাব সাধন করিতে হইলেও প্রথমতঃ সাধন-ভক্তির আচরণ করিতে হয়। এই সাধন ভক্তি দুইপ্রকার—বৈধী ও রাগানুগা; ব্রজভাব-লোলুপসাধক এই রাগানুগাভক্তির আচরণ করিয়া থাকেন, যথা চরিতামৃতে;—"লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি, শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানে রাগানুগপ্রকৃতি"—এই রাগানুগাভক্তিরও বাহ্য ও অন্তর দ্বিবিধ সাধনা; বাহ্য সাধনায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে, যথা চরিতামৃতে;—"বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্য সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন। মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন"।—সুতরাং রাগমার্গের সাধকের পক্ষেও ভগবানের প্রসাদ-ভোজন গুরুতর অপরাধের বিষয় বলিয়া মনে করিনা।

সাধক-জীবনে দাস্যভাব মজ্জাগত; মধুরভাবের চরমে গিয়াও পুনরায় দাস্য-ভাবে লোভ হয়। স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাবেই ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয়, প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়, এবং অতিদৈন্যে দাস্যে অভিলাষ হয় যথা চরিতামৃতে;—"অতিদৈন্যে পুনঃ মাঁগে দাস্য-ভক্তিদান।.........তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পাসরিয়া, পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হইয়া। কৃপা-করি কর মোরে পদধূলি-সম, তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন"।—কেবল চরিতামৃতে নহে, সমস্ত সাধকের গ্রন্থেই সাধনার চরমাবস্থায় পুনরায় এই দাস্যভাবে লালসা দেখিতে পাইবেন,—ইষ্টের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা দেখিতে পাইবেন। সামান্য দুটি দৃষ্টান্ত দেখুন। মধুরভাবের গুরু বিদ্যাপতির চরম প্রার্থনা শুনুন;—গণয়িতে দোষগুণ লেশ না পাওবি যব তুহুঁ করবি বিচার। তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি জগ বাহির নহি মুই ছার"—শ্রীরাধামাধবের কুঞ্জ-কোকিল শ্রীশ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীমতীর মুখ দিয়া কি উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন শুনুন;—"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ। দেহ মন আদি সকল সঁপেছি জাতি কুল শীল মান॥ অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া যোগীর আরাধ্য ধন। গোপ গোয়া-লিনী হাম অতিহীনা না জানি ভজন পূজন"——ইহা ছাড়া জয়দেব, গোবিন্দ-দাস, লীলাশুক প্রভৃতি প্রত্যেকের গ্রন্থে ভূরি ভূরি ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ গান মিলিবে। প্রশ্নকর্ত্তা ইহাদিগকে কি বলিতে চান? প্রশ্নকর্ত্তা যদি ইহাদিগকে ব্রজের

কুঞ্জ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির আর দুঃখ কি? আমাদের ত সে অধিকার কস্মিনকালেও নাই, যাহা নাই তাহা হারাইবারই বা ভয় কি?

শ্রীযুক্ত দুই মহাশয়ের—

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া দেখিতে পাই, তিনি (গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু) হরি, কৃষ্ণ, রাম, এই নাম করার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আজ কাল আমরা "গৌর নিতাই—প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ' ইত্যাদি বলিয়া থাকি। তাঁহার উপদেশের অন্যথায় তাঁহার নিজের নাম করায় তাঁহাকে অগ্রাহ্য করা হইতেছে না কি? এরূপ করায় গুরুবাক্য-লঙ্ঘনের আশঙ্কা হয় না কি?

আমার উত্তর—মহাপ্রভু ঐ তিনটি নাম করিতে বলিয়াছেন, এই কথাটিই ভুল। তিনি ঐ তিনটি নাম করিতে বলেন নাই, "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥"——এই মহামন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছেন। "হরি, কৃষ্ণ, রাম," এইরূপ ভাবে নাম করিলে, ঐ নামোচ্চারণের ফল হইবে, কিন্তু ঐ মহামন্ত্র-জপের ফল হইবে না। "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" ইহার পরিবর্ত্তে "কৃষ্ণহরে কৃষ্ণহরে"—বলিলেও হইবে না। ঠিক্ উহাতে যেরূপ পর্য্যায়ে নাম গুলি গ্রথিত আছে, সেই ভাবে তাহার উচ্চারণ করিতে হইবে। মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষিরা যাহা দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়া রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার এক চুলও তুমি আমি পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। পারিলে সকলেই মন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম। যাক্ সে কথা, উহার আলোচনা করিতে হইলে একখানা গ্রন্থ লিখিতে হয়, আমার সেরূপ সাধ্য ও সময় উভয়েরই অভাব। আমি স্বীকার করিয়া লইলাম, মহাপ্রভু ঐ তিনটি নামই না হয় করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি অনন্তনামধারী ভগবানের ঐ তিনটি নাম ব্যতীত অন্য নাম করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন? আপনারা ত সকলেই গুরুর নিকট হইতে ইষ্টের একটি নাম ও মন্ত্র পাইয়াছেন, এখন সেই নামটি ভিন্ন কি অন্য কোনও নাম উচ্চারণ করেন না? অনেকেই ত ইষ্টের শতনাম সহস্রনাম প্রভৃতি পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাতে কি ইষ্টকে অগ্রাহ্য করা হয়?

আর যদি মহাপ্রভুকে ভগবান্ না বলিয়া 'গুরু' বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলেও ত ইষ্টনাম-জপের পূর্ব্বে গুরুনাম-জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরু ও ইষ্ট যে অভিন্নরূপে উপাসনা করিতে হয়।

এ বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা ও "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি মন্ত্রের উপাস্য কে—ইত্যাদি বিষয় বহু পূর্ব্বেই হিন্দু-পত্রিকায় আমার লিখিত "গৌরাঙ্গ-কথা"-শীর্ষক প্রবন্ধে বাহির হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আর বিস্তার করিলাম না।

শ্রীযুক্ত দুই মহাশয়ের—

৭ম প্রশ্ন। ব্রজের ভাব ও নবদ্বীপের ভাবের পার্থক্য কি ?

উত্তর—(এ প্রশ্নটিও বোধ হয় অবসর-সঙ্গতি ক্রমেই হইয়াছে) ব্রজে যে লীলার অভিনয় হইল, তাহা মনুষ্যজীবনে প্রতিফলিত করিয়া কিরূপে সাধন-ভজন করিতে হয়, নবদ্বীপে তাহাই দেখান হইল। ব্রজে একমাত্র বৃষভানু-নন্দিনীই রাধা, আর নবদ্বীপে জীবমাত্রেই রাধা। ব্রজে আদান, নবদ্বীপে প্রদান। ইহারও বিস্তৃত বিবরণ "গৌরাঙ্গ-কথা"-শীর্ষক প্রবন্ধে বাহির হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর বিস্তার অনাবশ্যক।

প্রশ্ন-কর্ত্তার অপর একটী প্রশ্নের বা সমালোচনার কোনই হেতু বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিয়াছিলাম যে, মানুষের পক্ষে মানুষকে ভগবানের দাস জ্ঞান করা কতকটা সহজসাধ্য, কিন্তু তির্য্যক্‌জাতিকে পর্য্যন্ত নিজের তুলনায় সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া "ভগবানের দাস" জ্ঞান করা কঠিন। তাহারই দৃষ্টান্ত দিতে বলিয়াছিলাম যে, "জীবমাত্রেই ভগবানের নিত্য দাস—এ জ্ঞান তাঁহাদেরই দৃঢ় হইয়াছে, যাঁহারা ঈদৃশ বিষধর সর্পটিকেও "প্রিয়তমের দূত" জ্ঞান করিয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিতে পারেন।" দূত দাস বৈ আর কি ? সর্পকেই ভগবানের দাস বলা হইয়াছে। পওহারী বাবা ভগবান্‌কে 'প্রাণ-বল্লভ' জ্ঞান করিতেন—কি 'হর্ত্তাকর্ত্তা প্রভু' জ্ঞান করিতেন, তাহাত কিছুই বলা হয় নাই। আমার প্রাণ-বল্লভ বা প্রাণ-সখার দাসকে দেখিয়া যদি—"এটি আমার প্রিয়তমের দাস"—এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে কি আমার প্রাণসখাকে প্রিয়প্রভু বলা হইল ?

একটি প্রশ্ন।

প্রশ্ন-কর্ত্তা ত দেখিতেছি তাঁহার প্রাণ-বল্লভের দাসকেও 'দাস' বলিলে নিজের মধ্যে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-সম্বলিত দাস্যভাব আসিবার আশঙ্কায় আকুল। ব্রজের ভাবের চরম যে মধুর ভাব, সেই মধুর ভাবের আশ্রয় যে ব্রজগোপীগণ তাঁহারা, সেই মধুর ভাবের চরমোৎকর্ষ রাসলীলা-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে যে স্তুতি করিয়াছিলেন বা বিলাপ করিয়াছিলেন ('স্তুতি' শব্দের প্রয়োগে ঐশ্বর্য্যের ভাব ব্যক্ত হওয়ায় আবার যদি কৈফিয়তের দায়ে পড়ি, এজন্য 'বিলাপ' বলিতে

বাধ্য হইলাম) শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ঐ বিষয়ক তিনটি মাত্র শ্লোক উল্লেখ করিলাম। ‡ ঐশ্বর্য্যভাব ত্যাগ করিয়া প্রশ্নকর্ত্তা ইহাদের কিরূপ ব্যাখ্যা করেন, দয়া করিয়া জানাইলে, বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হইব।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাম্য ও নৈমিত্তিক প্রভৃতি কার্য্যে অঙ্গহানি-জন্য দোষ স্পর্শে ও সেই দোষনিবৃত্তির জন্য শ্রীহরির নাম স্মরণ করার বিধি আছে। কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের আদিতে মধ্যে ও অন্তে হরি-স্মরণ করার বিধি আছে। সুতরাং নামাশ্রয়ে অঙ্গবৈকল্যনিবন্ধন কোন দোষ সম্ভবপর নহে। নামাশ্রয়ে কোন শঙ্কা বা পাত্রাপাত্র-বিচার নাই। বৈগুণ্য-সমাধানার্থই হরিস্মরণ করা হইয়া থাকে, সেই হরি-নামাশ্রয়ে কোনই দোষাশঙ্কা থাকিতে পারেনা। পণ্ডিতগণ বলেন, নাম ও নামীর প্রভেদ নাই। সুতরাং শক্তিহীন, কঠোরসাধনহীন স্বল্পায়ু মানবের পক্ষে এই ঘোর কলিযুগে একমাত্র "নাম" আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—

---

‡ শ্রীমদ্ভাগবতের সেই শ্লোক তিনটি এই :—

শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপিবক্ষসিপদং কিল ভৃত্যজুষ্টং॥
যস্যাঃ স্ববীক্ষণকৃতেঽন্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥ ১

ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৯শ অধ্যায় ৩৭ শ্লোক।

ন খলু গোপিকানন্দনোভবান্।
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্॥
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে।
সখ উদেযিবান্ সাত্বতাং কুলে॥ ২

ঐ ঐ ৩১শ অধ্যায় ৪ শ্লোক

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং।
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি॥
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চতে।
রমণ নঃস্তনেষর্পয়াধিহন্॥ ৩

ঐ ঐ ঐ ১৩ শ্লোক।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং।

সত্যযুগে ধ্যান-ধারণায়, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরযুগে পূজাদি দ্বারা যে ফল লাভ অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, কলিতে একমাত্র শ্রীহরির নাম-সংকীর্ত্তন বলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। মানব যখন অনন্যোপায় হইয়া, দিশাহারা হইয়া, হতাশপ্রাণে ভগবানকে থাকিতে থাকে, তখন, ভক্তবৎসল হরি, ভুবনে অবতীর্ণ হইয়া, মানবের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যখন নানাবিধ কল্পিত চিন্তাপ্রবাহ মধ্যে মানব-হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নামযজ্ঞ-প্রবর্ত্তনের জন্য শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইলেন। গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম-বন্যায় ভারতভূমি প্লাবিত করিলেন। বিমূঢ় ব্যক্তিরাও নিগূঢ় শাস্ত্রার্থ বুঝিতে সক্ষম হইল। পণ্ডিতাভিমানী কত শত ব্যক্তি প্রবল প্রেমবন্যায় ভাসিয়া গেল। নামযজ্ঞ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কেহ ২ বলেন, গৌরহরি নূতন পন্থা প্রদর্শন করিয়া বেদবিহিত আশ্রম-ধর্ম্মের বিনাশ-সাধনের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। কথাটা প্রকৃত নহে। "ভবতি নিশ্চয়দার্ঢ্যাৎ সর্ব্বশাস্ত্রসংরক্ষণং" ভগবদ্বিষয়ে যদি নিশ্চয়ের দৃঢ়তা জন্মে, তাহা হইলেই সকল শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব তীব্র-বৈরাগ্য-বলে প্রেমভক্তির উদয় হইলে বা নামে রুচি হইলে আর কোন গুণ-দোষের অপেক্ষা থাকেনা। ভাগবতের একাদশে কথিত আছে——

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণ-দোষোদ্ভবা গুণাঃ।

আমার প্রতি অনন্তচিত্ত একান্তভক্তদিগের গুণদোষ কিছুই থাকেনা।

জ্ঞানানিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।
ঐকান্তিতাং গতানাং তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ।
ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত তদ্বিঘ্নৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ।

শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানসম্পন্ন বা সংসার-বিরক্ত, বিধিনিষেধের অপেক্ষাশূন্য আমার প্রিয় ভক্ত, আশ্রমবিহিত চিহ্ন ত্যাগ করিয়া বিধিবহির্ভূত হইয়া বিচরণ করিবে। ব্রত-নিয়মাদি ঐকান্তিকভক্তদিগের বিঘ্নস্বরূপ। এখন পাঠক বিচার করিয়া দেখুন, যাঁহারা আশ্রমধর্ম্ম-বিলোপী বলিয়া শ্রীগৌর-হরির বিমলচরিত্রে দোষারোপ করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত কিনা? আরও শুনুন,

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কি বলিতেছেন——

যথা কথমপি শ্রীমান্ শ্রীকান্তং সমুপাশ্রিতঃ।
কুরুতেঽখিলপাপানাং প্রলয়ং কিং পুনর্ব্রতৈঃ।

কোনরূপে কমলাকান্ত শ্রীহরির চরণসরোজে যে আশ্রয় লয়, তাহার সমস্ত পাপ বিলয়প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্রত নিয়মাদির আবশ্যক কি? বিষ্ণু-রহস্যে কি বলিতেছেন শুনুন,

কিংতস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ স্নান-হোমজপব্রতৈঃ।
যেনেন্দ্রিয়গণো ঘোরো নির্জ্জিতোঽদুষ্টচেতসা।
জিতেন্দ্রিয়ঃ সদাশান্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
বাসুদেবপরো নিত্যং নক্লেশং কর্ত্তুমর্হতি॥

যিনি ঘোর ইন্দ্রিয়গণ জয় করিয়াছেন, যিনি সদাশান্ত ও সর্ব্বপ্রাণি-হিতে রত, ও বাসুদেবপরায়ণ, তাঁহার আর কষ্টসাধ্য কোন কার্য্যে প্রয়োজন নাই। এখন অবশ্যই বুঝা যাইবে যে, মহাপ্রভু বেদবিহিত আশ্রমধর্ম্মের লোপসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন না। যিনি শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি ভবার্ণব পার হইয়া যান।

আনন্দিতোঽথবাপার্ত্তঃ ক্রুদ্ধোঽশান্তোথবা হরিং।
যোঽনুকীর্ত্তয়তে ভক্ত্যা সগচ্ছেদ্বৈষ্ণবীং পুরীং।

আনন্দিত, পীড়িত, ক্রুদ্ধ, অশান্তচিত্ত যে ভাবেই হউক, যিনি ভক্তির সহিত ভগবন্নাম-কীর্ত্তন করেন, তিনি বিষ্ণুর ধামে গমন করেন।

গর্ভজন্ম-জরারোগ-দুঃখ-সংসার-বন্ধনৈঃ।
নবাধ্যেত নরোনিত্যং বাসুদেবমনুস্মরন্॥

যিনি সতত বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তাঁহার গর্ভবাস-ক্লেশ, জরা, রোগ, দুঃখ, সংসার-বন্ধন কোন ক্লেশই থাকেনা।

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কি বলিয়াছেন শুনুন।

গীত্বাতু মম নামানি নর্ত্তয়েৎ নামসন্নিধৌ।
ইদং ব্রবীমিতে সত্যং ক্রীতোঽহং তেনচার্জ্জুন॥

আমার নাম গান করিয়া নাম সমীপে নৃত্য করিবে, হে অর্জ্জুন। যিনি এমত করেন, আমি তাঁহার দ্বারা ক্রীত হইয়া থাকি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব পৃথিবীব্যাপী হইতে চলিয়াছে। এশিয়া ইউরোপ সর্ব্বত্র ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রুদ্রমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এক জার্ম্মাণীতে ৪৫০০০ রেলকর্ম্মচারী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে কাতর। ব্যাপার বুঝুন!

রাজধানী-ত্যাগ।

অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ কার্ল সিংহাসন ত্যাগ করিয়া রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮ গাড়ী দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। দৈবী বিচিত্রা গতিঃ।

বোহিমিয়া।

অষ্ট্রীয়ার বোহিমিয়া-প্রদেশের জার্ম্মাণ-অধিবাসীরা বোহিমিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মিশেনবার্গনগরে রাজধানী-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উদারমতাবলম্বী জার্ম্মাণ দলপতি পাশের রাষ্ট্রনায়ক হইয়াছেন। দেখা যা'ক্—শেষ কোথায়!

ভারতীয় বীরের সম্মান।

হংকং এবং সিঙ্গাপুরের গোলন্দাজ সৈন্যদলের হাবিলদার রুদ্র সিং রণক্ষেত্রে সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রদর্শন করায় বৃটিশগভর্ণমেণ্ট তাহাকে Distinguised service medal প্রদান করিয়াছেন। এ সম্মান গৌরবকরই বটে।

সাধুবেশে অসাধু।

হাওড়া—গোলাবাড়ীর পুলিশ কর্ত্তৃক সাধুবেশধারী দু-আনী ও টাকা-জালকারী শ্রীনারায়ণ গোঁসাই ধৃত হইয়াছে। তাহার সঙ্গিগণও অনেকে ধরা পড়িয়াছে। গোঁসাই সমস্ত কথা স্বীকার করিয়াছে। অতঃপর অভিযোগ। আসল সাধু সাবধান!

তনুত্যাগ।

ষ্টেট্‌রেলওয়ের ডেপুটী-ট্রাফিক্-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং রেলওয়েবোর্ডের সহকারী সেক্রেটারী—নির্ম্মলচন্দ্র হালদার মহাশয় সম্প্রতি সিমলায় নিউমোনিয়া-রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেশীয়ের ভাগ্যে রেলবিভাগে এতাদৃশ উচ্চপদলাভ আর ঘটে নাই। নির্ম্মলবাবুর মৃত্যুসংবাদ দুঃসংবাদই বটে।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৫ বর্ষ, ২৫শ খণ্ড ১১শ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৩২৫ সাল। ১৮৪০ শকাব্দ।

দারিদ্র্য-ভঞ্জন-স্তোত্রং।

নমস্তে মুরারে হরে কৈটভারে
নমস্তে দরিদ্রার্ত্তিহারিণ্ দয়ালো।
নমস্তে ঘনশ্যামসুস্নিগ্ধকান্তে
নমস্তে জগদ্দীপন প্রাণকৃষ্ণ॥

মুরারি তুমি হে হরি, কৈটভের অরি,
দরিদ্রের দুঃখনাশ কর দয়া করি;
নবঘন-শ্যামকান্তি ধর কলেবরে,
তোমার চরণে আমি নমি ভক্তিভরে;
জগতের জ্যোতি তুমি, তুমি হে জীবন,
সতত বন্দি হে আমি তোমার চরণ।

নমস্তে মুনীন্দ্রামরেন্দ্রাদিবন্দ্য
প্রফুল্লামলেন্দীবরজ্যোতিতাঙ্গ।
নমস্তে গদাশঙ্খচক্রাব্জ-পাণে
নমস্তে জগদ্দীপন প্রাণকৃষ্ণ॥

ফুল্লনীলপদ্মসম চরণ তোমার,
মুনীন্দ্র সুরেন্দ্র সবে বন্দে অনিবার ;
গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্রধারী তুমি হরি,
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি ;
জগতের জ্যোতি তুমি, তুমি হে জীবন,
সতত বন্দি হে আমি তোমার চরণ।

দ্বিষৎসঙ্গরান্তস্তুরঙ্গপ্রহারিন্
সুহৃৎ-স্যন্দনানন্দসূত-স্বরূপ।
সুমিত্রোচ্ছিদৎপাণ্ডবাশেষশত্রো
নমস্তে জগদ্দীপন প্রাণকৃষ্ণ॥

কুরুরণে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত দিয়া,
আনন্দে পার্থের রথে সারথি হইয়া ;
পাণ্ডবের বহু শত্রু নাশিলে হে হরি,
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি ;
জগতের জ্যোতি তুমি, তুমি হে জীবন,
সতত বন্দি হে আমি তোমার চরণ।

নমঃ শ্রীনিবাসাচ্যুতাদিস্বরূপ
নমো রামরূপাবনীধন্য ভূপ।
রমারামরম্য ব্রতীন্দ্রাধিগম্য
নমস্তে জগদ্দীপন প্রাণকৃষ্ণ॥

অচ্যুত ও শ্রীনিবাস তুমি গুণধাম,
ধরাধন্য নরপতি তুমি হে শ্রীরাম ;
কমলার লীলাক্ষেত্র তব বক্ষঃস্থল,
তোমার আশ্রয় যাচে যোগীন্দ্র সকল ;
জগতের জ্যোতি তুমি, তুমি হে জীবন,
সতত বন্দি হে আমি তোমার চরণ।

নমস্তে জগন্নাথ নারায়ণাখ্য
করীন্দ্রোদ্ধরোৎসাদিতক্রূরনক্র
নমো দ্রৌপদীস্ত্রীনিবার-প্রবুদ্ধ
নমস্তে জগদ্দীপন প্রাণকৃষ্ণ॥

তুমি দেব জগন্নাথ, তুমি নারায়ণ,
তুমি দেব, দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ ;
কুম্ভীর সংহারি গজে করিলে উদ্ধার,
নমি হে তোমার পদে আমি বার বার ;
জগতের জ্যোতি তুমি, তুমি হে জীবন,
সতত বন্দি হে আমি তোমার চরণ।

ব্রজস্ত্রীমনঃ-কৈরবানন্দকন্দো-
জ্জ্বলচ্চন্দনাঙ্কাকলঙ্কাস্যচন্দ্র
ধ্রুবক্ষুণ্ণহৃৎপদ্মভানুপ্রকাশ
নমস্তে জগদ্দীপন প্রাণকৃষ্ণ ॥

মনোহর মুখ তব চন্দন-চর্চ্চিত,
যেন পূর্ণ শশধর কলঙ্ক-রহিত ;
ব্রজনারী হেরি যাহা সুখ পায় মনে,
(যেন) কুমুদিনী প্রমুদিনী বিধু-দরশনে ;
বালক ধ্রুবের তুমি ওহে শ্রীনিবাস,
বিশীর্ণ হৃদয়-পদ্মে ভানুর প্রকাশ ;
জগতের জ্যোতি তুমি, তুমি হে জীবন,
সতত বন্দি হে আমি তোমার চরণ।

নমঃ পীতবাসস্ফুরদ্রাসহাস
চলৎকুণ্ডলাভালসদ্গণ্ডদেশ
শতানঙ্গভর্জ্জজ্জগন্মোহনাঙ্গ
নমস্তে জগদ্দীপন প্রাণকৃষ্ণ ॥

রাস-রসে রসিক তুমি হে পীতবাস,
কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড, মুখে মৃদুহাস ;
ভুবনমোহন রূপে শত কাম হারে ;
ভক্তিভরে হরি আমি নমি হে তোমারে ;
জগতের জ্যোতি তুমি; তুমি হে জীবন,
সতত বন্দি হে আমি তোমার চরণ।

নমো বালমূর্ত্তেস্ফুরদ্বিশ্ববক্ত্র
যশোদা-প্রসাদাদরস্নিগ্ধগাত্র

বিমোক্ষামৃতাধার-পাদারবিন্দ
নমস্তে জগদ্দীপন প্রাণকৃষ্ণ॥
মুখে বিশ্ব, শিশু তুমি নন্দগোপ ঘরে,
স্নিগ্ধগাত্র যশোদার প্রসাদ আদরে;
মুক্তির আধার তব যুগলচরণ,
ভক্তিভাবে সদা আমি করি হে বন্দন;
জগতের জ্যোতি তুমি, তুমি হে জীবন,
সতত বন্দি হে আমি তোমার চরণ।
নবজলধরনীলঃ কালিয়ব্যালকালঃ
কলিতললিত-যূথী-মালতী-জালমালঃ
নিখিলভুবন-পালোরাসলীলারসালঃ
সততমবতুদীনান্ ব্রহ্মগোপালবালঃ।
নবজলধর শ্যাম কালিয়-দমন,
কোমল মালতীমালা কণ্ঠ-বিভূষণ;
জগৎপালক তুমি শ্রীরাসবিহারী,
দরিদ্রের দুঃখনাশ কর দয়া করি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরপারের কথা।

গেল—ঐ গেল। ঐ দেখ মায়ামোহবিমুগ্ধ জীব, ঐ যে প্রতীচী-গগনে মরীচিমালী ধীরে ধীরে—একটু একটু করিয়া অস্তাচলে গেল। ঐ দেখ—তাই প্রদোষের তমিস্রারাশি আসিয়া কেমনে ধরিত্রীর মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া ফেলিল। ভ্রান্ত মানব! জান কি, একদিন এমনই ভাবে তোমারও আয়ু-সূর্য্য অস্তমিত হইবে—এমনই ভাবে অন্ধকার আসিয়া তোমার সোণার সংসার ছাইয়া ফেলিবে! ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"দিবা অবসান হ'লো
কি কর বসিয়ে মন?

উত্তরিতে ভব-নদী ক'রেছ কি আয়োজন ?
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়
দেখিয়ে না দেখ তায়,
ভুলেছ কি মোহ-মায়ায়-
হারায়েছ তত্ত্ব-জ্ঞান"।

মূঢ় মানব, তুমি পৃথিবীর সুখ-লালসা ও পাশবী প্রবৃত্তির দুর্নিবার পিপাসায় যতই আত্মবিস্মৃত থাক না কেন, তোমার জীবনরবি একদিন না একদিন ডুবিবেই ডুবিবে। সম্রাট্ তুমি, তোমার সযত্ন-রক্ষিত সোণার সিংহাসনে, স্বর্ণ মণ্ডিত, সুচারুরত্নখচিত চন্দ্রাতপের তলে রূপ ও বৈভবের প্রভায় চন্দ্রের ন্যায় যতই বিরাজমান থাক না কেন, আর ঐ রূপ-গুণ-বিবর্জ্জিত গ্রাসাচ্ছদনের সামান্য সম্বলেও বঞ্চিত, রাজপথের কাঙ্গাল গাছের তলায় কিম্বা পথের ধূলায় অশ্রুসিক্ত নয়নে উপবিষ্ট থাকিয়া ধন-গর্ব্বিত তোমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে যতই চাহিয়া থাকুক না কেন, তোমাদের গতি একই মহাশ্মশানে।

ভয় পাইও না। ভীত মানব, শ্মশানের নাম শুনিয়া ভয় পাইও না। জানিও, এসংসারে যদি কোনও শান্তির স্থল থাকে—শোকতাপে শান্তি পাইবার স্থান থাকে, সেটি ঐ মহাশ্মশান। তাই দেখ, আদ্যাশক্তি মহামায়া মা আমার জগতে এত সুরম্য সুদৃশ্য স্থান থাকিতে শ্মশানে বাস করেন। স্বার্থপর জীব! তুমি শ্মশান মাহাত্ম্য কি বুঝিবে? তোমার চক্ষে এ পবিত্র স্থান অপবিত্র বলিয়া গণ্য না হইলে আর কাহার নিকটে হইবে? যদি তুমি মায়া মোহ কাটাইতে পারিতে—সংসারের অসারত্ব বুঝিতে পারিতে, তাহা হইলে বুঝিতে, শ্মশান বড় আরামের স্থান। শ্মশান বড় আরামের স্থান—বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই সাধকগণ দিবা নিশি শ্মশানে থাকিতে সাধ করেন। এসংসার বড়ই স্বার্থপর। যাহা পবিত্র, যাহা মহামহিমময়, সংসারে তাহার স্থান নাই, তাই শ্মশান লোকালয় হইতে দূরে—অতিদূরে অবস্থিত। তাই শ্মশানের হাওয়া গায়ে লাগার ভয়ে মানুষ শ্মশান-পথে চলে না। কিন্তু ভীত মানব, তুমি, শ্মশানের নাম শুনিয়া যতই শিহরিয়া উঠ না কেন, শ্মশানে আমার শবাসনা মা আছেন—শূলপাণি পিতা আছেন। শ্মশানে বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, টাকা নাই, কড়ি নাই, স্নেহ নাই, মমতা নাই—শ্মশানে কেবল অস্থিরাশি পড়িয়া আছে। মহাঘোরা তামসী রজনীতেও

সেথায় চিতা-বহ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই আলোকে আমার সর্ব্ব-কালের জনক-জননী, আমার চির পিতা—মাতা, চিতাভস্ম গায়ে মাখিয়া, অস্থিমাল্য গলে পরিয়া, আনন্দে বিরাজ করিতেছেন। মূর্খ মানব! যেখানে শিবশক্তি, যেখানে পিতা মাতা থাকেন, সেস্থান কি অপবিত্র? সংসার পিতা মাতাকে বিতাড়িত করিয়া বন্ধুবান্ধব ও কামিনী-কাঞ্চন লইয়া মজে, তাই যে সংসারের বিচিত্র গতি জানিয়াছে, সে চায় শ্মশান। যে মানব-অন্তরে আমিত্ব নাই, যে আর আপনার ইচ্ছায় চলে না, যে আর সকাম কর্ম্মে ফেরে না, যাহার প্রাণে আর বাসনা নাই, কামনা নাই, লালসা নাই, যাহার এ সংসারে আর বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, যাহার এ জগতের সুখের আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার অন্তরই শ্মশান। ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে মা
শ্মশান ক'রেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা
নাচ্‌বি ব'লে নিরবধি"।

নিষ্কাম অন্তরই শ্মশান, আর জ্ঞানাগ্নি এই শ্মশানের চিতাবহ্নি। এই জ্ঞানাগ্নিতে যত কিছু লালসা বাসনা শবরূপে ভস্মীভূত হইতেছে। এই চিতার ইন্ধন সাধুসঙ্গ বা মহাজন-সহবাস। যত সাধুসঙ্গ করা যায়—যত মহাজন-চরিত্র অনুসরণ করা যায়, ততই এই শ্মশানের চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। এই চিতার যে ভস্ম, তাহাই শিব-শিবা অঙ্গে ধারণ করেন। আর যে অস্থিমালা তাঁহাদের গলে শোভা পায়, উহা ভক্তজনের স্মৃতিস্তম্ভ বিশেষ। অস্থি ভিন্ন যেমন জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব, সেই প্রকার সাধু মহাত্মগণ এই জগতের অস্থিবিশেষ, অর্থাৎ তাঁহারাই জগতের আদর্শপ্রাণী, সকলের শিক্ষাদাতা; তাই জগৎপিতা ও জগজ্জননী সকলকে দেখাইবার জন্য তাঁহাদের কীর্ত্তি অস্থিরূপে গলদেশে ধারণ করিয়া শ্মশান আলো করতঃ সদানন্দে বিরাজিত আছেন। এখন বুঝিলে ত মানব, শ্মশান বড় পবিত্র, বড় মধুর শান্তিময় তপোবন। কিন্তু যাউক এসব কথা, যাহা বলিবার এখন তাহাই বলি।

সূর্য্য অস্ত যাইতেছে—দিবা অবসান হ'লো। প্রাচ্যের ভূমি অন্ধকার করিয়া সবিতা প্রতীচ্য ভূমিকে আলো করিতে গেল। কিন্তু বল দেখি, অজ্ঞ মানব; তুমি যখন এই সাধের সংসার ত্যাগ করিয়া—ইহজীবনের নাট্যলীলা সাঙ্গ করিয়া চু'চক্ষু মুদ্রিত করিবে, তখন তুমি কোথায় যাইবে?

জড়বাদিমানব, তুমি সম্মুখস্থ দর্পণে আপনার প্রীতিপ্রফুল্ল মূর্ত্তিখানি দেখিয়া প্রাণে কতই আনন্দ অনুভব কর, কিন্তু দর্পণে যে মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইল, মাথার চিক্কণ চিকুররাশি অবধি পায়ের নখগুলি পর্য্যন্ত তোমার সর্ব্বাবয়ব, ঠিক্ ঐরূপ আর একখানি সূক্ষ্মতর পদার্থ-রচিত সুন্দর মূর্ত্তি যে তোমার জড়দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান রহিয়াছে, তাহা তুমি জান কি? তুমি জড়জীব, তুমি ঘোর সাংসারিক, তাই তোমার জ্ঞান যে তোমার জড় দেহই দেহ—এই জড়জগৎই জগৎ। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব-হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মনুষ্যের জড়দেহ দেহের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মদেহের বাহিরাবরণ মাত্র। তুমি ভাব, ঐ চন্দ্র-তারাময়ী নভঃস্থলীর পশ্চাদ্‌ভাগ কেবল শূন্য—শূন্যের পর শূন্য—মহাশূন্য—অনন্ত বিস্তারিত অনন্তশূন্য, কিন্তু তত্ত্বদর্শীর নিকট ঐ চন্দ্রতারাখচিত আকাশ এবং গিরিনদীগ্রাম এককথায় এই নিখিল বিশ্বব্যাপী জড়জগৎ সূক্ষ্মতম অধ্যাত্ম জগতের বাহিরের আচ্ছাদন।

পাঠক, তুমি ভাবিতেছ যে, তুমি একেবারেই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছ এবং তোমার মৃত্যুর পর তোমার দেহ চিতানলে ভস্মীভূত বা কবরে সমাহিত হইলে, তোমার এই দুনিয়ার খেলা সাঙ্গ হইবে। নাস্তিক-চূড়ামণি চার্ব্বাকের মত হয়ত তুমি ভাব—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাহাই? এই যে তুমি দুই হাত ও দুই পদবিশিষ্ট মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ইতরপ্রাণী পতঙ্গ-কীটাদির উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে—তুমি কি এমনই ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তুমি কি কোনদিন ইহাদের মত ছিলেনা? তোমার স্মৃতিকে জিজ্ঞাসা কর—স্মৃতি তোমায় বলিয়া দিবে—তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছ। অথবা কিরূপেই বা পারিবে? তুমি প্রাতঃকালে সংঘটিত ঘটনা যখন বৈকালে স্মরণ করিতে পার না, তখন তোমার এতদূর অতীতের স্মৃতি কোথা হইতে আসিবে?

স্মৃতিবিমূঢ় মানব! তুমি কীটানুকীট হইতে ক্রমোন্নত হইয়া এই জড়-জগতে মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াছ। আবার এই জড়দেহত্যাগের পর, চর্ম্ম-চক্ষুর অদৃশ্য অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ করিয়া, তুমি সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হইবে এবং

সেখানে ক্রমবিকাশের নিয়মে অনন্তকাল ধরিয়া উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে। এ উন্নতি সর্ব্বজনলভ্য ও সীমারহিত। তুমি আজ যার পর নাই নিষ্ঠুর, পাপিষ্ঠ পরপীড়ক পরস্বাপহারক এবং বিশ্বাসঘাতক, তুমিও সেই অধ্যাত্ম-জগতে বহুকাল পর্য্যন্ত অনুতাপের অনলে দগ্ধ হইয়া উচ্চশ্রেণীর দেবত্বলাভ করিবে এবং দেব-ভোগ্য সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়া জগজ্জীবন জগদীশ্বরকে উর্দ্ধনয়নে ধন্যবাদ দিবে। তুমি ইহলোকে মনের অতি লুক্কায়িত প্রদেশে ভাল কিংবা মন্দ, পবিত্র কিংবা অপবিত্র যে কোন ভাব পোষণ কর—সত্য কিংবা অসত্য, কঠোর কিংবা মধুর যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, অধ্যাত্মজগতে প্রতিনিয়তই তাহার প্রতিকৃতি উত্থিত হইতেছে। পরলোকে যাইয়া তুমি সেই আপন কর্ম্মপট দেখিতে পাইবে।

নাস্তিক মানব, তুমি আমার কথা শুনিয়া পাগলের প্রলাপ মনে করিতেছ? তুমি দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেছ না? তুমি ভাবিতেছ, মানুষকে জ্বলন্ত হুতাশনে পোড়াইলে তাহার অস্তিত্ব আবার কোথা হইতে আসিবে? ভুল—ভুল—ভুল। তুমি মহাভুলে পড়িয়াছ। ঐ শুন গভীর মন্ত্রবাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতেছেন:—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো
ন শোষয়তি মারুতঃ॥

গীতা ২য় অঃ ২৩ শ্লোক।

"জীবাত্মার ধ্বংস নাই—উহা অবিনাশী পদার্থ। অস্ত্র উহাকে ছেদন করিতে পারেনা—আগুণে উহা পোড়ে না—জলে উহা ভিজে না—এবং বায়ু উহাকে শোষণ করিতে পারেনা।" অন্ধ মানব, তুমি যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান কর, তেমনি যিনি মনুষ্যদেহের দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা, তিনিও দেহপাতের পর সূক্ষ্মতর নূতন দেহ ধারণ করিয়া অনন্ত জীবনের কার্য্যে অগ্রসর হন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

পাঠক, তোমাকে—কখনও পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছে কি? শুনিয়াছ কি যে বিয়োগ-ব্যথিত পুত্র, মৃত পিতা বা মাতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়েন—

"আকাশস্থোনিরালম্বো
বায়ুভূতোনিরাশ্রয়ঃ
ইদং নীরং ইদং ক্ষীরম্
স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব।"

তোমার ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিরা যাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, আজ তুমি অন্ধ বিশ্বাসের ফলে তাহা ফুৎকারে উড়াইয়া দিও না। পাশ্চাত্যগণও Etherial Body বা ইথর-নামক সূক্ষ্মপদার্থে গঠিত সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

পাঠক, তুমি কখনও কর্ম্মকারশালায় লৌহপিণ্ডকে ভস্মীভূত করিতে দেখিয়াছ কি? কেমন করিয়া, কর্ম্মকার তপ্তকটাহে লৌহপিণ্ড স্থাপন করিয়া আগুনের তাপে তাহাকে দ্রবীভূত করে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ কি? দ্রবীভূত লৌহপিণ্ড তোমারই চক্ষের সম্মুখে বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া আকাশে যাইয়া মিশে। ঐ লৌহপিণ্ডের বাষ্পাকারে পরিণতির দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইতেছে যে, আমরা যে পদার্থকে যেভাবের বস্তু মনে করি, উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সে ভাবের বস্তু নহে। উহার বস্তুত্ব, চক্ষুঃ ত্বগাদি কয়েকটী ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে প্রমাণিত। চিনিটুকু যখন দুধে মিশাই—লবণটুকু যখন জলে মিশাই—তখন উহাদের বস্তুত্ব লোপ পায় কি? বাতাসকে আমরা চক্ষে দেখিতে পাইনা, কিন্তু তথাপি উহাকে বস্তু বলিয়া মানি। আবার ঐ বাতাস যখন মত্ত প্রভঞ্জনরূপে মহীরুহের মূলোৎপাটন করিয়া তাহাকে ভূমিলুণ্ঠিত করে, তখন তদ্দর্শনে আমরা ভীত চকিত ও ত্রস্ত হইয়া পড়ি। এইরূপে, অজ্ঞ মানব, তুমি যখন পর-পারে যাইয়া অধ্যাত্ম তনু লাভ করিবে, তখন তুমিও সেখানে বৃক্ষবহুলা বনভূমি, বনান্তশোভি উপবন, কুলকলনাদিনী তটিনী দেখিতে পাইবে; কিন্তু আমরা আমাদের এই পার্থিব স্থূল নেত্রের দ্বারা সেই সূক্ষ্ম-পরমাণু গঠিত দেহ দেখিতে পাইব না।

দাম্ভিক মানব, এখন বুঝিলে ত ঐ "মহাসিন্ধুর ও'পারেও" এক রাজ্য আছে। এ পারের কূল ছাড়িয়া পাড়ি দিলে, ওপারে যাইয়া এ পারের দুষ্কর্ম্মের অনুতাপ, অনুশোচনা ও ফল ভোগ করিতে হইবে। মনে কেন

মূর্খ মানব, তুমি এই অভিমানের বিজয়দুন্দুভি বাজাইয়া ঈর্ষা, ক্রোধ, লালসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতির প্রণোদনায় আত্মহারা হইতেছ ? পরের সুখ, স্বার্থ, শান্তি ও সম্মান দেখিয়া নিজে হিংসানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছ ? নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থের জন্য অপরের বুকে শক্তিশেল প্রয়োগ করিতেছ ?

ছাড়—ছাড়—ছাড়। মোহমুগ্ধ মানব, এখন দিন থাকিতে সংসারের কুটিল পথ ছাড়—ঋজুপথে ফিরিয়া এস। ঐ দেখ, তোমার আয়ু-সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়! ঐ শুন, মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কে তোমায় "আয়" "আয়" করিয়া ডাকিতেছে! এখনও দিন থাকিতে অন্তরের সহিত ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে ভালবাসা, পিতামাতা ও গুরুজনের সেবা, উপকারিজনে কৃতজ্ঞতা, সর্ব্বজনে প্রীতিস্নিগ্ধ মন, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান, চিত্ত ও চরিত্রের বিশুদ্ধি-সাধন এবং সর্ব্বপ্রযত্নে সত্যরক্ষা ও আপনার স্বভাবপ্রণোদিত সৎকার্য্য-সম্পাদন ইত্যাদি জীবের যাহা নিত্যধর্ম্ম—তাহাই কর। তাহা হইলে সেই "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ" রসস্বরূপ জগজ্জীবন জগদীশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাণী করিবেন। তখন আর তোমাকে মৃত্যুর পর বীভৎস-ভৌতিকমূর্ত্তি ধরিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না—অথবা এই সংসার-নাট্যশালায় পুনঃ পুনঃ আসা-যাওয়া করিয়া ভবকারাগারের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ
ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।"

ইহা সত্য জানিয়া, হে মানব, যাহাতে সেই শেষের দিনে সহাস্য আস্যে নয়ন-যুগল মুদ্রিত করিতে পার, তাহার উপায়-স্বরূপ সতত সেই চিন্তাময়কে চিন্তা কর। আর তোমার দেহান্তে যাহাতে আপামরসাধারণ গলদশ্রু-লোচনে তোমার যশোগাথা গান করে, সেইরূপ কার্য্য কর। কবি গাহিয়াছেন—

"সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একমাত্র ধর্ম্মেই সুখ, ধর্ম্মেই শান্তি; ধর্ম্মেই জাতীয়-জীবনের প্রতিষ্ঠা; ধর্ম্মেই উন্নতি, ধর্ম্মেই মানবকুলের শ্রীবৃদ্ধি। সেই ধর্ম্ম-মহীরুহের মূল শ্রীমন্নন্দনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর প্রতি যদি প্রীতি না জন্মে, তাঁর গুণকীর্ত্তনে যদি রতি না জন্মে, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। সুতরাং যাহাতে তাঁর প্রতি প্রীতি জন্মে, তাহাই করিতে হইবে। প্রীতি কিরূপে জন্মিবে? বৈধীভক্তির অনুষ্ঠানে রত থাকিয়া, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সাধুসঙ্গ, তীর্থভ্রমণ, হরিগুণানুকীর্ত্তন, চিত্ত-সংযম, ভগবানের লীলাচরিত্র-শ্রবণ, তাঁর অমা-নুষ মহিমা স্মরণ প্রভৃতির অনুশীলন করিতে করিতে ক্রমশঃ বিষয়-বাসনা ক্ষীণ হইবে ও চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে। ক্রমশঃ সত্বগুণের বৃদ্ধি হইবে, পরে রতি গাঢ় হইতে থাকিবে। রতির গাঢ়তা জন্মিলে ক্রমশঃ ভাব, মহা-ভাব ও পশ্চাৎ প্রেমোদয় হইবে। তাহা হইলেই জীবন-জনম চরিতার্থ হইবে।

যে বংশে একটিও হরিদাস জন্মগ্রহণ করে, সে বংশের আর কাহারও নরকপাতের শঙ্কা থাকেনা। "সতরতি তারয়তি কুলং" সেই ভক্তচূড়ামণি স্বয়ং উদ্ধার পান এবং স্বীয় বংশীয়দিগকে উদ্ধার করেন। যেমন ভগীরথ গঙ্গাকে ভুবনে আনিয়া স্ববংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ হরিদাস, পতিত-পাবনীর জন্মস্থান শ্রীহরির শ্রীচরণারবিন্দ-মকরন্দপানে চরিতার্থ হইয়া যান। মূকাস্বাদতুল্য অনির্ব্বচনীয় সে তৃপ্তি—সে চরিতার্থতা—সে গাঢ় আনন্দ কে তাহার বর্ণনা করিতে পারে? যদি কেহ অলোকসুন্দরী যুবতীর মুখ-কমলে অথবা অস্ফুটবাক্‌নিদ্রিত শিশুর সহাস্য অধরের মধুরিমা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি স্বর্গ কিরূপ, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু অমানুষাস্বাদ প্রেমাস্বাদ কিরূপ, তাহা মানব কিরূপে বলিবে?

কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—"জীবন ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে এহেন, পীরিতি গঠিল কে?" বস্তুতই জীবন গেলে ভালবাসা যায়না। দেহই যায়, আত্মা ত আর জগৎ ছাড়িয়া যায়না; তবে স্মৃতি—ভালবাসা যাইবে কেন? সাধারণ নায়ক-নায়িকার আসঙ্গলিপ্সা-জন্য যে ভালবাসা, তাহা প্রেম নহে।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তেঁই বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম।" বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় যে কার্য্য করা যায় তাহা নিষ্কাম, তাহা কাম-গন্ধশূন্য, তাহা উজ্জ্বল, মধুর পবিত্র ও নিত্যই অভিনব। তাহা মানবের ভাগ্যে ঘটে কিনা সন্দেহ। প্রেমই ভক্তিশাস্ত্রে মধুররস বলিয়া কথিত হয়। ব্রজাঙ্গনারাই ঐ মধুররসের অধিকারিণী। বাহ্যতঃ স্ত্রী-পুরুষের ন্যায়, অথচ কাম-গন্ধ-শূন্য নির্ম্মলভাব। সেই ব্রজনারীর মহিমা দর্শনে নারদাদি ভক্তগণও তাঁহাদিগের চরণ-রেণু গাত্রে লেপন করিয়া চরিতার্থ হইতে কামনা করিয়াছিলেন।

ভাগবতে পাঁচটি অধ্যায় আছে, উহাকে রাসপঞ্চাধ্যায় কহে। বিষয়-বিষ-দগ্ধমতি পাশ্চাত্যরা উহা পরস্ত্রীহরণ-ব্যাপার মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে দোষারোপ করে। কিন্তু, রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটী শ্লোকের একটি বিশেষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহাদিগের সন্দেহ দূর হইতে পারে। বিশেষণটি যথা "জিতমন্মথমন্মথঃ"—মনকে ব্যাকুল করে মদন, তাকেও তিনি জয় করিয়াছেন। তিনি হৃষীকেশ—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বদ্রষ্টা। তাঁর প্রতি নারীহরণরূপ দোষারোপ করা কি মূঢ়তার কার্য্য নহে? যিনি সাধুদিগের পরিত্রাণার্থ পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁর চরিত্রে পরস্ত্রীধর্ষণরূপ দোষ কখনও কি স্পর্শিতে পারে? কদাচন নহে। তাঁর অমানুষলীলা বুঝিতে অক্ষম মূঢ়েরাই কুৎসিত কল্পনা করে।

কলিকলুষ-কলুষিতচিত্ত ব্যক্তিদিগের অযথা আপত্তি আমরা খণ্ডন করিতে ইচ্ছুক নহি। শাস্ত্র-লোকপ্রসিদ্ধ ভগবানের প্রতি যে বিমুখ, তাহাপেক্ষা হতভাগা আর কে আছে? বিবিধ বিপৎ-সঙ্কুল মানবজীবন ভীষণ অরণ্যতুল্য। সে বিষম বন-পথের সম্বল একমাত্র হরিনাম। বিকট-বিকারভোগ্য দুরারোগ্য ভবরোগের মহা মহৌষধ মাত্র হরিনাম। শোক-দুঃখের নিত্য লীলা-ভূমি মানবদেহ। সুদীন মানবের একমাত্র শান্তি সান্ত্বনা হরিনাম। কৃষ্ণদাসত্বের অভাবে জীবের যে দুঃখ, তাহা অবশ্য হরিনামই হরণ করিবে। প্রথমতঃ নামে পাপনাশ, পরে পাপ-পুণ্য উভয়কর্ম্মের বীজ বাসনার বিনাশ—অর্থাৎ মুক্তি। পরে প্রকৃত ভক্তিলাভ এবং সর্ব্বশক্তিময়ী সেই কৃষ্ণ-ভক্তির কৃপায় কৃষ্ণদাসত্ব-লাভ। তাহাই জীবের পরম সম্পদ। ভগবন্নামে রুচি দ্বারা সাত্ত্বিকতাশক্তি যেরূপ রক্ষিত হয়, অন্য কোন সদ্‌গুণ বা সদ্বৃত্তি-বলে সেরূপ হইবার নহে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এহেন নামে রুচি, কেবল দুর্দৈব বশেই ভাগ্যে ঘটেনা। দুর্লভ মানবজন্মেই ভগবদনুরাগ জাগে,

ভগবদ্বিরক্ত লাগে; তাই সাধন-ভজনের ব্যবস্থা। এই বিষম কলিযুগে অল্পায়ু, হীনশক্তি, ব্যাধিগ্রস্ত মানবের পক্ষে একমাত্র হরি-নামই নিস্তারের মুখ্য সাধন। সাধককে মুক্তি দিয়াই হরিনামের কার্য্য শেষ হয় না। হরিনাম কাম-পাশ হইতে মুক্তি দিয়া, আবার প্রেমপাশে বন্ধনের আয়োজন করে। প্রেম-বন্ধন প্রকৃত বন্ধন নহে, তাহা মুক্তিরও মুক্তি। সে পাশ নহে, হরিপ্রেমপুষ্পহার। মুক্তির পর যে বন্ধন, সে যে কেমন স্পৃহনীয়, তাহার কথঞ্চিৎ পার্থিব দৃষ্টান্ত কল্পনা করা যাইতে পারে। মনে করুন, সমস্তদিনের সর্ব্ববিধ গৃহকার্য্যের অবসরলাভের পর সতী কুলবতীর পতির প্রেমালিঙ্গন-পাশ কেমন? সেও ত বন্ধন বটে, কিন্তু কি স্পৃহনীয়, প্রাণারাম, পরমানন্দময়! সেইরূপ সিদ্ধ ভক্ত সাধুগণ সংসারমুক্ত হইয়া সেই গোপীকান্তের করুণ কটাক্ষে গোপী-কৃপাশ্রয় ও প্রকৃতি-ভাবাশ্রয় লাভ করিয়া, সেই পরমপুরুষ প্রাণপতি কৃষ্ণধনের পাদপদ্মের প্রেমালিঙ্গনে পরমকৃতার্থ ও চরম চরিতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু, নামে রুচি না হইলে কিছুই হইবে না।—ভজনপথে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না। নামে রুচি না জন্মিলে, বৃথা চেঁচাইয়া গলা ভাঙ্গিলে বা নাচিয়া ঠ্যাং ভাঙ্গিলে, কোন ফল হইবে না। লাভের মধ্যে নামাপরাধ ঘটিবে। অজামীল প্রভৃতি নামাভাসের গৌণফল প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার হেতু এই যে, তাহারা নামাভাসের পর আর নামাপরাধ করে নাই। হাপরের রক্তোজ্জ্বল লৌহ যেমন তুলিতে তুলিতেই কাল হইয়া যায়, আমাদেরই ঐ দশা। নামাভাসের ম্লান-জ্যোৎস্নায় হয়ত সাময়িকভাবে একটু আলো পাই, আবার পরক্ষণেই আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন ব্যঙ্গস্বরে বলিতে থাকে—"তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে!" এ বিড়ম্বনার কারণ কেবল আমাদের নামাপরাধ। নামাভাসে একটুকু উঠি, নামাপরাধে আবার ততোধিক নামিয়া পড়ি। এইরূপ আমাদের একপদে উন্নয়ন, পর-পদে অধঃপতন হইতেছে। তবুও আশা আছে। আমাদেরই রুচির অভাব, নাম ত লোপ পায় নাই। যখন নাম আছে, তখন সব আছে, সুতরাং আশাও আছে। মগ্নতরির ভগ্ন-কাষ্ঠখণ্ডও মজ্জমানের আশ্রয় হইতে পারে। অধমাধিকারে নামাভাসও আমাদের আরাধ্য ধন।

পিত্তদোষদুষ্ট রসনায় মিশ্রীও তিক্ত লাগে; কিন্তু তবু যেন জোর করিয়া সেই ত্রিদোষহরী মিশ্রী মুখে রাখিতে ২ সময়ে সেই রসনায় আবার সেই মিশ্রীই মিষ্ট লাগে। নাম লইয়া তদগত চিত্তে ধরিয়া থাকিলে নামের

মাধুর্য্যরসে ক্রমেই মন বসে। নামে মন বসিলে আর নামাপরাধের ভয় থাকে না। অতএব নামে রুচিই সাধনের মূলধন বুঝিতে হইবে। ভগবন্নাম-বিরহে মানবের স্বভাব-স্বর্গ নরকে অবনত, হৃদয়নন্দনকানন শ্মশানে পরিণত। ইহাপেক্ষা দুঃখকর কি? যার সঞ্চিত ধন নষ্ট, মুখের গ্রাস ভ্রষ্ট, হাসির স্থানে অশ্রুরাশি, আশা উল্লাসের স্থানে হা হুতাশ, তার ন্যায় দীনাতিদীন আর কে আছে? বিশেষতঃ কর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্ম পেয়ে, ভজন সাধনের উপযুক্ত দেহ লাভ ক'রে যেজন নামানুরাগী না হয়, তাহার অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে?

হৃদয় কোমল না হইলে, অথবা শোক, রোগ প্রভৃতির যাবতীয় তীব্র দাহ সহ্য করিয়া চিত্তে শান্তি স্থাপন না করিতে পারিলে, কৃষ্ণানুরাগ বর্দ্ধিত হয় না। সুতরাং আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে পারিলে, তবে নামে রুচি জন্মে। হৃদয়টা গঠিত করিয়া, প্রাণটা প্রাণেশ্বরকে দান করিতে পারিলে, তাহাই তাহার চরিতার্থতা। জীবের যাবতীয় দুঃখের কারণ সংশয় ভ্রান্তি—নিত্যে অনিত্যতাবোধ—অনিত্যে নিত্যতা-বোধ এবং হৃদয়গ্রন্থি মায়া। ঐ দুইটি অবগত হইলেই জীব দুঃখ-বিমুক্ত হয়। সাধন-বলে শ্রীহরির দর্শনফলে সর্ব্বসংশয় ও হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। অসদ্বস্তুর প্রতি সত্যতা-জ্ঞান মায়ার কার্য্য। দারা, পুত্র, দেহ গেহ প্রভৃতিতে নিত্যতাবোধ ও তাহাতে দুস্ত্যজ মমতাই একমাত্র দুঃখের কারণ। গুণময়ী মায়ার হাত হইতে কাহারও রক্ষা নাই। একমাত্র শ্রীহরির চরণাশ্রয় ব্যতীত কিছুতেই জীবের নিস্তার নাই। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ভগবান্ শ্রীমুখে বলিতেছেন—"একমাত্র আমাকেই অনন্যশরণ হইয়া যে আশ্রয় করে, সেই কেবল দুস্ত্যজ মায়ার হাত হইতে রক্ষা পায়।" তাঁহাকে পাইলে লাভের আর বাঁকী থাকে কি? যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে চাধিকং ততঃ। যাঁকে পাইলে তদপেক্ষা আর কিছুই লাভ বলিয়া জীব মনে করে না, তাঁর বিরহে তীব্র অসহিষ্ণুতা সমুপস্থিত হইলেই ভগবানের সহিষ্ণুতা পরাস্ত হয়। তখন তিনি স্বয়ং সেধে এসে দেখা দেন। তখন ভক্ত-হৃৎপদ্ম-মধুপ হরি ভক্তের হৃদয়-মাঝে উদিত হন। হায়! কোথায় আমরা, আর কোথায় হরবিরিঞ্চিবাঞ্ছিত ভগবদ্বিরহ! এখন আমাদের কৃষ্ণ-বিরহের সঙ্গেই মিলনের প্রয়োজন। কৃষ্ণমিলন হয়ত আমাদের শতজন্মদূরবর্ত্তী নিশার স্বপন! আমরা কৃষ্ণবিরহবিরহী বলিয়াই ঐহিক অসংখ্য বিরহে অনুক্ষণ অসহিষ্ণু।

অতঃপর কৃষ্ণপদারবিন্দাশ্রয় করিতে হইলে, সহিষ্ণুতার আশ্রয়-গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। হরিবিরহ জাগাইতে হরিনামই আমাদের একমাত্র সম্বল। বিরহ ত আছেই, কেবল বোধের অভাব। "নামেতে তিনি এবং নামই তিনি" সুতরাং নাম-সাধনে নামে রুচি হইলেই ক্রমে তাঁহাকে ভাল লাগিবে—মধুর লাগিবে, আর ক্রমে বিরহও জাগিবে। বিষয়-বিক্ষুব্ধচিত্তের নামসাধন কেবল শব্দসেবনই হইয়া পড়ে—এই জন্যই সহিষ্ণুতার আবশ্যক। সংসারের সমস্ত সুখই সেই সুখসিন্ধুর বিন্দুমাত্র। যে সিন্ধু পায়, সে বিন্দু চাহিবে কেন? ভক্তের বণিগ্‌বৃত্তি বা ব্যবসাদারী নাই। ভক্ত ভগবানের বিনিময়ে কিছুই চাহেন না। ভক্ত ভগবান্‌কে ভাঙ্গাইয়া স্বর্গ-মোক্ষাদি বিষয় ক্রয় করেন না। "ন ধনং ন জনং"—ভক্ত ধনও চাহেন না, জনও চাহেন না, এমন কি মুক্তিও চাহেন না। উহা সংসারীর প্রার্থিত বরমাল্য। সংসারী লোকে মায়ার ইন্দ্রজালে বদ্ধ থাকিতে বড়ই ভাল ভাসে। জন এই জালের তন্তু, ধন এই জালের গ্রন্থি। ধনজন-রতি সংসার বেড়াজাল এড়াইবার শক্তি কেবল ভগবদ্ভক্তি হইতেই লাভ করা যায়। ভগবদ্ভক্তি-বিরহে চিরদিন এই বেড়াজালে বদ্ধ থাকাই স্পৃহনীয় ও প্রার্থনীয় বোধ হয়। তাই ধন-জন সংসারীর পক্ষে সার, ভক্তের পক্ষে অসার। আর্ত্ত, অর্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ মানব ভগবান্‌কে চায়। কিন্তু উহাদিগের শ্রদ্ধাভক্তি হৈতুকী; হেতু নিবৃত্ত হইলে আর মনের প্রবল আকর্ষণ থাকেনা। কিন্তু রাগানুগভক্ত একমাত্র কৃষ্ণধন ভিন্ন অন্য ইষ্ট চায়না; সুতরাং তাহার মিলন ব্যতীত তীব্র বিরহ শান্তি পায় না। তাঁহাদের হরির প্রতি অনন্য-মমতা, সুতরাং তাহা কিছুতেই বাধা পাইতে পারেনা। তবে ভরসা এই যে, (কৃষ-ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা;) পথ ভুলিয়া ভক্ত কুপথে পদার্পণ করিলেও তিনি স্বীয় পার্শ্বে টানিয়া আনেন। ভক্ত-শিশু ধ্রুবই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদি কেহ মনে করেন, ধন জন বিষয় বিভব বিষজ্ঞানে ত্যাগ করিলে, শরীরযাত্রা পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন, তখন অনন্যমমতা করিয়া কৃষ্ণ কি ইষ্ট মিলাইয়া দিবেন? উত্তরে বলিব—নিশ্চিতই দিবেন—শ্রীমুখের উক্তি শুনুন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যেজনাঃ পর্য্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।"

যারা অনন্যমনে ধ্যান করতঃ আমার উপাসনা করে, আমি সেই নিত্য যোগীদিগের অপ্রাপ্ত বস্তু বহন করিয়া দিয়া থাকি এবং লব্ধবস্তু

রক্ষা করি। এখন ভাবুন, কৃষ্ণ ইষ্ট মিলাইয়া দেন কিনা! যিনি সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা—প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ, তাঁহাকে বাদ দিয়া আমাদের পৃথক্ অস্তিত্বই অসম্ভব; কিন্তু চিরপরিচিত বস্তুই জাগরণে ও, স্বপনে মনে প্রাণে উদিত হয়। ভগবান্ কি বস্তু, তাঁহাকে পাইলে ও তাঁহাকে দেখিলে কি ফল হয়, কখনও তাহা বিন্দুমাত্র চিন্তা করি নাই। সংসার-সাগরে নিমগ্ন, সদা সংসারেরই চিত্র নয়নে উদ্ভাসিত, সেই ভাবে ভাবিত, সেই রসে আসক্ত, সুতরাং স্বপনে, জাগরণে, ধ্যানে, মনে, প্রাণে সেই বিষয়ই উদিত হয়। নয়ন মুদ্রিত করিয়া প্রাণবল্লভকে চিন্তা করিতে যাই, পুত্র, দারা দেহ-গেহ মনে ফুটিয়া উঠে। জোর করিয়া মনকে ফিরাইতে চাই, তবুও অবাধ্য মন ফিরেনা। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার পরিহার করা দুঃসাধ্য। পুত্রের জন্য যেমত উৎকণ্ঠা প্রাণে জাগরূক হয়, প্রাণনাথ হরির জন্য কখনই কি সেইরূপ উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে? দারার অদর্শনে যেমত বিরহ-যাতনা ভোগ করি, কৃষ্ণের বিরহে কি কখনও সেইরূপ বিরহ-যাতনা অনুভব করি? ইষ্ট কৃষ্ণে গাঢ় নিষ্ঠা জন্মিলে আর কষ্ট থাকিবে কেন? কামিনী-কাঞ্চন মনোরঞ্জন করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই পরম লাভ মনে হইতেছে, সুতরাং ইহার পর অত্যুত্তম লাভ আর কি আছে, তাহা ধারণাও হয় না। তাই মনে হয়, ভক্ত গুরুর কৃপা ব্যতীত বিষয়-কীট মানবের শ্রীহরির প্রতি রতি-মতি সমুদ্ভূত হওয়াই অসম্ভব। প্রথমতঃ গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হওয়াই দুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ দুর্নিবার বিষয়াকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করাই সুকঠিন। নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করা জীবের পক্ষে সুসাধ্য নহে। অভিমান, মদ, মাৎসর্য্যাদি বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে, চিত্তের ময়লা শৌত করিতে না পারিলে, চিত্ত নির্ম্মল না হইলে, তাহাতে প্রাণকান্তের প্রতিবিম্ব পড়িবে কেন? যথোপযুক্ত কর্ষণ, পারিপাট্য প্রভৃতি দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে সে ক্ষেত্রে ফলোন্মুখ বীজও অঙ্কুরিত হয় না। আবাদ করিতে জানিলে সোণা ফলে বটে, কিন্তু সেইরূপ কৃষকই দুর্লভ।

আমার বিশ্বাস, হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেই মানবের শত শত জন্ম গত হইয়া যায়। চিত্ত-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে তাহাতে বীজ বপন করা মাত্রই আশু অঙ্কুরোদ্গম হয়। যে সমস্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের অমানুষ চরিত পাঠ করা যায়, আমার বিশ্বাস, তাঁহারাও শত শত জন্মে হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রে গুরুদত্ত বীজ পড়া মাত্র অঙ্কুরোদ্গম

হইয়াছে এবং নিজের ও পরের হিতসাধন করিয়াছে। নাস্তিকের শুষ্কতর্ক ত্যাগ করিয়া অপৌরুষেয় বেদবাক্যেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তাহা দ্বারা আত্মার অবিনাশিত্ব ও জন্মান্তর-পরিগ্রহ জানিতে সমর্থ হই। হিন্দুর অস্থিমজ্জায় উক্ত বিশ্বাস অনুপ্রবিষ্ট; সুতরাং সে বিশ্বাস আমরা হারাইতে পারি না। জীবের জন্মপ্রবাহ যদি অনাদি হয়, তবে জন্মজন্মান্তরে পুণ্যপুঞ্জ-বলে হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যদি ধরা যায় যে, সেই সেই মহাত্মাদের শরীরে ঈশ্বরাবেশ হওয়ায় তাদৃশ শক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়াই সেই সেই ব্যক্তির শরীরে ঈশ্বরাবেশ হইয়াছিল। নতুবা, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাদৃশ অমানুষশক্তিশালী হইতে পারিত। অতএব ক্ষেত্রপ্রস্তুত করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভগবান্ জীবের সতত শুভাকাঙ্ক্ষী, সেপক্ষে সন্দেহ করাই ভুল। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ, মানুষের কর্ম্মফল, তজ্জন্য ভগবান দোষী নহে, তিনি নিয়ন্তা মাত্র। সুখ-দুঃখের পন্থা আমরাই সুপ্রশস্ত করি। ভগবান্ সুখদুঃখদাতা হইলে, তাঁহাতে পক্ষপাত-দোষ জন্মে ও জন্মান্তরবাদ উড়িয়া যায়। সুতরাং তিনি নিয়ন্তা, ইহাই সুসঙ্গত মীমাংসা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

কল্পনা।

অতীত অঙ্কে ছুটে যেতে চাই এস এস দেবি! কল্পনা!
সহায়তা তব না মিলিলে সেথা, করিতে ত' কিছু পারব না।
পুরাণের কথা ব্যাপ্ত তিমিরে,
ঘোর অজ্ঞান রহিয়াছে ঘিরে,
জ্ঞান কোথা মাতা, অজ্ঞান যেথা, মিথ্যা কি তার জল্পনা?
অতীতের পথে যে চাহিছে যেতে এস তার কাছে কল্পনা!
হে দেবি! তোমার কৃপা-কটাক্ষে বিজ্ঞ সাজিছে অজ্ঞজন;
যে যা নাহি পারে তার তারি তরে হয় অনায়াসে আকিঞ্চন!

ভাবে না তাহারা ক্ষমতা কোথায়,
তোমার দেউড়ি পানে ছুটে যায়—
এক রোখে চলে, চোট্ খেয়ে পড়ে, হাসি ত' ওঠে না অল্প না।
হাত ধ'রে চল, গহন অজানা পথ-মাঝে অয়ি কল্পনা!
তোমার আশীষ নিরমালা যাচি, আমাদের যাহা সান্ত্বনার—;
তাই হবে দেবি! অর্ঘ্য তোমার আমার পূজার বন্দনার।
পর-প্রচলিত পথে যাব বটে
কিন্তু নূতনে খুঁজিব নিকটে,
চির পুরাতনে নবীন কামনা করিব প্রাণের সান্ত্বনা।
এস শাশ্বতী চির-পুরাতনী বাণী-সহোদরা কল্পনা!
যাব অযোধ্যা দণ্ডকবনে মিথিলার রাজ-অন্দরে।
মানস-বণিক্ ভ্রমিবে আমার স্বর্ণ-লঙ্কা-বন্দরে।
কিন্তু সে নয় সেই ত্রেতাযুগে
কলির কলম নব দশা ভুগে
বাহিরিবে নিতে বিশ্ব-সমুখে সমালোচকের গঞ্জনা।
নহি তাতে ভীরু, ওগো চিতভিরু! কবি-মনোরমা কল্পনা!
তুমিও কি দেবি! দেখাও আমারে রক্ষোবানর-হুঙ্কৃতি;
কুরু-পাণ্ডব-রণাঙ্গনের পশে কাণ পাশে ঝঙ্কৃতি।
রাজ-স্থানের—সে মহাস্থানের
চিত্রাকাহিনী আমার প্রাণের
পরতে পরতে জান কি আনিছে কত মনোরম ব্যঞ্জনা?
বর্ণিতে চাহে প্রসাদ তোমার ওগো চঞ্চলা কল্পনা!

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০

সান্বয়ব্যাখ্যা। সঞ্জয় উবাচ। বাসুদেবঃ অর্জ্জুনং ইতি উক্ত্বা ভূয়ঃ তথা (কিরীটগদাদিযুক্তং) স্বকং (স্বকীয়ং) রূপং (চতুর্ভুজং রূপং) দর্শয়ামাস। (ততঃ) সৌম্যবপুঃ মনুষ্যমূর্ত্তিঃ ভূত্বা মহাত্মা পুনঃ ভীতম্ (বিশ্বরূপদর্শনভীতং) এনম্ (অর্জ্জুনং) আশ্বাসয়ামাস (আশ্বস্তং চকার) ৫০

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন—বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলিয়া পুনরায় স্বকীয় সেই চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। মহাত্মা বাসুদেব (বিশ্বরূপধারী) অনন্তর প্রসন্ন হইয়া সৌম্য মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভীত অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিলেন। ৫০

আলোচনা। যেরূপ দেখিলে অর্জ্জুনের আনন্দ হয়, ভগবান্ বিশ্বরূপ সংবরণ করিয়া, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কিরীটকুণ্ডলযুক্ত চতুর্ভুজ বাসুদেবমূর্ত্তি ধারণ করিলেন ও পরে মনুষ্যমূর্ত্তিতে অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিলেন। ৫০

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

সান্বয়ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ। হে জনার্দ্দন তব ইদং সৌম্যং (শান্তং) মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীং অহং সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্তঃ) সংবৃত্তঃ (সংজাতঃ) প্রকৃতিং গতঃ চ অস্মি (স্বভাবং স্বাস্থ্যং গতশ্চ অস্মি) ৫১

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন। তোমার এই প্রশান্ত মনুষ্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি সুস্থচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম। ৫১

আলোচনা। অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীতবিহ্বল হইয়াছিলেন। পুনরায় শান্ত মানুষমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট ও সুস্থ হইলেন। অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন "তোমার কিরীটযুক্ত শঙ্খপদ্মগদাচক্রধর চতুর্ভুজরূপ আমাকে

দেখাইয়া সুস্থ কর"—এখন বলিতেছেন "দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব।" চতুর্ভুজ-রূপ সাধারণ মানবাকার নহে। কিরীটকুণ্ডলগদাচক্রাদিধর চতুর্ভুজ অর্জ্জুনের ইষ্টমূর্ত্তি। তাহা তাঁহার জ্ঞানগম্য ধ্যান-গোচর। আর এই দ্বিভুজ মানবীয়-মূর্ত্তি তাঁহার এবং সাধারণের দর্শন-গোচর। ৫১

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২

সান্বয়ব্যাখ্যা। শ্রীভগবান্ উবাচ। মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং (দুর্নিরীক্ষ্যং) যত্ রূপং (বিশ্বরূপং) দৃষ্টবান্ অসি, দেবা অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।৫২

বঙ্গানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমার যে সুদুর্দ্দর্শ বিশ্বরূপ তুমি দেখিলে, দেবতারাও সর্ব্বদা এই রূপ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করেন। ৫২

আলোচনা। ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন ভয়বিহ্বল হইয়া বলিলেন—"আমি তোমার বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিনা, আমাকে চতুর্ভুজরূপ দেখাও।" ইহা ভক্তের আব্দার। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই বিশ্বরূপ-দর্শনের জন্য লালায়িত বটে, কিন্তু ইহার দর্শনলাভ তাঁহাদের পক্ষেও দুর্লভ। ছান্দোগ্য উপনিষদে জানা যায়, ইন্দ্র ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য ব্রহ্মার নিকট গমন করেন এবং ব্রহ্মার উপদেশে বহুবর্ষ তপস্যা করেন। পরে ব্রহ্মার সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হন। কেবল ভক্ত, শিষ্য ও শরণাগত বলিয়া অর্জ্জুন সুখের কথায় সেই দেব-দুর্লভ বিশ্ব-মূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছেন। ৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি, ন বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন নচ ইজ্যয়া (যজ্ঞেন) এবংবিধঃ অহং দ্রষ্টুং শক্যঃ। ৫৩

বঙ্গানুবাদ। আমাকে যেরূপ দেখিলে, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান অথবা যজ্ঞ দ্বারা ঈদৃশ বিশ্বরূপাত্মক আমাকে কেহই দেখিতে পায় না। ৫৩

আলোচনা। ভগবানের এই উক্তি দ্বারা জানা যায় যে, কেবল কর্ম্ম দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ভক্তি-বিরহিত বেদপাঠ-ইত্যাদি দ্বারা, ভক্তিহীন তপস্যা দ্বারা, ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত দান, কিম্বা সকাম যজ্ঞাদি দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ঐ সকল কর্ম্মের ফল পৃথক।

কেবল ভক্তি, ভগবৎশরণাগতি এবং ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ-পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধন দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যাইতে পারে। ৫৩

ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪

সান্বয়ব্যাখ্যা। তর্হি কেনোপায়েন ত্বং দ্রষ্টুং শক্য ইতি? তত্রাহ হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যয়া (মদেকনিষ্ঠয়া) ভক্ত্যাতু এবংবিধঃ (বিশ্বরূপঃ) অহং তত্ত্বেন (পরমার্থতঃ) জ্ঞাতুং (শাস্ত্রতঃ) দ্রষ্টুঞ্চ (প্রত্যক্ষতঃ) প্রবেষ্টুঞ্চ শক্যঃ। ৫৪

বঙ্গানুবাদ। হে পরন্তপ! হে অর্জ্জুন! আমার প্রতি কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই এবম্বিধ প্রকৃতরূপে আমাকে জানিতে, প্রত্যক্ষ করিতে এবং আমাতে বিলীন হইতে পারা যায়। ৫৪

আলোচনা। ভগবান্‌ ভক্তি-লভ্য বটে, কিন্তু সে ভক্তি সাধনা-সাধ্যা অনন্য-সাধারণী। ইহার নাম পরাভক্তি। এই ভক্তির উদয় হইলে জীব সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু জানে, তাহা ভগবান্‌ হইতে পৃথক্‌ বলিয়া বুঝেনা, অপিচ সকল বস্তুতেই সর্ব্বদা ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করে। একমাত্র ভগবানে ভক্তি-নিষ্ঠার উদয় হইলে, ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে। এই ভক্তি দ্বারাই ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। এই সাক্ষাৎকারের নামই বিশ্বরূপ-দর্শন। অর্জ্জুন পুরুষকার ভুলিয়া অনন্যভক্তিসহকারে ভগবানের শরণাগত হইয়াছিলেন বলিয়াই বিশ্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৫৪

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

সান্বয়ব্যাখ্যা। অতঃ গীতাশাস্ত্রার্থসারং পরম-রহস্যং শৃণু ইত্যাহ। হে পাণ্ডব! যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ (মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি তথা) মৎপরমঃ (অহমেব পরমঃ পুরুষার্থোযস্য সঃ) মদ্ভক্তঃ (মমৈব ভক্ত আশ্রিতঃ) সঙ্গবর্জ্জিতঃ (ধন-মিত্র-পুত্র-কলত্র-বন্ধুবর্গেষু সঙ্গ-বিহীনঃ) নির্ব্বৈরশ্চ সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতেষু শত্রুভাববর্জ্জিতঃ) স মাম্‌ এতি (প্রাপ্নোতি) (নান্যঃ) ৫৫

বঙ্গানুবাদ। হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমারই প্রীতির উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, আমাকেই পরমগতি বলিয়া মনে করেন, যিনি আমারই আশ্রিত ভক্ত, যিনি ধনপুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তিরহিত, জগতে কাহারও প্রতি যাঁহার বৈরভাব নাই, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন। ৫৫

আলোচনা। ভগবান্ গীতায় সার মর্ম্ম এ শ্লোকে বলিয়াছেন। যে কেবল ভগবানের চরণে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করে, ভগবান্‌কেই যে ঐহিক পারত্রিকের গতি বোধ করিয়া তাঁহারই তৃপ্ত্যর্থে কর্ম্ম করে, যে কেবল ভগবানেই পরম প্রেম করে, যে ভগবান্‌কে পাইবার জন্য ধন-পুত্র-কলত্রাদি ঐহিকের সুখকর বস্তুতে আসক্তিশূন্য হয়, সকল প্রাণীতেই—এমন কি যে অত্যন্ত অপকারও করে—তাহারও প্রতি শত্রুতা-বুদ্ধি-হীন হয়, একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত যাহার মতি গতি বুদ্ধি চিন্তা নাই, সে-ই ভগবান্‌কে পায়, অন্যে পায় না। ৫৫

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু যোগশাস্ত্রে বিশ্বরূপ-
দর্শনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

জনহিতকর কর্ম্ম।

বর্ত্তমান-সময়ে জনহিতকর কর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রাচীনকালের মানব-মণ্ডলীর হৃদয়-স্রোতস্বতীতেও যে এতদনুরূপ ভাবস্রোত প্রবাহিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। মানুষ চিরকালই মানুষ। আত্মহিতের সহিত যে জনহিতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, আর জনহিতের উপরেই যে আত্মহিতের প্রতিষ্ঠা, একথা সকল সময়ের সকল দেশের মনস্বিবৃন্দেরই সুবিদিত। নিজের কল্যাণ-সাধনে মনোযোগী মানুষ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, এককথায় তাহারই নাম জনহিতকর কর্ম্ম। যে সকল মানব এই সূক্ষ্ম সত্যের অনুসরণ করিতে সমর্থ নহে, তাহারা আত্মহিতের নামে আত্মক্ষতিরই অনুগমন করে এবং বুঝিবার দোষে আত্মকল্যাণের পথে কণ্টকারোপ করিয়া স্বীয় মনুষ্যত্বকে কলঙ্কিত ও সঙ্কুচিত করে। প্রাচীন-ভারতে জনহিত-সংস্পর্শশূন্য আত্মহিতের ধারণাই ছিল না।

অনেকে মনে করেন, "প্রাচীনভারতের মানবমণ্ডলী আত্মহিত লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা স্বীয় স্বর্গ-গমনের পথ পরিষ্কার করিবার প্রত্যাশায় ক্লেশসাধ্য ব্যয়-বহুল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন—নিজের মুক্তির সন্ধানে ক্লান্ত হইয়া, সংসার বিসর্জ্জন দিয়া, বনচারী তপঃকারী হইয়া, কেবল আত্মচিন্তারই

মত্ত থাকিতেন। তাঁহাদের চিত্তে জনহিতের চিন্তা উঠিত না। নিতান্ত স্বার্থপর জীবের মত তাঁহারা নিজের ব্যক্তিত্ব বা আমিত্বের গণ্ডীতেই নিজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিবদ্ধ রাখিতেন। তখন ব্যক্তিগত ভাবের প্রাবল্য ছিল। সংঘ বা সমাজগত ভাবের প্রচুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইত না।" আমরা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিকূলে প্রমাণ প্রয়োগ করিব।

আমরা জানি, মানুষ ভাবে দুইটী কাল লইয়া—একটী বর্ত্তমান, অপর ভবিষ্যৎ। অতীতের উপর হস্তক্ষেপ করা যায় না—কৃতস্য করণং নাস্তি। বর্ত্তমান বিদ্যমান, ভবিষ্যৎ অনাগত। মানুষ বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার করিতে চায় এবং মনোরম-ভবিষ্যতের আবাহন করিতে ব্যস্ত হয়। মানুষের সমস্ত কার্য্য-প্রণালী ঐহিক ও পারত্রিক এই উভয়বিধ ভাবে প্রকাশ পায়।

প্রাচীন-ভারতের মানব যে স্বীয় ঐহিক-পারত্রিক কল্যাণের জন্য যত্নবান্ হইতেন, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যেও জনহিতের চেষ্টার বলবত্তা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার সন্ধান পাইব।

প্রাচীন ভারতের মানবগণ সাধারণতঃ দ্বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন—এক ইষ্টকর্ম্ম, অপর পূর্ত্তকর্ম্ম। যজ্ঞাদি কর্ম্মের নাম ইষ্ট; আর জলাশয়, দেবাগার, অন্নসত্র, আরোগ্যশালা, উদ্যানাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য পূর্ত্তকার্য্য।

ইষ্টকর্ম্ম যজ্ঞাদির ফল যজমানই ভোগ করিবেন। যজ্ঞের ফলে যজমানই স্বর্গে যাইবেন—(তদ্দ্বারা দেশস্থ জনসাধারণ স্বর্গে যাইতে পারিবে না—) ইহা ঠিক, কিন্তু যজ্ঞকারী ঐ কর্ম্ম দ্বারা দেশের জনসাধারণের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের সহায় হন—ইহাও সম্পূর্ণ সত্য। যজ্ঞে ঋত্বিক্ চাই, দ্রব্য-সামগ্রী চাই। ঋত্বিক্ বেদবিদ্যায় পারদর্শী না হইলে যজ্ঞের যোগ্য হইবেন না। নানাবিধ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য না হইলে শুধু কথায় (মন্ত্রে) যজ্ঞ হইবে না। যজমান্ সংযত শান্ত ও ত্যাগী হইবেন। যদি কেহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হন, তবে তিনি পক্ষান্তরে দেশের বিদ্যা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতির সংরক্ষণের সহায় হইবেন। জ্ঞান-দানে দীক্ষিত, নানাসুশিক্ষায় শিক্ষিত, সংযত ঋত্বিক্ মণ্ডলীকে গোধন, ভূমি ও স্বর্ণাদি সম্পৎ প্রদান করিয়া যাঁহারা রক্ষা করেন এবং তাঁহাদের জ্ঞানার্জ্জনে ও জ্ঞান-বিতরণে উৎসাহ প্রদান করেন, তাঁহারা কি শুধু স্বার্থ-সাধনেরই সন্ধান করেন, না লোকহিতের চিন্তাও করেন? যজ্ঞের অনুষ্ঠান যখন বিদ্যমান ছিল, তখন বাস্তুবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, রেখাগণিত,

স্বর্ণবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা, শারীর-তত্ত্ব, ব্যক্তগণিত, বীজগণিত, গারুড়বিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা ও গান্ধর্ব্বতন্ত্রাদির শিক্ষার প্রচার ছিল। যে মহাত্মা এই সকল বিদ্যায় অভিজ্ঞ যাজ্ঞিক, শিল্পী ও কলাকুশলগণকে প্রতিপালন করিতেন, তাঁহার কি জনহিতের ধারণা ছিল না? যজমান, বিভিন্ন ব্যবসায়ী নানাসম্প্রদায়ের জীবিকা-সংস্থানের সহায়।

পূর্ত্তকর্ম্ম যে জনহিতকর কর্ম্ম, তাহাতে সংশয় নাই। যিনি জলাশয়-খনন করেন এবং জগজ্জীবের স্নান-পানের জন্য তাহা উৎসর্গ করেন, তিনি কি সঙ্কীর্ণচেতাঃ? অন্নদান, জলদান, জ্ঞানদান, ধনদান, আশ্রয়দান, ঔষধদান, অভয়দান প্রভৃতি কি দাতার প্রাণের বিশ্বজনীন উদারভাব প্রকাশ করে না? ভারতের দানধর্ম্ম, আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই আত্ম'হতের সূচনা করে, আত্মম্ভরিতার মধ্য দিয়া আত্মসঙ্কোচের পরিচয় দেয় না। ভারতে যে জনহিতকর নানা পুণ্যানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহা নিঃসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যায়।

ভারতের জ্ঞানদাতা আচার্য্য বা উপাধ্যায়, বেতন গ্রহণ করিতেন না, প্রত্যুত বিদ্যার্থীকে পুত্রবৎ পালন করিতেন ও অন্নদান-পূর্ব্বক জ্ঞানদান করিতেন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তি, অপরকে শিক্ষা না দিলে পাপভাগী হইতে হইবে—বিশ্বাস করিতেন। প্রাচীন ভারতীয় মানব প্রতিদিন দেবতার, পিতৃগণের, ঋষিগণের, মনুষ্যগণের—এমন কি গবাদি পশু হইতে কীটপতঙ্গাদি পর্য্যন্তের সেবা না করিয়া জল-গ্রহণ করিতেন না। জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া তাঁহার জনহিত-প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠিত।

যে দিক্ দিয়াই দেখি, প্রাচীন ভারতের মানুষেরা বিশ্বপূজার পথে আত্মপূজায় উপনীত হইতেন। জগতের লৌকিক কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়া, সমস্ত বাসনা-কামনা বিসর্জ্জন দিয়া, প্রাচীনভারতের মনীষী যখন সন্ন্যাস লইতেন, তখন তিনি আত্মচিন্তায় বিভোর থাকিতেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের আধ্যাত্মিক-কল্যাণ-সাধনে তখনও তিনি বদ্ধপরিকর। সন্ন্যাসগ্রহণের সময় তিনি দুইটী উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রব্রজ্যাবলম্বন করিতেন। শাস্ত্র বলেন তাহার একটী "আত্মনোমোক্ষায়"—অপরটী 'জগতোহিতায়'। "জগতের কল্যাণ ও আত্মমোক্ষ" প্রাচীনভারতের মানবের চরমজীবনের লক্ষ্য ছিল। মুমুক্ষু সন্ন্যাসী যে সাধারণ গৃহস্থজীবনের অনুকরণে জনহিত করিতেন না, তাহা সত্য, (কারণ সে কার্য্য সম্পাদন করিয়াই তিনি চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন), কিন্তু তিনি যে সাধারণ মানবের যথার্থ হিতের জন্য—তত্ত্বজ্ঞানের

সাহায্য করিতেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহাদের নীরব-জীবন দৃষ্টান্ত দ্বারা যে শিক্ষা দিতে পারে, সহস্র মুখর অথচ আত্মদর্শন-বিহীন মানবের বক্তৃতামালা সে শিক্ষার আভাস দিতেও অসমর্থ। একজন মৌনী সাধু পণ্ডিত, মানুষের মনের যে উন্নতি সাধন করিতে পারেন, সহস্র সাধারণ উপদেষ্টাও যে তাহা পারেন না—ইহা অনুভব করা কি কষ্টসাধ্য? মোক্ষার্থী পুরুষের জ্ঞানে 'আত্মা' সঙ্কীর্ণ নহে, "চৌদ্দপোয়া"র মধ্যে আবদ্ধ নহে, অনন্ত বিশ্বব্যাপী। তাঁহার আত্মহিত-চিন্তা অর্থ—বিশ্বাতিগ অনন্তের স্বপ্রতিষ্ঠভাবের সাক্ষাৎকার। ইহাপেক্ষা উচ্চ ধারণা কোথায় আছে? বলিয়াছি, লৌকিকভাবে জনহিতকর কার্য্যে প্রাচীন ভারত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অদ্য তাহার একটী নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রাচীনভারতে রোগচিকিৎসার ও রোগিসেবার জন্য আরোগ্যশালা-স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানকালের 'হস্পিটাল' যেরূপ, সেগুলি অনেকটা সেইরূপই ছিল। নন্দিপুরাণে আছে—

ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষানাং আরোগ্যং সাধনং যতঃ।
অতস্ত্বারোগ্যদানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ।
আরোগ্যশালাং কুর্ব্বীত মহৌষধপরিচ্ছদাং।
বিদগ্ধবৈদ্যসংযুক্তাং ঘৃতান্নমধুসংযুতাম্।

*　　*　　*

আরোগ্যশালামেবং তু কুর্য্যাদ্ যো ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ।
স পুমান্ ধার্ম্মিকো লোকে স কৃতার্থঃ স বুদ্ধিমান্।
সম্যগারোগ্যশালায়ামৌষধৈঃ স্নেহপাচনৈঃ
ব্যাধিতং নীরুজীকৃত্য অপ্যেকং করুণাযুতঃ।
প্রয়াতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তকসংযুতঃ।
আঢ্যোবিত্তাসারেণ দরিদ্রঃ ফলভাগ্ভবেৎ।
দরিদ্রস্তু কৃতঃ শালা আরোগ্যায় ভিষক্তথা।
অপি মূল্যেন কেনাপি চন্দনাদ্যৈরথাপিবা
স্বীকুর্ত্তে লভেন্মর্ত্ত্যো পূর্ব্বোক্তং লোকমব্যয়ম্।

আরোগ্য চতুর্ব্বর্গের সাধন—এজন্য যিনি আরোগ্য দান করেন তিনি সবই দান করেন। আরোগ্যশালার প্রতিষ্ঠা করিবে। তাহাতে নানা ঔষধ ও পরিচ্ছদ রাখিবে, উপযুক্ত চিকিৎসক রাখিবে, ঘৃত, অন্ন, মধু ইত্যাদি পথ্য

ও উপকরণ-সামগ্রী রাখিবে। যে ব্যক্তি একটী আরোগ্যশালা স্থাপন করেন, তিনিই ধার্ম্মিক, কৃতার্থ ও বুদ্ধিমান্। আরোগ্যশালায় অবস্থিত একটী রোগার্ত্তকেও যদি ঔষধ-পথ্যাদি দিয়া ব্যাধিমুক্ত করিতে পারেন—তাহা হইলে দাতা বা আরোগ্যশালাপ্রতিষ্ঠা, সপ্তপুরুষ সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ধনাঢ্যগণ অর্থবল অনুসারে বৃহদাকারে বা মধ্যমাকারে আরোগ্যশালার প্রতিষ্ঠা করিবেন। দরিদ্রও যদি বিত্ত ও সাধ্য অনুসারে আরোগ্যশালার উদ্দেশ্য সাধন করিতে সচেষ্ট হন, তিনিও তুল্যফল লাভ করিবেন। নিতান্ত যিনি দরিদ্র, যাঁহার আরোগ্যশালা-প্রতিষ্ঠার সাধ্য নাই, ব্যয়সাধ্য ঔষধ-পথ্য-সংগ্রহের ক্ষমতা নাই, বৈদ্যনিয়োগের শক্তি নাই, তিনিও যদি ওষধি-মূলাদি দ্বারা বা চন্দনাদি কাষ্ঠ দ্বারা অর্থাৎ অনায়াসলভ্য গাছগাছড়া দ্বারা কাহারও রোগাপনোদন করিতে পারেন, তবে তিনিও ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমানকালের দাতব্য-চিকিৎসালয়-স্থাপনের যত্ন হইতে এই দীনজনের বনৌষধি দ্বারা রোগাপনয়নের চেষ্টা কি সমধিক মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করে না? যে দেশের শাস্ত্রে এইরূপ বিধানের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়, যে দেশে রোগচিকিৎসা চিকিৎসকের ধর্ম্ম—কর্ত্তব্য বিবেচিত হইত, (অবশ্য জীবিকানুরোধে অম্বষ্ঠজাতির চিকিৎসাকার্য্যে অর্থগ্রহণের অধিকার পরবর্ত্তিকালে ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল) সে দেশে "ভিজিট্" ও ডিস্পেন্সারির "বিলের" বিভীষিকা কি ক্লেশের নহে? ভারতে যে পূর্ণাঙ্গ মানবসভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সভ্যতা বর্ত্তমানকালের অন্তঃসারশূন্যা বাহ্যচাকচিক্যশালিনী সভ্যতার মত নহে। তাহার বহির্ভাগ লোচনলোভন না হইতেও পারে, কিন্তু অভ্যন্তরভাগ যে অমৃতময়, তাহাতে সংশয়ের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। প্রাচীন ভারতের জনহিতকর কর্ম্মের কথা আমরা অবসরে আরও বলিব।

শ্রী——

শ্রীশ্রীচণ্ডী-স্তোত্রম্।

(১)

দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে! প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি! চরাচরস্য ॥
শরণ-আপন্ন জনে রক্ষ নিরন্তর,
প্রসন্না হওগো মাতঃ! জগৎ উপর;
চরাচর-অধীশ্বরী, ওগো বিশ্বেশ্বরি!
ব্রহ্মাণ্ড পালন্ কর করুণা-বিতরি।

(২)

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা,
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥
বসুমতীরূপে মাগো করি অবস্থান
জগত-আশ্রয় তুমি; জলরূপ ধরি
সাধিছ জগৎ-তৃপ্তি তুমি বীর্য্যবতী,
প্রসন্না হওগো এই দীনগণ প্রতি।

(৩)

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেত-
ত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥
ব্রহ্মাণ্ডের বীজভূতা বৈষ্ণবী-শকতি,
অনন্তবীর্য্যা তুমি পরমাপ্রকৃতি;
তব মায়াবলে মুগ্ধ সর্ব্বজীবগণ,
প্রসন্না হইলে তুমি মুক্তির কারণ।

(৪)

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্য-পরাপরোক্তিঃ ॥

বিদ্যা সব তোমারই বিভিন্ন মূরতি,
সকল নারীতে দেবি ! তুমি মূর্ত্তিমতী।
একা তুমি ব্যাপিয়াছ সমগ্র ভুবন,—
তোমার স্তুতির যোগ্য কি আছে বচন ?

(৫)

সর্ব্বভূতাযদা দেবী স্বর্গমুক্তি-প্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কাবাভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥
সর্ব্বরূপা তুমি দেবি দ্যোতনলক্ষণা,
স্বর্গ-মুক্তি-প্রদা তুমি, অপার করুণা—
কি বলিয়া স্তুতিগান করিব তোমার ?
স্তবের অতীতা তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের সার।

(৬)

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি ! নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বহৃদে বুদ্ধিরূপে হয়ে অধিষ্ঠান
স্বর্গ অপবর্গ তুমি করগো প্রদান ;
চরণ-কমলে তব করি নমস্কার,
নারায়ণি ! আমা সবে কর মা' উদ্ধার।

(৭)

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম-প্রদায়িনি !
বিশ্বস্যোপরতৌশক্তে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
দণ্ড পল আদিরূপে তুমিগো জননি !
ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ কর নারায়ণি !
আবার বিশ্বের তুমি প্রলয়-কারণ ;
নমস্কার করি তোমা হ'য়ে একমন।

(৮)

সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে ;
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বসিদ্ধি-দাত্রী তুমি মঙ্গল-আলয়,
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মাগো তুমিই আশ্রয় ;

শির নোয়াইয়া তব চরণ-কমলে
নমস্কার করি মাগো মহাকুতূহলে।

(৯)

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি!
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের শকতির খনি,
গুণময়ী, গুণের আশ্রয়, সনাতনী;
শির নোয়াইয়া তব চরণ-কমলে
নারায়ণি! নমস্কার করি কুতূহলে।

(১০)

শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে!
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥
শরণ-আপন্ন দীন দরিদ্র-নিকরে
পরিত্রাণ কর তুমি বিপদ্-মাঝারে;
দূর কর দুঃখ-কষ্ট নিয়ত সবার—
নারায়ণি! মোরা তোমা করি নমস্কার।

(১১)

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপ-ধারিণি!
কৌশাম্ভঃ ক্ষরিকে দেবি নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥
হংসযুক্ত যানে দেবি করি আরোহণ
ব্রহ্মাণীরূপেতে কর ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ—
কুশাভিমন্ত্রিত জল করহ সেচন
নারায়ণি! নমি তব পদে অনুক্ষণ।

(১২)

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি!
মাহেশ্বরী-স্বরূপেণ নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥
ত্রিশূল চন্দ্রার্দ্ধ সর্প করিয়া ধারণ,
মহাবৃষে তুমি মাগো করি আরোহণ,
মাহেশ্বরীরূপে দেবি কর বিচরণ
নারায়ণি! নমি তোমা মোরা অনুক্ষণ।

(১৩)

ময়ূর-কুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে!
কৌমারীরূপ-সংস্থানে নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥
কৌমারীরূপেতে মহাশক্তি ধরি করে,
বেষ্টিত হইয়া আছ কুক্কুট-নিকরে;
শিখিবরাসনে তুমি কর বিচরণ,
নারায়ণি! নমি তোমা মোরা অনুক্ষণ।

(১৪)

শঙ্খচক্রগদা-শার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে!
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ করিয়া ধারণ
বৈষ্ণবীরূপেতে দেবি কর বিচরণ,
প্রসন্না হওগো মাতঃ আমাদের প্রতি
নারায়ণি! মোরা সবে তোমা করি নতি।

(১৫)

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে! দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে!
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
মহাচক্র লয়ে করে করি বিচরণ—,
ধরিয়া বরাহরূপ অতীব ভীষণ
তুমিই ধরারে দেবি! করিলে উদ্ধার;
নারায়ণি! মোরা তোমা করি নমস্কার।

(১৬)

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্‌কৃতোদ্যমে!
ত্রৈলোক্যত্রাণ-সহিতে নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥
ত্রৈলোক্যতারিণী তুমি, মঙ্গল-কারণ,
ভীষণ নৃসিংহমূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
হইলা উদ্যত দৈত্যে করিতে সংহার
নারায়ণি! মোরা তোমা করি নমস্কার।

(১৭)

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে!
বৃত্রপ্রাণহরে ঐন্দ্রি নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥

সহস্রনয়োজ্জ্বল ইন্দ্রাণীরূপেতে
কিরীটিনি! মহাবজ্র লইয়া করেতে,
তুমি দেবি! বৃত্রাসুরে করিলা সংহার—
নারায়ণি! মোরা তোমা করি নমস্কার।

(১৮)

শিবদূতী-স্বরূপেণ হত-দৈত্য-মহাবলে!
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥
শিবদূতীরূপে মাগো করিয়া হুঙ্কার
মহাবল দৈত্যসেনা করিলে সংহার,
শির নোয়াইয়া তব চরণ-কমলে
নারায়ণি! নমি তোমা মোরা কুতূহলে।

(১৯)

দংষ্ট্রা-করালবদনে শিরোমালাবিভূষণে!
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥
করালবদনা তুমি নৃমুণ্ডমালিনী,
তুমিগো চামুণ্ডা মুণ্ডাসুর-বিঘাতিনী।
শির নোয়াইয়া তব চরণ-কমলে
নারায়ণি! নমি তোমা আমরা সকলে।

(২০)

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধেপুষ্টিস্বধে ধ্রুবে!
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি! নমোস্তুতে॥
লক্ষ্মী লজ্জা মহাবিদ্যা স্বধা সনাতনা
মহারাত্রি মহামায়া অমেয়রূপিণী,
শ্রদ্ধা-পুষ্টি-রূপে তুমি ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে,
নারায়ণি! নমি তোমা পরম যতনে।

(২১)

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি!
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥
ঐশ্বর্য্য-স্বরূপা তুমি, মেধা সরস্বতী,
সংহার-কারিণীশ্রেষ্ঠা, তুমি গো নিয়তি।

সবার ঈশ্বরী তুমি, দয়ার আধার—
নারায়ণি! মোরা তোমা করি নমস্কার।

(২২)

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি! নমোঽস্তুতে॥

সর্ব্বরূপা তুমি মা'গো জগৎ ঈশ্বরী,
সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা, করুণা বিতরি
রক্ষা কর, এই ভয়াকুল আমা সবে,
দুর্গে দেবি! নমি তব চরণ-পল্লবে।

(২৩)

এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়-ভূষিতম্।
পাতুনঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি! নমোঽস্তুতে॥

তোমার নয়নত্রয় অতীব উজ্জ্বল,
পরম সুন্দর তব বদন-কমল
সর্ব্বভূত হ'তে রক্ষা করুক মোদেরে,
কাত্যায়নি! নমি তোমা কৃতাঞ্জলি ক'রে।

(২৪)

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতেঃ ভদ্রকালি নমোঽস্তুতে॥

অতি ভয়ঙ্কর উগ্র অনল-সমান
সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূলে আমা সবে কর ত্রাণ—
যে ত্রিশূলে দৈত্যবংশ করিলে সংহার;
ভদ্রকালি! মোরা তোমা করি নমস্কার।

(২৫)

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি! পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব॥

কাঁপাইয়া ধরণীরে ঘোর ঘন-রবে
দানব-কুলের তেজ হরিলা আহবে—
(রক্ষা করে মাতৃদেবী তনয়ে যেমতি)
তোমার সে ঘণ্টা, মোদের রাখুক সম্প্রতি।

(২৬)

অসুরাসৃগ্বসা-পঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে! ত্বাং নতা বয়ম্॥

রক্তমেদঃ-পঙ্কে লিপ্ত যত অসুরের
করুক তোমার খড়্গ শুভ আমাদের।
শির নোয়াইয়া মাগো আমরা সকলে
প্রণমি চণ্ডিকে! তব চরণ-কমলে।

(২৭)

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতাহ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥

দূরে যায় আধিব্যাধি তব কৃপা-বলে,
অশেষ অনিষ্ট ঘটে তুমি রুষ্ট হলে;
তোমার আশ্রিত নর বিপদ্ না পায়—
তোমার আশ্রিত পায় সর্ব্বত্র আশ্রয়।

(২৮)

এতৎ কৃতং যৎকদনং ত্বয়াদ্য
ধর্ম্ম-দ্বিষাং দেবি! মহাসুরানাম্।
রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে! তৎ প্রকরোতি কান্যা॥

বহুবিধ রূপ তুমি করিয়া প্রকাশ
ধর্ম্মদ্বেষী মহাসুরে করিলে বিনাশ।
যে কাজ করিলে অদ্য অস্ত্রের প্রহারে,
তুমি ভিন্ন অন্যে তাহা কভু নাহি পারে।

(২৯)

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষ্বা-
দ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতি মহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥

সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞান- দীপে,
আদ্য বাক্যে সুপ্রতীতা তুমি বিশ্বরূপে!
দেবি! মহামোহময় মমতার বিলে
ভ্রমণ করাও সদা ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে।

(৩০)

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগাঃ
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলোযত্র তথাব্ধি মধ্যে
তত্রস্থিতাত্বং পরিপাসি বিশ্বং॥
যক্ষ-রক্ষ নাগ বৈরি উগ্রবিষধর
দাবানল হতে রক্ষ মানব-নিকর,
পারাবার-সম এই পৃথিবী মাঝারে
ত্রাণ কর নিরন্তর তুমি গো সবারে॥

(৩১)

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং,
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্‌।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥
বিশ্বের ঈশ্বরী মাগো ব্রহ্মাণ্ডপালিনি!
বিশ্ববন্দ্যা বিশ্বাত্মিকা জগৎ-ধারিণী;
উপাসনা করে যারা নিয়ত তোমার,
হয় গো বিশ্বের তারা আশ্রয় সবার।

(৩২)

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরি-ভীতেঃ
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাত-পাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্‌॥
প্রসীদ হে দেবি! রক্ষ শত্রুভয় হ'তে,
সম্প্রতি অসুরে বধি রক্ষিছ যেমতে;
জগতের পাপ নাশ কর শীঘ্র অতি—
উৎপাত-জনিত ভয় নাশ ওগো সতি

(৩৩)

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি ! বিশ্বার্ত্তিহারিণি ?
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে ! লোকানাং বরদা ভব ॥
প্রণত জনের প্রতি করুণা বিতরি
বিশ্বআর্ত্তি নাশ কর ওগো বিশ্বেশ্বরি !
ত্রৈলোক্যবাসীর পূজ্যা, যাচি, ও চরণ—
আমা সবে বর-দান কর অনুক্ষণ ।

(৩৪)

অক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বরি ॥
মাত্রা-হীন হয় যদি স্তবের ভিতর
পরিভ্রষ্ট হয় কিম্বা অক্ষর নিকর,
তুমি দেবি ! মহেশ্বরি ! করুণা অপার
পূর্ণ হয় তাহা যেন কৃপায় তোমার ।

শ্রীপশুপতি সরকার।

কতিপয় প্রশ্নের উত্তরের সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ।

আমরা গত ভাদ্রমাসের হিন্দু-পত্রিকায় সন্দেহ-ভঞ্জন-কামনায় শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে যে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মীমাংসা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন—তাহাতে আমাদের সন্দেহভঞ্জন হয় নাই, সন্দেহ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম মাধবসম্প্রদায়ানুমোদিত শাস্ত্রবর্ণিত বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। অথচ ২য় সংখ্যা হিন্দু-পত্রিকায় ১১৬ পৃষ্ঠায় বলেন যে "গৌর-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম।" আবার বলিতেছেন—"মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিবার বিশেষ কোন কারণ থাকায়

জন্যই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।" আমাদের তিনি বলেন আউল, বাউল প্রভৃতিরা "গৌর নিতাই" বলিয়া ভিক্ষা করে বলিয়াই তিনি এরূপ পুনঃ ২ বলিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তাহারা গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত, এজন্যই ঐরূপ করিয়া থাকে। গৌরাঙ্গপ্রভুও মাতা ও স্ত্রী থাকিতে ভেক লইয়াছিলেন। তাহারাও প্রভুর অনুকরণে ভেক লইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। প্রভুর অনুকরণ করিবে, তাহাতে দোষ কি? তাহারা তাহাদের জ্ঞানে যাহা ভাল বোধ করে, তাহাই করিয়া থাকে, আর লেখক যে ভাবে যাহা ভাল বোঝেন, তাহাই তাঁহার সম্বন্ধে ভাল। এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায়ের উপর বিদ্বেষভাব কি ভাল? শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, বহু সম্প্রদায়ের মধ্যের একটী এবং উহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বা তৎ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—ইহা তাঁহার স্বীকারোক্তি। প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া কি আমাদের ন্যায় অশাস্ত্রজ্ঞ লোকদের ভ্রম জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করা উচিত? ধর্ম্ম সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম ভাবই ভাল, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। সম্প্রদায়গত বা দলগতভাবে পরস্পর পরস্পরের উপরে বিদ্বেষভাব আসিতে পারে।

লেখক মহাশয় স্থানে ২ শাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু শাস্ত্র বলিতে বেদ, উপনিষদ্, মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইত্যাদি বুঝিয়া থাকি। আরব্য-উপন্যাস, পারস্য-উপন্যাস, দুর্গেশ-নন্দিনী, কপাল-কুণ্ডলা, বঙ্গাধিপ-পরাজয় ইত্যাদি শাস্ত্র নহে। শাস্ত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথা থাকে। পদার্থতত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গ্রন্থে লিখিত থাকে তাহাকেই শাস্ত্র বলে। সুতরাং শাস্ত্র আর কিছুই নহে, বিজ্ঞানই শাস্ত্র আমরা এই বুঝি। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ ইত্যাদির কোন কথাই উল্লেখ করেন না, কেবল শ্রীচণ্ডীদাস, জয়দেব, গোবিন্দদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেন, আর তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ গানের কথা উল্লেখ করেন

শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় "মথুরার দাস্যভাব" কোথায় পাইলেন? সেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাজা। মথুরায় ঐশ্বর্য্যভাব, সেস্থানে ব্রজের ভাবের স্থান নাই। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ মোহনবাঁশী, ধড়া-চূড়া ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া রাজদণ্ড হাতে লইয়াছিলেন।

ব্রজের দাস্যভাবের অর্থ সেবা করা—তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারাই বুঝান হইয়াছে। ইহা পর্য্যন্তও বলা হইয়াছে যে, "ব্রজের দাস্যভাবের অর্থ হনুমানের ও গরুড়ের দাস্যভাব নহে; ব্রজের গোপিকারা দাস্যভাব ইত্যাদি দ্বারা সেবা করিত।"

শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সখ্য ও বাৎসল্যভাবে প্রসাদভক্ষণ বিরোধী হইতে পারে" বলিয়া আবার চতুর্থ সংখ্যায় ১৬৬ পৃষ্ঠায় ৭ম পংক্তিতে বলিয়াছেন যে, "সখা বাৎসল্যাদি ভাবে রাজসেবা করিতে পারেন।" আমরা জিজ্ঞাসা করি সখ্য ও বাৎসল্যভাব কি ব্রজের ভাব নহে? অথচ তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ইত্যাদির নিকট দিয়াও হাটেন নাই। আবার ইহাও বলিয়াছেন— প্রসাদভক্ষণ ব্রজের ভাবের বিরোধী, স্বীকার করিলেও ভক্ত-ভাবের বিরোধী নহে, পরন্তু অনুকূলই। বিরোধী অথচ অনুকূল—এ কেমন কথা? শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তভাব ছিল কে বলিল? আমরা জানি, তিনি ব্রজরসের প্রচারক। গৌরাঙ্গপ্রভু প্রসাদভক্ষণ করিতেন বলিয়াই কি লেখক একটা ভক্তভাবের অবতারণা করিলেন?

৭ম প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলিয়াছেন "ব্রজে বৃষভানুনন্দিনীই রাধা, আর নবদ্বীপে জীবমাত্রই রাধা।" ভাবিতে গেলে মনে হয়, প্রেমের দৃঢ়তার জন্যই ব্রজে আয়ান, জটিলা এবং কুটিলা ইত্যাদি পরিপন্থার অবতারণা। ইহারা না থাকিলে রাধার কলঙ্কভঞ্জন হইতে পারেনা। সে সব ব্যবস্থা এখানে কৈ? "নবদ্বীপে জীবমাত্রই রাধা"—ইহার অর্থ আমরা কিছুতেই বুঝিতে সক্ষম নহি। শুনিয়াছি, জীবের নিজের উপর রাধাভাব আরোপ করিবার অধিকার নাই। রাধাভবের উপাসনা অহংগ্রহোপাসনা উহা মায়াবাদের বস্তু। বৈষ্ণবমতে উহা অসম্ভব। লেখক ইহাও বলেন "ব্রজে আদান, নবদ্বীপে প্রাদান" আদানের অর্থ গ্রহণ এবং প্রদান অর্থ দেওয়া। কি গ্রহণ করা বা দেওয়া, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। ব্রজে কি আদান-প্রদান দুইই নাই? শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে সেবা ইত্যাদি পাইবার জন্য ব্রজবাসিদিগকে বকাশূর, অঘাশূর ইত্যাদি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কালীয়দমন এবং গোবর্দ্ধনধারণ করিয়া ইন্দ্রের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এ সকলকে উপকার বা প্রদান করা বলেন কি?

দূতকে সকলেই "বার্ত্তাবহ" বলিয়া জানেন। ভগবান্ বার্ত্তাবহ দূতরূপ সর্পকে পওহারি বাবাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার জন্যই পাঠাইয়াছিলেন— এই মনে করিয়া পওহারি বাবা বিষধর সর্পকেও বার্ত্তাবহ মনে করিয়া প্রিয়তমের দূত বলিয়াই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। দূতের অর্থ "দাস" করিতে চেষ্টা কেন? অত্রস্থলে তির্য্যক্ জাতির উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। পওহারি বাবার শব্দ-প্রয়োগে মনের ভাব অনুমান করিতে হইলে "প্রিয়তমের দূত" কথাটির বিশ্লেষণ আবশ্যক। প্রিয়তমের দূতের স্থানে প্রিয় প্রভুর দূত

কেহ বলেনা—বিষয়টী এই। পওহারি বাবা সাধক; তাঁহার মনের কথা শব্দে প্রকাশ পাইয়াছে। তির্য্যগ্‌জাতির অবতারণার অর্থ বুঝিলামনা।

৮ম প্রশ্নের উত্তরে লেখক—রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে অসহ্য বিরহ-যন্ত্রণায় ব্রজগোপীরা যে উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বকিয়াছিলেন, ঐ প্রলাপ-বাক্যের কএকটী শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ভাবিতে অনুরোধ করি। শোকাতুর পিতামাতা, পুত্র ইত্যাদির মৃত্যুতে "রে নিষ্ঠুর বিধাতা, তোর মনে এই ছিল! তুই এরূপ শক্রতা সাধন করিলি" ইত্যাদি বলিয়া বিধাতাকে গালি দেয়, কারণ পাগলের সব বলিবার অধিকার আছে। রাসেও সেই কথা। রাসলীলাতে দেখা যায় যে, প্রধানা গোপিকা পথশ্রান্তে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে উঠিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহার কিছুকালপরেই কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইবার পর বিরহে কাতর হইয়াছিলেন। এক্ষেত্রে প্রলাপ ভিন্ন আর কি বুঝা যায়? পূর্ব্বের বর্ণনার পর কি ঐশ্বর্য্যভাব সম্ভবপর হইতে পারে?

শান্তভাবের অর্থ নির্ম্মল প্রেমের ভাব। নির্ম্মল প্রেমই ঈশ্বর। বাইবেলেও বলে যে Love is God or God is love নির্ম্মল প্রেমের ভাবই পূর্ণব্রহ্মের তন্ময়ত্বভাব অর্থাৎ সোহংভাব। স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ, প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাবের প্রচারের জন্য ব্রজ-গোপিকা ও সখা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সখ্য প্রভৃতি প্রেমের ভাবে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি তাহাদের সকলের মধ্যে থাকিয়া এরূপ-ভাবে জীবশিক্ষার জন্য প্রেম-লীলা করেন, যেন সাধারণ জীব বুঝিতে না পারে যে তিনিই ঐ সমুদায় ভাবে লীলা খেলা করিতেছেন।

"শান্তের হয় কৃষ্ণনিষ্ঠা আর তৃষ্ণাত্যাগ" ইত্যাদি চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে লেখক শান্তভাব সম্বন্ধে যে কএকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই শান্তভাবের ব্যাখ্যার আভাস কতকটা পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন শান্তভাবের আর কি ব্যাখ্যা হইতে পারে! তিনি বাক্য এবং মনের অতীত। জীব সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা অধিক আর কি জানিবে! তুমি যে বলিবে—তিনি আছেন এই জ্ঞানেই আমাদের বাহাদুরী? কিন্তু জীবের তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস হইলে আর চাই কি?

শান্তভাব সম্বন্ধে—যাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিলাম। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা হইতে বিশদ ব্যাখ্যা দেন, তাহা হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় "প্রসাদ-ভক্ষণ সখ্য এবং বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের বিরোধী" বলিয়া স্বীকার করিয়াও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে ব্রজের ভাবের বিরোধী বলিতে অনিচ্ছুক হন কেন? যাহাই হউক, তিনি প্রকারান্তরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুকে ব্রজের ভাবের বিরোধী বলিতেছেন—তাহার কোন সন্দেহ নাই।

তারক-ব্রহ্ম-নাম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেছেন যে "আমি স্বীকার করিয়া লইলাম যে, মহাপ্রভু ঐ তিনটী নামই (হরি, কৃষ্ণ, রাম) না হয় করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি অনন্তনামধারী ভগবানের ঐ তিনটী নাম ব্যতীত অন্য নাম করিতে নিষেধ করিয়াছেন?" নিষেধ যদি না করিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখক আমাদিগকে বলিয়াদেন যে কোন্ কোন্ নাম করিতে বলিয়াছেন? লেখক অন্যনামের কথা কি জন্য অত্রস্থানে আনিলেন? তিনি ত "গৌর-নিতাই" নাম করার কথা বলেন নাই, তবে কেন ঐ নাম করা হয়? অত্রস্থলে শতনাম, সহস্রনাম, অনন্তনাম প্রভৃতির আবশ্যকতা দেখা যায় না। উপপাদ্য বিষয়টী ত্যাগ করিয়া অন্য বিষয় আরম্ভ করা তর্ক-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। আমাদের বক্তব্য, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হরি, কৃষ্ণ ও রাম নাম লওয়ার কথা বলিয়াছেন, গৌর-নিতাই নাম করার কথা বলেন নাই। ভাই কাণাই, কেলেসোণা, ননীচোরা, নন্দের দুলাল, মনচোরা ইত্যাদি মন্ত্রে কেহই দীক্ষিত হয় না। দীক্ষিত হউক্ আর না হউক্ তাহা দিয়া আমাদের কাজ নাই। আমাদের কাজ ভালবাসা। আমরা পূজা বুঝি না, প্রসাদভক্ষণ করা বুঝি না। আমাদের পূজা নাই, কেবল আছে ভালবাসা। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "কৃষ্ণকে ভালবাস কেন?" তবে বলিব—"ভালবাসিতে ইচ্ছে করে এজন্য ভালবাসি।" লেখক কি জানেন না যে ব্রজের প্রেম অহৈতুক প্রেম? ব্রজ-বাসীরা ভালবাসা চায় না, কেবল ভাল বাসিতে চায়। তাহারা অনুগ্রহ পাইবার জন্য কিছুই করে না অর্থাৎ ভালবাসা দিয়া কিছুই আদায় করিতে ইচ্ছা করে না। লেখক আবার বলেন "সকলেই স্বস্ব পুত্র কন্যাকে ভালবাসিয়া থাকেন, তাহাতে কেহ মুক্তিলাভ করেন না কেন?" মুক্তিলাভ করেন কিনা, তাহা লেখক কি প্রকারে জানেন? অনুগ্রহ পূর্ব্বক ২। ৪টী নাম করিলে কৃতার্থ হইব।

লেখক কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি নিজের পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে ভাল-বাসিতে জানে না, সে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালবাসিবে কিরূপে? প্রকৃত সাধক পুত্র কন্যা ইত্যাদিকে প্রেম শিক্ষা দিবার "গুরু" বলিয়া মনে করেন। ইংরেজী প্রবচন মনে হয় "Charity must begin at home" যে ব্যক্তি নিজের পুত্র

কন্যা প্রভৃতিকে কখনও ভালবাসে নাই, সে ভালবাসা যে কি পদার্থ, তাহা কি প্রকারে জানিবে বা বুঝিতে পারিবে এবং স্বয়ং প্রেমময় ঈশ্বরকে কিরূপে ভালবাসিবে? কারণ, ভালবাসা যে কি, তাহা সে জানে না। সুতরাং ভগবান্‌কে পাইতে হইলে পুত্র কন্যা, পিতা মাতা ইত্যাদির সাহায্যেই পাইতে হইবে। পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী ইত্যাদিকে ত্যাগ করিয়া ভগবান্‌কে পাওয়া অসম্ভব। ইংরেজিতে একটা কথা আছে Love mins love অর্থাৎ ভালবাসায় ভালবাসা (প্রেম) অর্থাৎ ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্প্রদায়গত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথায় জয়দেব ও লীলাশুক প্রভৃতির ঐশ্বর্য্যপূর্ণগানের কথা বলিয়াছেন। জয়দেবের একটী গানের কথা সকলেই জানেন, গানটী এই :—"দেহি পদপল্লবমুদারং। জয়রাধে, ত্বমসি মমজীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং ইত্যাদি। জয়দেবের এই গানটী কি ঐশ্বর্য্য-ভাবপূর্ণ? ব্যক্তিগতভাবের নানা ব্যক্তির নানা গান ইত্যাদি দ্বারা ব্রজের বিরুদ্ধ-ভাব-প্রকাশের চেষ্টা করা কি যুক্তি-সঙ্গত?

মহাপ্রভু হরি, কৃষ্ণ, এবং রাম নাম করার কথা বলিয়াছেন, তাহা লেখক স্বীকার করার পর বলেন যে, ঐ নামোচ্চারণে ফল হইবে, কিন্তু মহামন্ত্র-জপের ফল হইবে না। মহামন্ত্র যাহাতে ঐ তিনটী নাম আছে, তাহাই জপ করিতে হইবে, মানিয়া, এরূপ বলিবার কারণ কি? আমাদের কথা, মহাপ্রভু ঐ তিনটী নাম করার কথাই বলিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন যে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে." এই মহামন্ত্র জপ করিতে হইবে। আমরা জপের অর্থ এই বুঝি—পুনঃ পুনঃ নাম উচ্চারণ। শব্দটী 'হরি' না বলিয়া 'হরে' বলিয়া উচ্চারণ করার কারণ কি? তবে কি 'হরে' পদটী সম্বোধনের পদ নহে? যদি সম্বোধন হয়, তবে যে মহামন্ত্রের কথা বলিয়াছেন তাহাতে আহ্বান করাই বুঝাইবে—জপ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা বুঝাইবে না। জনৈক মহাত্মা ঐ মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

উক্ত মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে "জীব তাহার পুত্র কন্যা পৌত্র ইত্যাদি লইয়া সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। তাহার পুত্র কন্যা ইত্যাদি যম কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে যখন সে কেবল এককমাত্র জীবিত থাকে, তখন সে জীব মনে করে—উহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কোথায় গেল? আমি কে? কাহাদিগকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেছিলাম? আহা! উহাদের

কাহাকেও রাখিতে পারিলাম না। আমার ত উহাদের ন্যায় যাইতে হইবে; কোথায় যাইতে হইবে? কোথা হইতে আসিয়াছি?" ইত্যাদি বিষয় লইয়া আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া করিয়া যখন বুঝিতে পারে, ভগবান্ কর্তৃক তাহার প্রাণাধিক পাত্রগুলি অপহৃত হইয়াছে, তখনই সে ভগবান্‌কে হরি অর্থাৎ চোর বলিয়া সম্বোধন করে। এইরূপ হরণের জন্য উক্ত জীব ভবের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, কেহ কাহারও নহে—এই বুঝিয়াছে। তজ্জন্য জীব ভগবান্ হরিকে হরে. কৃষ্ণ এবং রাম বলিয়া আহ্বান করে। জীব বলে যে "হে ভববন্ধন-মোচনকারিণ্। আমাকে আকর্ষণ করিয়া আমাতে রমণ কর।" হরি শব্দের অর্থ ভববন্ধনমোচনকারী, কৃষ্ণ আকর্ষণকারী এবং রাম শব্দের অর্থ রমণকারী। মহামন্ত্রের কথা বলা হয় নাই। যে কএকটী নাম করার উপদেশ আছে, তাহাই বলা হইয়াছে। মহামন্ত্র-উল্লেখের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলাম না। লেখক যে মহামন্ত্রের জপ বা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের কথা বলিতেছেন, ইহা সেরূপ জপ নহে, ইহা দ্বারা ভগবান্‌কে সম্বোধনপূর্ব্বক আহ্বান অর্থাৎ ডাকা এবং প্রার্থনা করা বুঝায়। মহাপুরুষের নিকট আমরা এইরূপ শুনিয়াছি এবং আমাদের ইহাই বিশ্বাস।

শ্রীনীলাম্বর হুই।

স্ত্রী-শিক্ষা।

স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমানকালে হিন্দু-সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার নাম শুনিলেও অনেক রক্ষণশীল হিন্দু শিহরিয়া উঠেন। তাঁহারা মনে করেন, স্ত্রী-শিক্ষা দ্বারা সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা উৎপাদিত হইবে। তাঁহাদিগের এই ধারণা সর্ব্বতোভাবে অমূলক না হইতেও পারে। অধুনা পাশ্চাত্যজগতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা, যে সকল অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে চিরশান্তিপ্রিয় হিন্দুর পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া বিচিত্র নহে। বর্ত্তমানসময়ে যে সকল হিন্দুললনা পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদিগের আদর্শে ও

আচরণে সমাজের নৈতিক উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক্ বরং অনেক স্থলে শোচনীয় [illegible] অবনতিই হইতেছে। পাশ্চাত্যপথানুসারিণী স্ত্রী-শিক্ষা যে আদৌ সুফলপ্রদ হয় [illegible]—অথবা আধুনিকপ্রণালীতে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদিগের মধ্যে আদর্শ [illegible] কদাপি পরিদৃষ্ট হয় না—এরূপ কথা আমি বলিতেছি না। [illegible] দোষ বা কেবল গুণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; দোষ বা গুণ সর্ব্বত্রই [illegible] পরিমাণে বিদ্যমান। সুতরাং যাহাতে গুণের ভাগ অধিক, তাহাই [illegible] হওয়া উচিত এবং মানব-সমাজে এযাবৎ তাহাই হইতেছে। [illegible] স্ত্রীশিক্ষায় যে পরিমাণে কুফল ফলিতেছে, যে প্রকার [illegible] ও স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় ঘটিতেছে, তাহাতে এরূপ শিক্ষাকে [illegible] হইতে পারে না। যে শিক্ষায় স্ত্রীজাতি-সুলভ দয়া, স্নেহ, [illegible] সুকুমার স্বর্গীয় বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফুরণ না হইয়া [illegible], ঔদ্ধত্য প্রভৃতি পরুষভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা সুশিক্ষা হইলেও কদাপি স্ত্রীশিক্ষা-পদবাচ্য হইতে পারে না। এরূপ শিক্ষা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, এই চিরসন্তপ্ত কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে যে সকল শান্ত শীতল বিশ্রামকুঞ্জ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহারা অচিরে দাবদগ্ধ হইবে।

বর্ত্তমানপ্রবন্ধে এতাদৃশ স্ত্রী-শিক্ষার আলোচনা করা আদৌ আমার উদ্দেশ্য নহে। যে শিক্ষার ফলে পিতার মুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; সাবিত্রী ঐকান্তিকী সাধনায় পতিকে কাল-কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন; বালিকা বেহুলা, প্রাণেশের শবদেহ মাত্র সঙ্গী করিয়া ভেলক-আশ্রয়ে অকূলে ভাসিয়াছিলেন;—যে শিক্ষা-প্রভাবে পতিদেবতা দময়ন্তীর ন্যায় দেবদুর্লভ নারীচরিত্রের বিকাশ হইয়াছিল; শঙ্করাচার্য্যবিজয়িনী—পতিপ্রাণা উভয়ভারতী, প্রোজ্জ্বল-প্রতিভাময়ী লীলাবতী, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্বজনপূজনীয়া বিদুষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, আমি সেই সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী সনাতনী শিক্ষার সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বর্ত্তমানসময়ে আমাদের দেশে বালকদিগের শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই আগ্রহাতিশয্য পরিলক্ষিত হইতেছে. কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সাধারণের যথোচিত মনোযোগ নাই। অশিক্ষিত ও অভাবগ্রস্ত পল্লীবাসীই যে এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ তাহা নহে, কলিকাতার ন্যায় শিক্ষা, সভ্যতা ও সমৃদ্ধির স্থানেও ইহার শোচনীয় অভাব দৃষ্ট হয়।

তাহা না হইলে স্বর্গীয়া ভগ্নী নিবেদিতার হৃদয়-রক্তে প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার-বসুপল্লীর বালিকাবিদ্যালয়টী যে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিতেছেন না কেন? আমাদের দেশে এখনও পরহিতব্রতী মহামনা দানবীরের অভাব নাই। চক্ষের উপর এই সামান্য সময়ে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বহুলক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল। সুদূর য়ুরোপবাসিনী ভগ্নী নিবেদিতা, স্বদেশ, আত্মীয়স্বজন, সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনা ও বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া আমাদের জন্য—আমাদের সমাজের লক্ষ্মীস্বরূপিণী রমণীগণের সৎশিক্ষার জন্য, যে সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত ও তাহার সম্যক্ উৎকর্ষবিধানে স্বীয় মূল্যবান্ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, মনোযোগী হইলে, যে কোন বদান্য কুলের বরপুত্র অনায়াসেই যাহা সজীব রাখিতে পারেন, সেই নিঃস্বার্থ জনহিতৈষণার দিব্য দৃষ্টান্ত, সমাজের পরমহিতকর অনুষ্ঠানটী কি রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইবে না? সুশিক্ষার অভাবে ভারত-ললনা কি কল্পান্ত পর্য্যন্ত পুরুষের গলগ্রহ ও ভোগবিলাস-সাধনের সামগ্রী মাত্র হইয়া থাকিবে?

যে নারী জগৎপ্রসবিনী, অনন্তশক্তিশালিনী আদ্যাশক্তির অংশ-সম্ভূতা, সেই সংসারের ভিত্তি ও শ্রীস্বরূপা—নারীজাতির সৎশিক্ষা ও সুপালনে ভারতবাসী এত পশ্চাৎপদ কেন? চন্দ্রোদয়ে যেমন রজনীর অন্ধকার অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানালোক-বিকাশে হৃদয়ের ঘোর অজ্ঞানতমঃ বিদূরিত হয়। সৎশিক্ষার ফলে মানবের মনে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হয়; আর ধর্ম্মই মানবের বিশেষত্ব। শাস্ত্রকার তাহাই বলিয়াছেন—"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন প্রভৃতি প্রবৃত্তি পশু ও মানব উভয়েরই একরূপ। ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই কেবলমাত্র মনুষ্যের বিশেষত্বের হেতু; সুতরাং ধর্ম্মভাবশূন্য মানব পশুরই সমান।" * তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—যে ধর্ম্মরক্ষা ও ধর্ম্মপালন স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইলে শাস্ত্রবিধির অনুসরণ কর্ত্তব্য; এবং তজ্জন্য শাস্ত্রার্থজ্ঞান প্রয়োজনীয়। তাহাই পরমপুরুষ ভগবান্ বাসুদেব বলিয়াছেন,—"শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধিসুখ ও পরাগতি কিছুই লাভ করিতে পারেনা। অতএব

---

* আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষঃ
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥ মনু

ইহা কর্ত্তব্য, ইহা অকর্ত্তব্য—ইত্যাদিরূপ সন্দেহস্থলে শাস্ত্রই তোমার পথ-প্রদর্শক; সুতরাং শাস্ত্রবিধি জ্ঞাত হইয়া কর্ম্ম করিবে।" * আর শাস্ত্রাদেশের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইলে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

সুশিক্ষার প্রভাবে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, হৃদয় পবিত্র ও চরিত্র সুগঠিত হয়, এবং স্বাবলম্বনশক্তির পূর্ণ-বিকাশ হয়। যে শিক্ষায় এ-সমস্ত সুফল সম্যক্ অধিগত হওয়া যায় না—তাহা কোন প্রকারেই সুশিক্ষা-পদবাচ্য নহে। কেহবা সাহিত্যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কেহবা গণিতে বা বিজ্ঞানে অসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রকাশ করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, অপর কেহবা দুরধিগম্য দর্শনশাস্ত্রে অলোকসামান্য অধিকার লাভ করতঃ জনসমাজকে মোহিত করিয়াছেন, কিন্তু যদি ইঁহাদের অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল না হয়—যদি ইঁহাদিগের চরিত্র কিঞ্চিন্মাত্রও কলুষিত হয়, তবে আমরা কখনই ইঁহাদিগকে সুশিক্ষিত আখ্যায় অভিহিত করিব না। পক্ষান্তরে অপর একজন যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী নহেন, এবং কার্য্য-বিশেষ দ্বারা জনসমাজে প্রতিষ্ঠাপন্নও নহেন, কিন্তু যাঁহার হৃদয় পবিত্র, চরিত্র কলঙ্কস্পর্শ রহিত; যিনি পরম আত্মনিষ্ঠ ও সংযতচিত্ত,—এতাদৃশ ব্যক্তি অধীত-সর্ব্বশাস্ত্র না হইলেও প্রকৃত সুশিক্ষিত। সাধারণ মানবের স্থান ইঁহার অনেক নিম্নে। বস্তুতঃ এরূপ ব্যক্তির হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ, আত্মনির্ভরতায় হিমাদ্রির ন্যায় অটল অচল, সহস্র বিপৎপাতেও স্থির, ধীর, ক্ষোভরহিত। যে শিক্ষায় এইরূপ মনুষ্যত্বের, অথবা মনুষ্যহৃদয়ে এইরূপ দেবত্বের বিকাশ হইতে পারে, তাহাকেই আমরা সুশিক্ষা বলিতেছি; আর যে-শিক্ষা অস্বাভাবিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসার ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় দিয়া আধুনিক 'নভেল'সমূহের নায়ক-নায়িকার অনুকরণে চরিত্র-গঠনের সাহায্য করে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী। আমাদের কুলাঙ্গনাগণের সেরূপ শিক্ষালাভ অপেক্ষা চিরদিনের জন্য অশিক্ষিত অবস্থায় থাকাও বাঞ্ছনীয় মনে হয়। এই প্রকার কুশিক্ষার

---

* যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

গীতা—১৬ অঃ ২৩।২৪

বিষময় ফলে ভারতের যে কি সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, তাহার সম্যক্ বর্ণনা করা নিতান্ত কষ্টকর। এই কুশিক্ষার ফলে (কল্পনামূলক ভাবপ্রবণ উপন্যাসাদি-পাঠে) কোমলপ্রকৃতি ললনাগণের অপরিণত বুদ্ধি বিপথে চালিত হইতেছে। তৎ-ফলে কত স্থলে অকারণে বা অত্যল্পকারণে আত্মহত্যা প্রভৃতি কত প্রকার শোচনীয় অত্যাহিত সাধিত হইতেছে; কত শত শান্তিময় আদর্শপরিবার ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছে; এবং ব্যভিচারস্রোত প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া সর্ব্বত্র হিন্দুর সনাতন কীর্ত্তিকলাপ সকলের মূলক্ষয় করিতেছে। অশিক্ষিতা রমণীর কলহপ্রিয়তায় সমাজের কি মহদনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কিন্তু ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট।

সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, সংসারের সুখশান্তি প্রধানতঃ স্ত্রীগণের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। যখন সুদীর্ঘ দিবসের প্রচণ্ডপরিশ্রমের পর ক্লান্তদেহভার বহন করিয়া অবসন্নহৃদয়ে কঠোর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হই—তখন নিষ্ঠুর সংসারের কুটিলভ্রুকুটীসন্ত্রস্ত হৃদয় আমার আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া উঠে—'মা!' আর সেই অমৃতনির্ঝরিণী স্নেহময়ীর উদ্গ্রীব শ্রবণে সেই স্বর প্রবেশ করিবা মাত্র, জননী আমার সর্ব্বসন্তাপহারিণী-রূপে সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েন। মুহূর্ত্তে সর্ব্বসন্তাপ দূরীভূত হয়। আহা, কি সে স্বর্গীয় ভাব। কি সে অনির্ব্বচনীয়, অভূতপূর্ব্ব, নিত্য নূতন দৃশ্য! সে সে ভাব বর্ণনা করিতে লেখনী অক্ষম। উহা শুনিবার নহে, দেখিবারও নহে—কেবল অনুভব করিবার। যে ভাগ্যবান্ মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহরূপ সুধারসে অভিষিক্ত হইয়াছেন, যিনি মায়ের আদরের স্বর্গীয় আস্বাদন পাইয়াছেন তিনি—কেবল তিনিই ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। স্বার্থপর সংসারের প্রতিকূলতায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া মানব যখন জীবনে হতশ্রদ্ধ ও বীতরাগ হয়, আত্মীয়ের ঔদাসীন্য, বন্ধুবান্ধবের বিরোধভাব, জ্ঞাতির হিংসা ও স্বজাতির বিদ্রূপে যখন মৃত্যু-কামনা হৃদয়কে আশ্রয় করে, তখন সেই গৃহলক্ষ্মী প্রেম-ময়ী জীবনসঙ্গিনীর সহানুভূতি-সুন্দর শান্ত-স্নিগ্ধ সরলপবিত্র মুখচ্ছবি-দর্শনেই মানব সমস্ত শোক-সন্তাপ বিস্মৃত হয়; আবার তাহার অন্ধকার-হৃদয়ে আশার আলোক ফুটিয়া উঠে। কুৎসিত সংসার আবার তাহার নয়নে স্বর্গের সুষমায় সুশোভিত হয়। সেই প্রেম-পূর্ণ অমৃতস্রাবিনী দৃষ্টিতে তাহার মৃতপ্রায় শরীরে যেন নবজীবন সঞ্চারিত হয়। আবার যখন শরীরিণী মমতার ন্যায় কন্যা,

ভগ্নী প্রভৃতির অযাচিত অজস্র স্নেহভক্তিধার মন্দাকিনীর ন্যায় বহিয়া যায়, তখন আর সংসার জ্বালাময় মনে হয় না—চিরানন্দময় নন্দনের ন্যায় প্রতিভাত হয়। যাঁহাদেরই হৃদয় আছে, মনুষ্যত্ব আছে, তাঁহারাই ইহা অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। তাই বলিতে ছিলাম, যে শিক্ষার প্রভাবে কুলাঙ্গনাগণের হৃদয়ের স্বার্থপরতা সঙ্কুচিত, স্বেচ্ছাচার সংযত ও আত্মসুখেচ্ছা অন্তীভূত হইয়া দিব্য-ভাব সমূহের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, তজ্জাতীয় শিক্ষার বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট।

স্ত্রীগণ সুশিক্ষিত হইলে যে সুসন্তান জন্মে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। সর্ব্বকালের, সর্ব্বদেশের, সর্ব্বজাতির ইতিহাস ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতেছে। বর্ত্তমান সময়েই শত শত সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, "স্ত্রীজাতি কোন সময়েই সুশিক্ষিতা ছিলেন না, আর উঁহাদিগের দ্বারা গৃহকার্য্য ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজন সাধিত হয় নাই। কারণ, স্ত্রীজাতি স্বভাবদুর্ব্বলা ও অতিকোমলা। প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলিই তাঁহাদের নৈসর্গিক সম্পত্তি; পুরুষোচিত গুণ বা কোন কার্য্যকরী শক্তি তাঁহাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না।" এবম্বিধ মতাবলম্বীরা হয় ত মানব-চরিত্র-প্রণিধানে সম্পূর্ণ অক্ষম অথবা তাঁহারা কোন দিন তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেন নাই।

স্ত্রীই প্রকৃতপ্রস্তাবে গৃহীর গৃহ, * সংসারের সার এবং সমাজ-বন্ধনের গ্রন্থি-স্বরূপা। স্ত্রী—পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ। শাস্ত্র বলিতেছেন—"যাবৎ পুরুষ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ অর্দ্ধমাত্র থাকেন।" † বস্তুতঃ স্থিরচিত্তে অপক্ষপাতে সম্যক্ বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মানব নিরবচ্ছিন্ন কঠোর পৌরুষভাবে পরিচালিত হইলে কখনই পূর্ণত্ব অর্থাৎ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। পুরুষ চিরকাল পুরুষ এবং স্ত্রী চিরকাল স্ত্রী থাকিয়া যায়। পরস্পর একাত্মা ও পরস্পরের ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে, কেহই প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারে না, সুতরাং স্ত্রী যথার্থই পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ। আর অর্দ্ধাঙ্গই যদি অপরিপুষ্ট রহিল তাহা হইলে পরার্দ্ধ কি পুষ্টিলাভ করিতে পারে? সুতরাং

* ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

† যাবন্ন বিন্দতে ভার্য্যাং তাবদর্দ্ধো ভবেৎপুমান্।

জনসমাজকে উন্নত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে স্ত্রী-জাতিকে সুশিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। স্ত্রী-জাতি সুশিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে মানব-সমাজ কখনই পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র।

ভক্তের প্রতিগ্রহ।

একদিন মুক্তহস্ত হইলেন ভগবান্—
যে চাহিবে যাহা, তারে তাহা করিবেন দান;
উল্লাসে নাচিল সবে, আনন্দ-মগন প্রাণ,
কেহ চাহে "অর্থ দেহ," কেহ কহে "দেহ স্থান।"
রূপসী চাহিল "রূপ" অতুলন অপ্সরার—
চাহিল কাতরে ধনী "ঋদ্ধি সব অপার।"
বীর কহে "দেহ মোরে, অব্যর্থ বিজয় রণে"
কবি কহে "অফুরন্ত কাব্যরস দেহ মনে।"
শিল্পী চাহে অতুলন শিল্পের প্রতিভা তার,
রাজা চাহে ধরণীর সমগ্র সাম্রাজ্যভার
মল্ল চাহি নিল "বল", বিরহী প্রিয়-মিলন,
প্রেমিক চাহিল প্রিয়া বাঞ্ছি মনের মতন।
সকলি চাহিয়া নিল, যাহা অভিলাষ যার,
বেলা-শেষে গেল ভক্ত সঙ্কুচিত নেত্র তার।
"কি চাহ হে ভক্ত মম, কিসের আকাঙ্খা তব?"
শুনি কহে "ভগবন্, নিবেদন অভিনব;
সবারে দিয়েছ সব, তোমারে চাই গো আমি,
সামান্য আকাঙ্খা মম, পূরাও জগৎস্বামী।"

শ্রীসুধেন্দুকুমার দাসগুপ্ত

সংবাদ ও মন্তব্য।

নবনিয়োগ। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, আর, (প্রফুল্লরঞ্জন) দাস মহাশয় সম্প্রতি পাটনা-হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ব্যারিষ্টার দাস বয়সে নবীন, কিন্তু দক্ষতায় প্রবীণ। এ নিয়োগ বেশ হইয়াছে।

নূতন হাঁসপাতাল। কলিকাতার মাড়োয়ারিগণ, কলিকাতার আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের পোলিশহাঁসপাতালের বাড়ী ক্রয় করিয়া, সেই বাড়ীতেই 'শ্রীবিশুদ্ধানন্দ-সরস্বতী মাড়োয়ারি হাঁসপাতাল" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হউক্।

সৎকর্ম্ম। বোম্বাইয়ের শেঠ প্রভুদাস মহাশয়, গুজরাট কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছের দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের মধ্যে বিতরণার্থ বোম্বাইয়ের ফেমিন্ রিলিফ-ফণ্ডের ভুটিয়া ভলেণ্টিয়ার কোরের হস্তে ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের ৩৫ গাঁট বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। দাতার জয় হউক্।

লিগের অধিবেশন। সমাচারপত্রে প্রকাশ—বঙ্গীয়-প্রাদেশিকমোসলেম্-লীগের আগামী অধিবেশন ইষ্টারের অবকাশে যশোহরে হইবে। সুসংবাদ।

বিভাগীয় কমিশনার। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানবিভাগের কমিশনার নিযুক্ত করিলেন। দেশীয়গণের মধ্যে যাঁহারা কমিশনর হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা এখনও অঙ্গুলি-পর্ব্বে গণিত হইতে পারে, সুতরাংই ইহা সুখের কথা মনে করিতে হয়।

মধু-মিলন। গত ৪ঠা ফাল্গুন খিদিরপুর—মাইকেল লাইব্রেরী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত 'মধুমিলন' উৎসবের উপসংহার হইয়াগিয়াছে। এতদুপলক্ষে ৮০০ হিন্দু দরিদ্র ভূরিভোজনে তৃপ্ত হইয়াছে ও ৪০০ মুসলমান্ দরিদ্র তণ্ডুল, মিষ্টান্ন ও অর্থ পাইয়াছে।